শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

সঙ্কলিত ও সম্পাদিত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা - ৬

নিবেদন

শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাস ও প্রবন্ধাদির ন্যায় তাঁর চিঠিপত্রগুলিও বাঙলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। বিভিন্ন-বিষয়ক এই চিঠিপত্রগুলি নিঃসন্দেহেই একটি অনবদ্য পত্র-সাহিত্য। শরৎচন্দ্রের রচনার যে বৈশিষ্ট্য—সেই সহজ করে বলার সুনিপুণ ভঙ্গী, সেই ভাষার যাদু প্রভৃতি—সমস্তই এই সব চিঠিপত্রে বর্তমান। এই চিঠিগুলি থেকে শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন গ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অভিমত, সাহিত্য-রচনা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর মতামত, তাঁর স্বভাবসুলভ পরিহাস এবং তাঁর ব্যক্তি-জীবনের অনেক কথাও জানা যায়।

এই "শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র" গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট বন্ধু শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি শরৎচন্দ্রের বহু চিঠি দিয়ে এবং শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমার অজানা অনেক কথা জানিয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। হরিদাসবাবুর পুত্র শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়ও কিছু চিঠি দিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র যাঁদের চিঠি লিখেছিলেন, তাঁদের এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকেই অধিকাংশ চিঠি পেয়েছি। তাছাড়া বিবিধ সাময়িক পত্রিকা, দৈনিক পত্রিকা এবং গ্রন্থাদি থেকেও অনেক চিঠি সংগ্রহ করেছি।

যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে শরৎচন্দ্রের চিঠি দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের এবং যে সব পত্রিকা ও গ্রন্থাদি থেকে চিঠি সংগ্রহ করেছি, সেই সব পত্রিকার সম্পাদক ও গ্রন্থকারদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথকে লেখা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের চিঠি শান্তিনিকেতনে "রবীন্দ্র ভবনে" তো আছেই, তাঁছাড়া রবীন্দ্রনাথ শেষ দিকে বিভিন্ন ব্যক্তিকে যে সব চিঠি লিখেছিলেন, সেই সব চিঠির নকলও সেখানে রয়েছে। সেই হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র—এঁদের পরস্পরের মধ্যে যে সব চিঠিপত্রের বিনিময় হয়েছিল, তার প্রায় সবগুলিই "রবীন্দ্র ভবন" থেকেই নকল করে আনতে সক্ষম হয়েছি। "রবীন্দ্র ভবন" থেকে এই চিঠিগুলি সংগ্রহ করবার সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং শরৎচন্দ্রকে লেখা কবির চিঠিগুলি এই গ্রন্থে মুদ্রিত করবার অনুমতি দানের জন্য বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষকে অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শরৎচন্দ্রের পত্র সঙ্কলনের পথিকৃৎ। তিনি নিজে এ বিষয়ে প্রথম উদ্যোগী হ'লেও ব্যাপকভাবে শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র সংগ্রহ করবার জন্য আমাকেও বহুবার উৎসাহ দিয়েছেন। এই সঙ্গে তাঁর কথাও আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করছি।

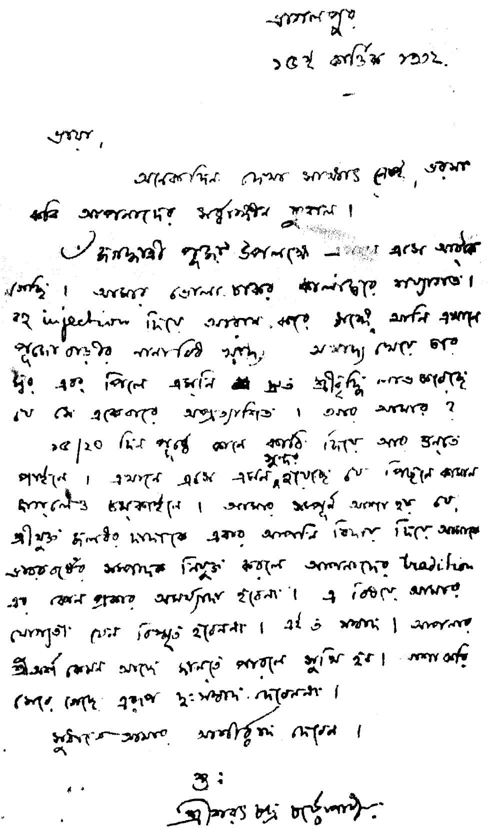
এই গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে শরৎচন্দ্রের কিছু অপ্রকাশিত চিঠি কয়েক মাস ধরে "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত হয়েছিল। "ভারতবর্ষে" এই সব চিঠি প্রকাশের ব্যবস্থা করার জন্য "ভারতবর্ষে"র সুযোগ্য সম্পাদকদ্বয় শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়কেও আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সূচীপত্র

রেঙ্গুনের চিঠি

শিবপুরের চিঠি

সামতাবেড় ও কলিকাতার চিঠি



[illegible]পুর
১৫ই কার্ত্তিক ১৩৩২.

[illegible],

অনেকদিন তোমার সংবাদ পাইনে, ভরসা করি আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল।

৺জগদ্ধাত্রী পূজার উপলক্ষে — [illegible] এসে আটকে পড়েছি। আমার [illegible] কালাজ্বরে [illegible]। ২২ injection দিয়ে [illegible] এখানে [illegible] সম্ভব [illegible] এমনি [illegible] শ্রীবৃদ্ধি [illegible] যে সে একেবারে [illegible]। তবে আমার ?

১৫/20 দিন পূর্ব্বে [illegible] দিয়ে আর [illegible] পারিনে। এখানে এসে [illegible] যে [illegible] চমৎকার [illegible]। আমার সম্পূর্ণ [illegible] যে, শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়কে [illegible] দিয়ে [illegible] সম্পাদক নিযুক্ত করলে আপনাদের tradition এর কোন প্রকার [illegible] হবেনা। এ [illegible] আমার যোগ্যতা [illegible] হবেনা। এই ত সত্য। আপনার শ্রী[illegible] আমার [illegible] পারলে খুসি হই। [illegible] এবার [illegible] দুঃসময় [illegible]।

[illegible] আমার আশীর্ব্বাদ [illegible]।

শু:
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(শরৎচন্দ্রের একটি চিঠির প্রতিলিপি)

24. Aswini Dutt, Road.

Calcutta.

The Vice Chancellor D^r R.C. Majumdar PhD.

Dacca.

সর্ব্ব প্রথমে, আমার অকৃত্রিম প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। শ্রী ঠাকুরাণীকে নমস্কার দিবে ও ছেলেদের সহিতে যদি দেখা হয় আমার কথা বলিবে।

এদিকে আমার জ্বর ও সারিলনা। শ্রীবিজিনাদি ডাক্তারের দল কোন নির্ণয়ে আসেনা।

নানান রূপের নানান শিশি
নানা মাপের কৌটা হলো জড়ো
দুর্গতির শেষ আমি হলুম জড়, কবলে যখন আছি জর-জর,
ডাক্তারেরা বললে তখন হাওয়া বদল করো।

অতএব, দুই তিন দিনেই স্থান ত্যাগের বাসনা। নিজের সং সাধের। আমি মনে মনে বলি, যে আমার সন্ধ্যাবেলার নিত্য সঙ্গের নই তুমি, তুমি আর একটু খানি প্রসন্ন হও তোমার আরদ্ধ কাজটুকু চটপট সেরে ফেলো, আমি অবসর পাই। ইতি—

২৬শে পৌষ ১৩৪০।

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(শরৎচন্দ্রের আর একটি চিঠির প্রতিলিপি)

24. Aswini Dutt Road
Kalighat, Calcutta.
8.7.36.

Dear Sir,

With ref to your letter on behalf of the Dacca University Students Union, I am glad to inform you that I have no objection to accept the address which your Union so kindly offers to present me when I go to Dacca during the University Convocation.

I intend to stay there for 3-4 days. We will fix the date when we meet

Yours sincerely
Sarat Chandra Chatterji

(শরৎচন্দ্রের একটি ইংরাজী চিঠির প্রতিলিপি)

রেঙ্গুনের চিঠি

শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র

প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে[১] লেখা

D. A. G.'s Office, Rangoon

22.3.12

প্রমথ—তোমার পত্র পাইয়া আজই জবাব লিখিতেছি, এমন ত হয় না। যে আমার স্বভাব জানে, তাহার কাছে নিজের সম্বন্ধে এর বেশী জবাবদিহি করা বাহুল্য।

অনেক সময়েই যে তুমি আমার কথা মনে করিবে, তাহা আমি জানি। কেন না, যাদের মনে করার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তারাও যখন করে, তখন তুমি ত করিবেই।

আমার ভাগ্যবিধাতা আমার সমস্ত শাস্তির বড় এই শাস্তিটা জন্মকালেই বোধ হয় আমার কপালে খুদিয়া দিয়াছিলেন। আজ যদি আমি বুঝিতে পারিতাম, আমার পরিচিত আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা সবাই আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন—আমি সুখী হইতাম, শান্তি পাইতাম!

১। প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের বাড়ী বর্ধমান জেলায়। প্রমথবাবু ছেলেবেলায় মজঃফরপুরে কাকার কাছে থেকে লেখাপড়া করতেন। এই মজঃফরপুরেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়। পরে এই পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। প্রমথবাবু মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে (বর্তমান নাম বিদ্যাসাগর কলেজ) যে সময় বি. এ. পড়তেন, সেই সময় কলকাতার বিখ্যাত পুস্তক-ব্যবসায়ী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের

তা হইবার নয়। আমাকে ইহারা স্মরণ করিবেন, সন্ধান জানিতে চাহিবেন, বিচার করিবেন, এবং অনবরত আমার অধোগতির দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আমার মর্ম্মান্তিক দুঃখের বোঝা অক্ষয় করিয়া রাখিবেন। লোকে যে আমার কাছে কি আশা করিয়াছিলেন, কি পান নাই, এবং কি হইলে যে আমাকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন, এ যদি আমাকে কেহ বলিয়া দিতে পারিত, আমি চিরটা কাল তাহার কাছে কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিতাম। এত কথা বলিতাম না যদি তুমি গত কথা না স্মর

জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়ও ঐ কলেজে এফ. এ. পড়তেন। কলেজে নাটক অভিনয়ের ব্যাপার নিয়ে প্রমথবাবুর সঙ্গে হরিদাসবাবুর পরিচয় হয় এবং ক্রমে এঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়।

প্রমথবাবুর সঙ্গে হরিদাসবাবুর প্রথম পরিচয়ের কয়েক বছর পরের ঘটনা- এই সময় কলকাতায় "ইভিনিং ক্লাব" নামে একটা নাম-করা ক্লাব ছিল। এই ক্লাবের সভাপতি ছিলেন খ্যাতনামা কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, আর সম্পাদক ছিলেন এই প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। হরিদাসবাবুও ক্লাবের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। প্রমথবাবু একদিন ক্লাবের এক সভায় ক্লাবের মুখপত্র হিসাবে একটি মাসিক পত্রিকা বার করার প্রস্তাব করেন। কাগজ চালানো অত্যন্ত ব্যয়-সাধ্য এবং ক্লাবের সদস্যদের দ্বারা তা সম্ভবপর নয় বলে সদস্যরা প্রমথবাবুর প্রস্তাব সমর্থন করলেন না। তখন হরিদাসবাবু বললেন যে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যদি সম্পাদক হন, তাহলে তিনি খুব বড় করে এবং জাঁক করে একটি মাসিক পত্রিকা তাঁদের প্রতিষ্ঠান থেকে বার করতে প্রস্তুত আছেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু সম্পাদক হ'তে রাজী হ'লে হরিদাসবাবুদের প্রতিষ্ঠান "গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স" থেকে একটি কাগজ বার করা স্থির হয়। এই কাগজই হ'ল—"ভারতবর্ষ"।

শরৎচন্দ্র এই সময় রেঙ্গুনে থাকতেন। ভারতবর্ষ বার করা স্থির হ'লে, প্রমথবাবু শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে ভারতবর্ষের জন্য লেখা আদায় করবেন ব'লে হরিদাসবাবুকে আশ্বাস দেন। তাই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রমথবাবুর যে চিঠিপত্রের বিনিময় হয়েছিল, তা প্রায় সমস্তই এই "ভারতবর্ষ" সংক্রান্ত।

করাইয়া দিতে। আমি মরিয়া গিয়াছি—এই কথাটা যদি কোনো দিন কাহারো দেখা পাও—বলিয়ো।

তাই বলিয়া তুমি যেন দুঃখ পাইয়ো না। তোমাকে আমি ভয় করি না। কেন না, তুমি বোধ হয় আমার বিচার করিবার গুরু ভার লইতে চাহিবে না। তাই তোমার কাছে আরো কয়টা দিন বাঁচিয়া থাকিলেও ক্ষতি হইবে মনে করি না। তুমি আমার বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ী। বিচারক হইয়া আমার মর্ম্মান্তিক করিবে না এই আশাই তোমার কাছে করি।

আমার সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিয়াছ—তাহা সংক্ষেপে কতকটা এইরূপ—

(১) সহরের বাহিরে একখানা ছোটো বাড়ীতে মাঠের মধ্যে এবং নদীর ধারে থাকি।[১]

১। শরৎচন্দ্রের এই বাসস্থানের কথা উল্লেখ করে তাঁর রেঙ্গুনের বন্ধু সতীশচন্দ্র দাস তাঁর "শরৎ-প্রতিভা" গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন—বোটাটং লান্সডাউন স্ট্রীটে একটা দোতলা কাঠের বাড়ীতে শরৎদা বাস করিতেছিলেন, সেই লাইনে সবই কাঠের বাড়ী ছিল। সামনে প্রকাণ্ড মাঠ। মাঠের অনতিদূরেই ঐরাবতী নদী। সহরের উপরে থাকা শরৎদা মোটেই পছন্দ করিতেন না। (পৃঃ ৬১)

এই সময় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ব্রহ্মপ্রবাসী ভূপর্যটক গিরীন্দ্রনাথ সরকারের পরিচয় হয়েছিল। গিরীনবাবুও তাঁর "ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র" গ্রন্থে লিখেছেন—সহর হইতে দুই মাইল দূরে শরৎচন্দ্র যেখানে থাকিতেন সে স্থানগুলির নাম "বোটাটং" ও "পোজোনডং"। রেঙ্গুন সহরে যতগুলি ধানের কল, কাঠের কল, ডকইয়ার্ড ও ঢালাইয়ের কারখানা প্রভৃতি আছে, তাহাতে ফিটার, বাইশম্যান ও ঢালাই মিস্ত্রীর সমস্ত কাজ বাঙ্গালী মিস্ত্রীদের ছিল একচেটিয়া।…ঐ সকল মিস্ত্রী একত্র দলবদ্ধ হইয়া এ অঞ্চলে সপরিবারে বাস করিত। ইহাদের জন্য এখানে সারি সারি অনেক কাঠের ব্যারাকবাড়ী এখনও আছে। শরৎচন্দ্র

(২) চাকুরি করি। ৯০৲ টাকা মাহিনা পাই এবং দশ টা allowance পাই। একটা ছোটো দোকানও' আছে। দিনগ পাপক্ষয়, কোনোমতে কুলাইয়া যায় এই মাত্র। সম্বল কিছুই নাই।

স্বল্পভাড়ায় ঐরূপ একটি ছোট বাড়ীতে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন বলিয়া, আমি ঐ প নাম "মিস্ত্রীপল্লী"র পরিবর্ত্তে "শরৎপল্লী" রাখিয়াছিলাম। এ পল্লীতে শরৎচন্দ্রের শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান কেহই ছিল না। শরৎচন্দ্রের কোনরূপ আত্মাভিমান না থাক তিনি মিস্ত্রীদের সহিত অবাধে মেলামেশা করিতেন, তাহাদের চাকরীর দরখাস্ত লি দিতেন, বিবাদ বিসংবাদের সালিশ হইতেন, রোগে হোমিওপ্যাথী ঔষধ দিতেন, সে শুশ্রূষা করিতেন। বিবাহাদি উৎসবে যোগদান করিতেন এবং বিপদে পরম আত্মী ন্যায় সাহায্য করিতেন। এই সকল সদ্‌গুণের জন্য ওখানকার স্ত্রী পুরুষ সক শরৎচন্দ্রকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিত এবং বামুনদাদা বলিয়া ডাকিত। এই বামুনদা প্রতি তাহাদের প্রভূত বিশ্বাস ছিল, অনেকের টাকাকড়ির আদানপ্রদান এই বামুনদা মারফতেই হইত। ইহাদের একটা কীর্ত্তনের দল ছিল। বামুনদাদার পরিচালনায় দিন,ইহারা খোল-করতাল সহযোগে নাম সংকীর্ত্তন করিত। (পৃঃ ১৭-১৯)

১। শরৎচন্দ্রের দোকানের কথাপ্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র দাস তাঁর "শরৎ-প্রতিভা" লিখেছেন—একবার তিনি একটা চায়ের দোকান করিয়া অফিসে আসিয়া খবর দি আমি একটা চায়ের দোকান খুলেছি। দেখবে ত চল? প্রথমতঃ বন্ধুদের মধ্যে বে বিশ্বাস করিলেন না বটে, কিন্তু অফিস ছুটীর পর, তিনি জোর করিয়া দুচার জন ব সঙ্গে লইয়া তাঁর চায়ের দোকান দেখাইতে লইয়া গেলেন। তাঁর বাড়ীর অনতিদূ একটা কাঠের বাড়ীতে, বন্ধুরা সকলেই দেখিতে পাইলেন, নূতন একটা চায়ের দো খোলা হইয়াছে। বন্ধুদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, তা হলে ত শরৎবাবুর চা ছেড়ে দিতে হবে?' চায়ের দোকানে নিজে না বসলে দুদিনেই সাবাড় হয়ে যাবে।

—না হে না, বসতে হবে না। জান আমি কি বন্দোবস্ত করেছি? এক টিন কত চিনি মিশোতে হবে, তাতে কত পেয়ালা চা হবে, আমি সব ঠিক করে নি সকালবেলা দুধের টিন কিনে দেবো। সারাদিন কত টিন দুধ খরচ হবে সন্ধ্যাবেলা করলেই পয়সা ধরা পড়বে।

(৩) Heart disease আছে। কোনো মুহূর্ত্তেই—

(৪) পড়িয়াছি বিস্তর।[১] প্রায় কিছুই লিখি নাই। গত দশ বৎসর[২] Physiology, Biology and Psychology এবং কতক History পড়িয়াছি। শাস্ত্রও কতক পড়িয়াছি।

(৫) আগুনে পুড়িয়াছে[৩] আমার সমস্তই। লাইব্রেরী এবং 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের manuscript—"নারীর ইতিহাস" প্রায় ৪০০।৫০০ পাতা লিখিয়াছিলাম তা'ও গেছে। ইচ্ছা ছিল যা হোক একটা এ বৎসর publish করিব। আমার দ্বারা কিছু হয় এ বোধ হয়

রেঙ্গুনে তখন গরুর দুধে চা হতো না। পয়সা খরচ করিয়াও খাঁটি দুধ পাওয়া যেতো না। (শরৎ-প্রতিভা—পৃঃ ১১-১২)

রেঙ্গুনে চায়ের দোকান একটা লাভজনক ব্যবসা। এই ব্যবসার কথায় সতীশবাবু বলেছেন—এখানে এক একটা চাএর দোকান দু তিন হাজার টাকা দামেও বিক্রী হয়। এ দ্বারা স্পষ্ট অনুমান করিতে পারেন, এদেশে চাএর প্রচলন কিরূপ। সকাল পাঁচটা হইতে রাত বারোটা পর্য্যন্ত এক একটা দোকানে বিক্রী দু তিন শ' টাকার উর্দ্ধে ছাড়া নীচে নয়।—(শরৎ-প্রতিভা—পৃঃ ৩৫)

১। রেঙ্গুনে চাকরী করার সময় শরৎচন্দ্র প্রধানতঃ রেঙ্গুনের "বার্ণাড ফ্রি লাইব্রেরী" থেকেই বই নিয়ে পড়তেন। এ সম্বন্ধে গিরীন্দ্রনাথ সরকার লিখেছেন—...দেখিয়াছি, রেঙ্গুনের Bernard Free Library হইতে অনেক ইংরেজী সমাজনীতি, রাজনীতি ও দর্শন সম্বন্ধীয় মোটা মোটা গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি মনোযোগের সহিত পড়িতেন। (ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র, পৃঃ—১১)

২। শরৎচন্দ্রের মাতুল ও বাল্যবন্ধু শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন গিয়েছিলেন।

৩। রেঙ্গুনে সাধারণতঃ কাঠের বাড়ী। শরৎচন্দ্র যে বাড়ীতে থাকতেন, তার কাছেই একটা বাড়ীতে একবার আগুন লেগে যাওয়ায় শরৎচন্দ্রের বাড়ীটিও পুড়ে গিয়েছিল। এই গৃহদাহের ফলে শরৎচন্দ্রের বহু জিনিস নষ্ট হয়েছিল।

হইবার নয়, তাই সব পুড়িয়াছে। আবার করিব, এমন উৎসাহ পাই না। 'চরিত্রহীন' ৫০০ পাতায় প্রায় শেষ হইয়াছিল—সবই গেল।

তোমার ক্লাবের[১] কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইলাম। কিরূপ হয় মাঝে মাঝে লিখিয়া জানাইয়ো। নিজেও কিছু করা ভাল—হুজুগের মধ্যে এ কথাটাও ভোলা উচিত নয়। তোমার যে রকম স্বভাব তাহাতে তুমি যে এতগুলি লোকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়া পড়িবে তাহা মোটেই বিচিত্র নয়।

আমাদের আগেকার 'সাহিত্য-সভা'র একটি মাত্র সভ্য 'নিরুপমা দেবী'ই[২] সাহিত্যের চর্চ্চা রাখিয়াছেন—আর সকলেই ছাড়িয়াছে—এই না?

আমার আগেকার কোনো লেখা আমার কাছে নাই—কোথায় আছে, আছে কি না-আছে কিছুই জানি না—জানিতে ইচ্ছাও করি না।

আর একটা সম্বাদ তোমাকে দিতে বাকী আছে। বছর তিনেক আগে যখন Heart disease-এর প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন আমি

১। ইভিনিং ক্লাব।

২। শরৎচন্দ্র ছেলেবেলায় ভাগলপুরে মাতুলালয়ে অবস্থান কালে সমবয়সী কয়েকজন আত্মীয় ও বন্ধুদের নিয়ে একটি সাহিত্য-সভা গঠন করেছিলেন। শরৎচন্দ্র নিজে এই সাহিত্য-সভার সভাপতি ছিলেন। গুরুজনদের লুকিয়ে কোন একটা নির্জন স্থানে গিয়ে এই সাহিত্য-সভার অধিবেশন হ'ত। সপ্তাহে একদিন করে সভা বসত। সভায় সদস্য ও সদস্যাদের গল্প-কবিতা পড়া হত। শরৎচন্দ্র নিজেই এই সব গল্প-কবিতা বিচার করতেন এবং গুণাগুণ অনুসারে প্রতিটি গল্প কবিতায় নম্বর দিতেন। সাহিত্য-সভার একমাত্র সদস্যা ছিলেন নিরুপমা দেবী। ইনি সভার অন্যতম সদস্য বিভূতিভূষণ ভট্টর কনিষ্ঠা ভগিনী। নিরুপমা দেবী তখন বালবিধবা। তিনি সভায় যোগ দিতেন না। তিনি অন্তঃপুরেই থাকতেন এবং তাঁর দাদা বিভূতিভূষণ ভট্টের হাত দিয়ে তাঁর লেখা পাঠিয়ে দিতেন।

পড়া ছাড়িয়া oil painting সুরু করি। গত তিন বৎসরে অনেকগুলি oil painting[১] সংগ্রহ হইয়াছিল—তাহাও ভস্মসাৎ হইয়াছে। শুধু আঁকিবার সরঞ্জামগুলা বাঁচিয়াছে।

এখন আমার কি করা উচিত যদি বলিয়া দাও ত তোমার কথামত দিনকতক চেষ্টা করিয়া দেখি।

(1) Novel, History, Painting

কোন্‌টা? কোন্‌টা আবার সুরু করি বল ত।

তোমার স্নেহের শরৎ

১। শরৎচন্দ্রের আঁকা প্রথম চিত্রটির নাম ছিল "রাবণ-মন্দোদরী"। তাঁর আঁকা ছবিগুলির মধ্যে তাঁর "মহাশ্বেতা" নামক ছবিখানিই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এই মহাশ্বেতা ছবিটি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখেছেন—তাঁহার সর্ব্বপ্রথম চিত্র "রাবণ-মন্দোদরী"খানা কেমন অস্পষ্ট হইয়াছিল। এখানা দেখা গেল সেইসব অস্পষ্টতা দোষ রহিত, অথচ অতিরিক্ত আলোক সম্পাতেও খুব যে উজ্জ্বল, তাও নয়। আলো ও ছায়ার পরস্পর সম্বন্ধটুকু ইহাতে এমন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহা নিতান্ত কাঁচা হাতের বলিয়া মনে করিবার মত নয়। বাস্তবিকই তাহার মধ্যে Anatomyর জ্ঞান, Perspective এবং Back groundএর আইডিয়া সমস্তই বিদ্যমান ছিল। শিল্পীর বর্ণজ্ঞানও যে নিতান্ত কম ছিল, তাহাও বলিতে চাহি না। মোটের উপর, এক সঙ্গে নিসর্গ-চিত্র ও মনুষ্য-চিত্র মিলাইয়া যা হয়, ঠিক তাই, এই তপস্বিনী মহাশ্বেতার চিত্র সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছিল প্রকৃতির খেয়ালী-সন্তান শরৎচন্দ্রের তুলির মুখে।

বর্ষার দিনে অচ্ছোদের তীর ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা দেখাইতেছে, ওপারে মেঘভারানত আকাশ আরও অস্পষ্ট, ইহারই একপাশ দিয়া লাজুক সূর্য্য একটুখানি উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে। তীরে তরুতলে এলোকেশা সদ্যস্নাতা তপস্বিনী মহাশ্বেতা। রোরুদ্যমানা প্রকৃতিদেবীরই যেন একখানা জীবন্ত আলেখ্য।" (নরেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত "ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র"—পৃঃ ১৬-১৭)

D. A. G.'s Office, Rangoon
29.4.12

প্রমথ—আমি মনে ক'রে আছি তুমি চিঠি লেখ না কেন—এ দিকে আমি তোমাকে যে চিঠি লিখেছিলাম তা' আমার বাক্সেটেই পড়েছিল। মনে জানি নিশ্চয়ই পোষ্ট করা হয়ে গেছে।—এ রকম ভুল হওয়ায় বড়ই লজ্জিত হয়ে আছি, যাহোক এ বারের মত বেশী কিছু মনে কোরো না, এই অনুরোধ করি।

আমার habit প্রভৃতি তুমি অপরের কাছে সন্ধান লইতে গেলে কেন? জিজ্ঞাসা করলে আমি কি বলতাম না মনে কর? অবশ্য তুমি আমার বর্ত্তমান মনের ও শারীরিক অবস্থা জান না—দেখ্‌লে বুঝতে পারবে—মিথ্যা কথা ব'লে কাজ বাড়াবার মত সময় আমার একেবারে নাই।

এ চিঠিতে বেশী কিছু লিখ্‌ব না, শুধু এইটুকু জানাচ্ছি যে, আমি মে মাসেই যাব। কবে, কি বৃত্তান্ত বল্‌তে চাই নে। আমাকে সশরীরে দেখলেই টের পাবে আমি এসেছি।—

এক রকম শরীরের স্বস্তি নাই, তার ওপরেও ক'দিন থেকে আরো যেন অসুখ করেছে—

শীঘ্র জবাব দিও কাজ আছে।—শরৎ

[৪ এপ্রিল ১৯১৩]

প্রমথ—তোমার আগেকার চিঠিরও এখনো জবাব দিই নি। ভাবছিলাম, তুমি কেন যে আমাকে চিরকাল এত ভালবাস—আমি ঐ কথা অনেক দিন থেকেই ভাবি। আমি ত যোগ্য নই ভাই! আমার অনেক দোষ। তোমার সরল, স্নেহপূর্ণ বন্ধুত্ব আমাকে অনেক সময়ে

সুখ দেয়—দুঃখ দিতেও ছাড়ে না। ভাবি, আমার সম্বন্ধে এই লোকটা ইচ্ছা ক'রেই আত্মপ্রবঞ্চনা করছে—না সত্যি শ্রত সরল সুহৃৎ আজ কাল মেলে? তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নাই, এ কথা কেউ যদি না বিশ্বাস করে প্রমথ, তুমি করবেই। আমার অনেক দোষের সময়েও যখন বিশ্বাস ক'রে এসেছ, তখন, এখন ত আমি ভাল ছেলের মধ্যেই। আজকাল প্রায়ই সত্যি কথা বলি।

আমার অনেক কথা আছে। আমার 'কাশীনাথ'টা অতি ছেলে-বেলাকার লেখা। যে সময়ে ওটা তোমারও ভাল লাগ্‌ত (মনে আছে বোধ হয়—পাথুরেঘাটায়[১]) আমারও ভাল লেগেছিল, লিখেওছিলাম। আজ তুমিও বড় হয়েছ, আমিও। তোমারও ভাল লাগে নি, আমার ত অতি বিশ্রী লেগেছে। ধন্য সমাজপতি মহাশয়।[২] এও প্রকাশ করেছেন।

১। প্রমথবাবু কলেজ ছেড়ে কিছুদিন পাথুরেঘাটার রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ করেছিলেন। সেই সময় শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় এলে পাথুরেঘাটায় গিয়ে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে আসতেন।

২। "সাহিত্য" পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। শরৎচন্দ্র প্রথম রেঙ্গুন যাওয়ার সময় তাঁর ছেলেবেলাকার লেখাগুলো তাঁর মাতুলদের কাছে রেখে যান। এই ভাবে তাঁর কিছু লেখা তাঁর অন্যতম মাতুল ও বাল্যবন্ধু সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছেও থাকে। সমাজপতি তাঁর সাহিত্য পত্রিকায় ছাপাবার জন্য শরৎচন্দ্রের কিছু লেখা উপেনবাবুর কাছে চান। উপেনবাবু তখন শরৎচন্দ্রকে না জানিয়েই সাহিত্যে ছাপবার জন্য শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলাকার লেখা "কাশীনাথ" গল্পটি দেন। শরৎচন্দ্র তাঁর বাল্যরচনা সংশোধন না করে ছাপাতে চাইতেন না। তাই উপেনবাবু শরৎচন্দ্রকে না বলে কাশীনাথ ছাপতে দিলে, তিনি উপেনবাবু ও সমাজপতি উভয়ের উপরেই কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন।

অনিলা দেবী[১] ও তার ভাই শরৎ—অর্থাৎ শরৎ এবং অনিলা দেবী—অর্থাৎ অনিলা দেবী এবং শরৎ 'যমুনা'[২] কাগজে কথা দিয়ে নিজের হাত পা বেঁধেছেন। আমি অনেক অপরাধ অনেক গর্হিত কায আমার প্রথম বয়সে করেছি—আর করতে চাই নে ভাই! আমি কথা দিয়েছি—তুমি আমার বন্ধু—এতে প্রফুল্লমনে সম্মতি দাও। লোভের বশে, বা তোমার মত বন্ধুর অনুরোধেও আর অসত্য সৃষ্টি না করি এই আশীর্ব্বাদ ক'রে আমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভিক্ষা দাও। আমার মামারাও বিরূপ—তাঁদেরও অনেক অনুনয় করেছি। আমার লেখা, (ছোট গল্পে যদিও তেমন মজবুত নই) ফাল্গুন থেকে যমুনায় বেরোচ্ছে এবং তোমার অনুমতি পেলে আরও কিছুকাল নিশ্চয়ই বেরোবে। আমার মত এবং গল্পের ধারা সম্বন্ধে বিচার করবার জন্য দুই এক দিনের মধ্যেই যমুনা পাবে। যমুনা দেখে সমুদ্রের ধারণা তোমার না করতেও হয়ত হ'তে পারে। যমুনা দেখে যমুনার ধারণাই কোরো—তোমার স্বাধীন মত লিখে জানাইয়ো। বৈশাখও প্রথম বৈশাখেই পাবে। তাতে নারীর মূল্য ব'লে ক্রমশঃ একটা প্রবন্ধ অনিলা দেবী লিখছেন। তার সম্বন্ধেও মত দেবে।

১। শরৎচন্দ্রের দিদির নাম অনিলা দেবী। শরৎচন্দ্র তাঁর দিদি অনিলা দেবীর ছদ্মনামে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

২। ফণীন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত "যমুনা" মাসিক পত্রিকা। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এক মাসের ছুটি নিয়ে শরৎচন্দ্র একবার দেশে এসেছিলেন। সেই সময় শরৎচন্দ্রের মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ফণীন্দ্রনাথ পালের পরিচয় করিয়ে দেন। পরিচয় হ'লে ফণিবাবু তাঁর কাগজকে নিজের কাগজ ভেবে নিয়মিত লিখবার জন্য শরৎচন্দ্রকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। ফণিবাবুর অনুরোধে শরৎচন্দ্র

'চরিত্রহীন' তোমাকে পড়তে দিতে পারি' কিন্তু মুদ্রিত করবার জন্য নয়। এটা চরিত্রহীনের লেখা চরিত্রহীন—তোমাদের সুরুচির দলের মধ্যে গিয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়বে—তা ছাড়া অত্যন্ত অশোভন দেখাবে। আমার সম্বন্ধে (অবশ্য আমার recent লেখা প্রভৃতি আলোচনার পরে) যদি ভাল opinion হয় এবং আমার লেখা চাও নিশ্চয়ই দেবো—কিন্তু, এখন নয়। নিঃশব্দে গোপনে—ঢাক ঢোল পিটে ফটোগ্রাফ দিয়ে নয়। আমি অত অর্ব্বাচীন নই। আরও একটা কথা এই যে, চরিত্রহীন গল্প হিসাবে—তা' সে প্রায় কিছুই নয়। অ্যানালিসিস্—Psychological—এই ইচ্ছা নিয়েই লিখি। সেটা পুড়ে যায়, তার পরে দুটো মিশিয়ে একরকম ক'রে লিখেছি।

আজ এই পর্য্যন্ত। বাড়ীর খবর ভাল ত? আমার কথাটা বাড়ীর মধ্যে একবার জানিয়ে দিয়ো। তোমার পিসীমাকে প্রণাম জানালাম।

তোমার স্নেহের শরৎ

প্রমথ—একটা অহঙ্কার করব—মাপ করবে? যদি কর ত' বলি। আমার চেয়ে ভাল novel কিম্বা গল্প এক রবি বাবু ছাড়া আর কেউ লিখতে পারবে না। যখন এই কথাটা মনে জ্ঞানে সত্য ব'লে মনে হবে—সেই দিন প্রবন্ধ বা গল্প বা উপন্যাসের জন্য অনুরোধ কোরো।

যমুনায় লিখতে রাজী হন। আর শুধু তাই নয়, তিনি স্বনামে ছাড়া ছদ্মনামে তাঁর দিদির নাম দিয়ে লিখবারও কথা দেন।

১৩। শরৎচন্দ্র এই সময় "চরিত্রহীন" উপন্যাসটি লিখছিলেন। "ভারতবর্ষ" পত্রিকা বার করবার আয়োজন হ'লে, প্রমথবাবু ভারতবর্ষে ধারাবাহিকভাবে বার করবার জন্য শরৎচন্দ্রের "চরিত্রহীন" চান।

তার পূর্ব্বে নয়—এই আমার এক বড় অনুরোধ তোমার উপরে রইল। এ বিষয়ে আমি কারও কাছে অসত্য খাতির চাই না—আমি সত্য চাই। তোমাদের কাগজে[1] ভাল লেখার অভাব হবে না; কেন না, তোমরা টাকা দেবে। কিন্তু, আমি যদি এই সময়েই 'যমুনা'কে ছাড়ি, তার আর কেউ থাকবে না। অথচ, আমি বলেছি, যদি meritএর আদর থাকে—তবে যমুনা বড় হবেই। আমি কোনদিন কোন কাজেই এলাম না ভাই, যদি এই একটা কাজ সম্পন্ন ক'রে তুল্‌তে পারি, তবুও একটু সুখে মরব। এর মধ্যে আমাকে জবাব দেবার প্রয়োজন নাই। একেবারে বৈশাখের যমুনা দেখে তোমার স্বাধীন মত দিয়ে চিঠি লিখো। দিদির নারীর লেখাটা[2] সম্বন্ধে বোধ করি তোমার কিছু কুরুচি ভাব উদ্রেক করবে, কিন্তু truth চাইই। আজকালকার দিনে এইটারই সবচেয়ে প্রয়োজন। আমি নির্ভীক লোক—খাতির ক'রে কথা বল্‌তে জানি না—তাই আমি নিজের ওপর এই ভারটা নিয়েছি ঠিক এই ধরণের বারটা প্রবন্ধ লিখব যথা—(১) নারীর মূল্য (২) ধর্ম্মের মূল্য (৩) ঈশ্বরের মূল্য (৪) নেশার মূল্য (৫) মিথ্যার মূল্য (৬) আত্মার মূল্য (৭) পুরুষের মূল্য (৮) সাহিত্যের মূল্য (৯) সমাজের মূল্য (১০) অধর্ম্মের মূল্য (১১)……(১২)……

বোধ করি বছর দুই লাগবে শেষ করতে। মত কি? ভাল হবে? দ্বাদশ মূল্য নাম দেব মনে করছি। তোমার লেখার কি হ'ল? বলেছিলে পাঠাবে? যদি পাঠাও 'registered' পাঠাবে।

১। ভারতবর্ষে।

২। শরৎচন্দ্র তাঁর দিদি অনিলা দেবীর ছদ্মনামে ১৩১৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যা যমুনায় "নারীর লেখা" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

১৭ই এপ্রিল ১৯১৩
রেঙ্গুন

প্রমথ—তোমার কাল পত্র পাইয়াছি, আজ জবাব দিতেছি। সময় নাই কাযের কথা বলি। বৈশাখের যমুনায় ইহারা বিজ্ঞাপন দিয়াছে যে চরিত্রহীন শ্রাবণ হইতে তাহারাই বাহির করিবে।[১] এ অবস্থায় আমার আর কি বলিবার আছে জানি না। কেন যে তুমি আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া হরিদাসবাবুকে এ প্রস্তাব করিয়াছিলে[২] তাহা নিশ্চয়ই বুঝি। তুমি জানিতে অসাধ্য না হইলে তোমাকে অদেয় আমার কিছুই থাকিতে পারে না। এখন এই বিভ্রাট যে কিরূপে উত্তীর্ণ হইব স্থির করা যথার্থ ই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তুমি যে আমার জন্য লজ্জা পাইবে, false positionএ পড়িবে, এইটাই আমাকে দ্বিধায় ফেলিয়াছে—না হইলে আমি কোন কথাই মনে করিতাম না। যমুনায় ছাপা উচিত কি না এ কথাই উঠিতে পারিত না। এখন তোমার সম্মান অসম্মানের কথা—এইটাই আসল কথা। জলধরবাবু প্রভৃতি নামজাদা লেখক—তাহাদের জোর করিয়া পয়সার লোভে লেখা উপন্যাস অবশ্য ভাল হইতেই পারে না; কিন্তু, তবু নাম আছে—সেগুলো ফিরাইয়া দিয়া ভাল কর নাই। অথচ, আমারটা যে তোমরা ভাল বলিয়া বিবেচনা করিবে এরই বা স্থির কি? যাই হোক তোমাকে

১। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র যখন কলকাতায় আসেন, সেই সময় তিনি চরিত্রহীন লিখছিলেন। যমুনা-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল যমুনায় ছাপবার জন্য শরৎচন্দ্রের কাছে "চরিত্রহীন" চান। শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুনে গিয়ে পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দেবেন বলেছিলেন।

২। প্রমথবাবু বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষের জন্য তিনি শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে "চরিত্রহীন" এনে দেবেন।

অন্ততঃ পড়িবার জন্যও 'চরিত্রহীনের' যতটা লিখিয়াছিলাম—(আর অনেক দিন লিখি নাই) পাঠাইব মনে করিয়াছি। আগামী মেলে অর্থাৎ এই সপ্তাহের মধ্যেই পাইবে। কিন্তু, আর কোনরূপ বলিতে পারিবে না। পড়িয়া ফিরাইয়া দিবে। তাহার প্রথম কারণ, এ লেখার ধরণ তোমাদের কিছুতেই ভাল লাগিবে না। Appreciate করিবে কি না সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ। তাই এটা ছাপিয়ো না। সমাজপতি মহাশয় অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ইহা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন—[১] কেন না তাঁহার সত্যই ভাল লাগিয়াছে। তোমাদের জলধর সেন প্রভৃতির লেখাই বেশ হইবে। আমার এ সব বকাটে লেখা—এর যথার্থ ভাব কেই বা কষ্ট করিয়া বুঝিবে, কেই বা ভাল বলিবে! তবে, তোমার উপর আমার এই শপথ রহিল যদি বাস্তবিকই আর দ্বিতীয় উপায় না থাকে তাহলে আর কি বলিব অন্যথা আমাকে ছাড়িয়া দিয়ো—যমুনার কলেবরই ইহাতে বৃদ্ধি করিব। তার চেয়েও আর একটা বড় কথা আছে। তুমি যদি সত্যই মনে কর এটা তোমাদের কাগজে ছাপার উপযুক্ত তাহলে হয়ত ছাপিতে মত দিতেও পারি, না হলে তুমি যে কেবল আমার মঙ্গলের দিকে চোখ রাখিয়া যাতে আমারটাই ছাপা হয়, এই চেষ্টা করিবে তাহা কিছুতেই হইতে পারিবে না। নিরপেক্ষ সত্য—এইটাই আমি সাহিত্যে চাই। এর মধ্যে খাতির চাই না।

১। শরৎচন্দ্র ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে যখন কলকাতায় আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে চরিত্রহীনের কিছুটা পাণ্ডুলিপিও ছিল। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় চরিত্রহীন "সাহিত্য" পত্রিকায় ছাপাবার জন্য পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে এই সময় সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে পড়তে দিয়েছিলেন। সমাজপতি চরিত্রহীন পড়ে তখন সাহিত্য পত্রিকায় ছাপাতে অরাজী হয়েছিলেন। পরে যমুনায় ছাপা হবে দেখে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেছিলেন এবং নিজে সাহিত্য পত্রিকায় ছাপবার জন্য আবার চরিত্রহীন চেয়েছিলেন।

তা ছাড়া তোমাদের দ্বিজুদা[1] মত করিবেন কি না বলা যায় না। যদি আংশিক পরিবর্ত্তন কেহ প্রয়োজন বিবেচনা করেন তাহা কিছুতেই হইতে পারিবে না, উহার একটা লাইনও বাদ দিতে দিব না। তবে, একটা কথা বলি—শুধু নাম দেখিয়া আর গোড়াটা দেখিয়া চরিত্রহীন মনে করিয়ো না। আমি একজন Ethicsএর student—সত্য student. Ethics বুঝি এবং কাহারো চেয়ে কম বুঝি বলিয়া মনে করি না। যাই হৌক্ পড়িয়া ফিরিয়া দিয়ো এবং তোমার নির্ভীক মতামত বলিয়ো, তোমার মতামতের দাম আছে। কিন্তু মত দিবার সময় আমার যে গভীর উদ্দেশ্য আছে সেটাও মনে করিয়ো। ওটা বটতলার বই নয়। ষাঁড়ের বাড়ীর গল্পও নয়। যদি ছাপাবার উপযুক্ত মনে হয় তাহা হইলেও বলিয়ো আমি শেষটা লিখিয়া দিব। শেষটা আমি জানিই—আমি যা তা যেমন কলমের মুখে আসে লিখি না, গোড়া থেকেই উদ্দেশ্য ক'রে লিখি—এবং তাহা ঘটনাচক্রে বদলাইয়াও যায় না। বৈশাখের যমুনা কেমন লাগল? 'পথনির্দ্দেশ' বুঝতে পারলে কি? শীঘ্র জবাব দিয়ো—

শরৎ

[মে ১৯১৩?]

প্রমথ—তুমি যতক্ষণ না আমার লেখা পড়, ততক্ষণ আমার লেখা যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এটা সম্ভবতঃ ছেলেবেলার অভ্যাস। এই জন্যই 'যমুনা' যাতে তোমার কাছে যায়, সে ব্যবস্থা আমাকে নিজেই করতে হয়েছে। আমার স্বভাব জানই ত। যারা আপনার লোক

১। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

তারা যে আমাকে ঠিক জানতে পারে, অথচ, পরে আমার কিছুই না জানে এই যে আমার স্বাভাবিক ব্যাধি—এর অনুরোধেই তোমাকে যমুনা পাঠানো এবং এর জন্যই তোমার কাছে 'চরিত্রহীন' পাঠালাম। আশা করি এত দিনে পেয়েছ। কি জানি আমার মনে একটা ভয় হয়েছে এই বইটা ভাল লাগবার সাহস তোমার নাই। Intellectuallyএ একেবারে নির্দ্দোষ না হলেও নেহাৎ নীচু নয়—কিন্তু 'রুচির' কথা তুল্‌লে গোড়াটায় এর দোষ কিছু বেশী। অথচ, সব বুঝেও আমি এর এক ছত্রও বাদ দিই নি—দিবও না। যাক্ এ কথা। তোমাকে পড়তে দিয়েছি তোমার honest opinion দিয়ে ফিরিয়ে দেবে আশা করি—অনুরোধ করি। তোমরা reject কর—আমার এই (ঈশ্বরের কাছে) আন্তরিক প্রার্থনা। কারণ, তোমাকে তাহলে আর false positionএ পড়তে হবে না। সহজেই বলতে পারবে—এ পছন্দ হয় নি। একবার মনে করেছিলাম, প্রমথ, তোমাদের কাগজের জন্য কিছু ছোট গল্প সাধ্যমত ভাল ক'রে লিখব—কেন না, তুমি এ কাগজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু, হঠাৎ সে আশাও ছাড়লাম। এর সঙ্গে যে চিঠি পাঠালাম (ফণীবাবুর—যমুনা সম্পাদকের) তা থেকেই সব বুঝবে—এবং হরিদাসবাবুর আপনার লোকে যখন এরি মধ্যে আমার নামে এত মিথ্যা আমারি বন্ধুদের কাছে বলেছে, তখন ভবিষ্যতে (যদি তোমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখি) আরো যে কত মিথ্যা কুৎসা রটবে তা ত তুমিই বুঝতে পাচ্ছ। আমার নিন্দায় আমার চেয়ে তুমি নিজে বেশী কষ্ট পাবে তা' আমি বেশ জানি, কিন্তু, পাছে হরিদাসের প্রতি স্নেহ তোমাকে আমার দিকে অন্ধ ক'রে ফেলে তাই এত কথা লিখলাম—না হ'লে শুধু ফণীর চিঠিটা পাঠিয়েই তোমার সৎ বিবেচনার উপর বরাত দিয়েই চুপ ক'রে থাকতাম। যা' আমি সবচেয়ে ঘৃণা করি (বড় লোকের নির্লজ্জ

খোসামোদ) তাই কি প্রকারান্তরে আমার ভাগ্যে ঘটবে, যদি তোমাদের সঙ্গে 'সাহিত্যিক' সম্বন্ধ রাখি? তোমরা টাকা দেবে, তোমাদের influence ছোট সাহিত্যসেবীদের মধ্যে প্রচুর—কিন্তু আমি ছোট সাহিত্যসেবীও নয় এবং টাকার কাঙালও নয়। অন্ততঃ আত্মসম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিয়ে নয়। একা তুমি এবং তোমার ভালবাসা ছাড়া আমাকে কিন্‌তে পারে, এত টাকা তোমাদের কলকাতাতেও নেই, ত' তোমাদের পাড়াটি ত ছোট। কি দুঃখ হয় বল ত? হরিদাস বাবুর manager সু— তাকে আমিও চিনি—আমার সম্বন্ধে এত মিথ্যা রটাতে তার একটু সঙ্কোচ বোধও হ'ল না? তারা মনে করে আমি তাদেরি মত হীন, নীচ, ব্যবসাদার সাহিত্যসেবীর মুখ ভ্যাংচানি—না? প্রমথ, বেশী গর্ব্ব করা ভাল নয়, আমি কি তা' আমি জানি। আমি যে কোন কাগজকে আশ্রয় দিয়েই তাকে বড় করতে পারি—এ যদি তোমার মিথ্যা কথা ব'লে মনে হয়, বেশী দিন নয়—একটা বৎসর দেখো—তার পরে বলবে শরৎ কেবল জাঁকই করে না। যাক এ সব আমাদের আপোষের কথা, এ নিয়ে কারো কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নেই—কিন্তু, যদি তোমার ওঁদের ওপর এতটুকুও influence থাকে, আর যদি আমি তোমার শত্রু না হই, ত' এ সব মিথ্যা যাতে আর না রটে তা' কোরো ভাই। আমি ঝুড়ি ঝুড়ি লিখ্‌তেও পারি নে—লিখ্‌লেও ছাপাবার জন্যে ভদ্রলোককে চিঠি লিখে লিখে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলি নে। ফণী আমাকে কিছুতেই, একটি কথাও মিথ্যা বলবে না, এ আমি নিশ্চয় জানি। তাছাড়া, আমিও ঐ হতভাগা বা—কে জানি অর্থাৎ ওর সম্বন্ধে শুনেছি। তাই এত দুঃখ হয়েছে যে, তোমাকেও এ সব রূঢ় কথা লিখতে বাধ্য হ'তে হ'ল।

প্রমথ, আমি 'যমুনা'কে ভালবাসি সে কথা তোমার অগোচর নাই,

তবুও পাছে তোমাকে অমর্য্যাদা করা হয়, এই ভয়েই তোমাকে 'চরিত্রহীন' পাঠিয়েছি। (তুমি ভাল-মন্দ কি বল, না-বল সেটাও আর একটা কথা) যদি একেবারেই না পাঠাই, তোমাদের দলের লোকের মনে হ'তে পারে, আমি তোমাকে ঠিক অত বেশী ভালবাসি না। কিন্তু ভাল যে বাসি এইটা সপ্রমাণ করবার জন্মেই তোমাকে পাঠান। তুমি পড়বে এবং reject করবে। ক্ষতি নাই, তবু তোমার মান থাকবে এবং আমার ওপরে যে তোমার জোর আছে সেটাও জানা যাবে। তোমার চিঠি পেলে আমি ফণী পালকে লিখে দেব। সে তোমার কাছ থেকে ওটা নিয়ে আসবে।

আর একটা কথা বলি প্রমথ, টাকার গর্ব্বটাই তোমাদের দলের লোকের মনে যেন খুব বেশী না থাকে। টাকা সবাইকে কিন্‌তে পারে না। একটু সৎ, একটু honest হওয়া চাই। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি? এখনও কাগজের অনুষ্ঠান-পত্র বার হ'ল না, এর মধ্যেই এত ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা গ্লানি? তোমরা পরে যে কি করবে আমি তাই ভাবছি। সমাজ যাতে ভাল হয়, লোক যাতে সৎ শিক্ষা পায়, মাসিক কাগজের সে একটা প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া চাই। অথচ, এমনি তোমাদের manager যে—তাঁর কথা আর বেশী তুলতেও রাগ হচ্ছে। টাকা খরচ ক'রে মাইনে দিয়ে কি এই লোক রাখে? এই সব নমুনা যাতে বেশী প্রশ্রয় না পায়, হরিদাস বাবুকে আমার সবিনয় অনুরোধ জানিয়ে বলবে। বলবে—আমার পেশা চাক্‌রি—তাতে দু-মুটো খেতে পাই। আমি সন্ন্যাসী—আমার নামের ওপর টাকার ওপর আত্মসম্মানের চেয়ে বেশী লোভ নেই। তাছাড়া, আমি ত' হরিদাসবাবুর কোন অন্যায় করি নি, যে, তাঁর "ডান-হাত" আমার 'ডান-হাত'টা কাটবার চেষ্টা ক'রে বেড়াবে।

আমার অভিমান বড় কম নয়। কিছু কম হ'লে আর [illegible] এত অজ্ঞাতবাসে থাক্‌তে পারতাম না।

যাই হোক—তুমি আমার বন্ধু। বন্ধু বললে যা মানে হয় তাই। তার এক তিল কম নয়। যা উচিত তুমি করবে।

'পথনির্দ্দেশ' পড়েছ? কেমন লাগল? কিছু মনে পড়ে ভাই—বহুদিনের একটা গোপন কথা? না পড়লেও ক্ষতি নেই—কিন্তু, কেমন লাগল—লিখো। শুন্‌তে পাই এটা সকলেরই খুব ভাল লেগেছে। (যদিও একটু শক্ত-গোছের এবং একটু মন দিয়ে পড়া দরকার)

আজ ক'দিন যেন একটু জরোভাব টের পাচ্ছি। জর না হ'লে বাঁচি। তোমার ছেলে কেমন আছে? আশীর্ব্বাদ করি যেন শীঘ্র আরোগ্য হয়ে ওঠে।

প্রাণধনবাবুকে[১] আমার নমস্কার জানিয়ে—আমার কথাটা একটু মনে ক'রে দিয়ো। নিতান্ত যেন ভুলে না যান, এইটি মাঝে মাঝে কোরো।—শরৎ

প্রমথ, আমার একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে স্থ—র অত কথার মধ্যে হয়ত একটু সত্য নিহিত আছে। হয়ত ওঁরা (অর্থাৎ হরিদাসবাবু প্রভৃতি) বলিয়াছেন যে, আমার একখানি বই দয়া করিয়া তাঁর কাগজে প্রকাশ করিয়া দিলে আমি চিরকৃতজ্ঞ হইয়া থাকিব। মস্ত ভুল প্রমথ। মস্ত ভুল !!

প্রমথ, স্থ—র সঙ্গে দেখা হ'লে জিজ্ঞাসা কোরো তার 'জা—'তে যদি দয়া ক'রে আমার কিছু ছাপায় ত' কিছু টাকাকড়িও না হয় তাকে দিতে পারি। D—swine! সে লোকটা না কি 'পুণ্যের জয়' না কি একটা লিখেছিল। পুণ্যাত্মা লোকের এই লেখাই ত চাই।

১। প্রাণধন চক্রবর্ত্তী। ইভিনিং ক্লাবের অন্যতম সদস্য।

3.5.13.

প্রমথ—'চরিত্রহীন' পেলে কি না সে খবরটাও দিলে না। ইতিপূর্ব্বে দু-চার দিন মাঝে মাঝে চিঠিপত্র পাচ্ছিলাম—কিন্তু এই যে নিজের কায হয়ে গেছে বস্ চুপ ক'রে আছ। যা হোক্ ওটা পড়্লে কি? কি রকম বোধ হয়? আমার সন্দেহ হচ্ছে তোমার ভাল লেগে উঠ্ছে না—অন্ততঃ ভাল বলবার সাহস হচ্ছে না, না? কিন্তু, ভালই হোক আর মন্দই হোক অ্যানালিসিস্ ঠিক্ আছে, না? দার্শনিক গোছের।—নিরস? এইখানে একটা কথা তোমাকে আর একবার মনে ক'রে দিই। যদি ভাল ব'লে না মনে হয়, প্রকাশ করবার তিলমাত্র চেষ্টা কোরো না। হয় 'সাহিত্যে' না হয় 'যমুনা'য়, না হয়, 'ভারতী'তে বেরুতে পারবে, কিন্তু, তোমাদের এটা নূতন কাগজ—একটু 'পুণ্যের জয়,' কিম্বা ঐ রকমের ঘোরাল সতীত্ব, হিন্দুর বিধবা পুড়ে মরছে কিম্বা ঐ রকম জলধর সেন গোছের দিব্যি হবে। লোকেও খুব তারিফ ক'রে বল্বে—হাঁ, হিঁদু কাগজ বটে! হিন্দু ideal বজায় হচ্ছে। তা নইলে এ সব লেখা একে ত' শক্ত, তার পরে তেমন হিঁদু মাখা-মাখি নয়। রুচির দিক্ দিয়ে ত objection নিশ্চয়ই হবে টের পাচ্ছি। এ ব্যবসায় কোন্‌টা ভাল দাঁড়ায় সেইটা দেখা প্রথম উদ্দেশ্য হওয়া চাই। কিন্তু, তোমার স্বাধীন নিরপেক্ষ মতও চাই। আমি জানতে চাই আমার বন্ধু প্রমথনাথ কি বলেন! যদি তোমার নিরপেক্ষ মত এই হয় যে, ওটা ভাল হবে না, তা হ'লে যাতে ভাল হয় তার চেষ্টা করব। তোমার পড়া হয়ে গেলে আমাকে লিখো, আমি চিঠি লিখে দিলে ফণী গিয়ে নিয়ে আসতে পারবে। তোমাদের অনুষ্ঠানপত্র কি এখনও বার হয় নি? বার হ'লে আমাকে যদি দয়া ক'রে একটা পাঠাও ত' বড় ভাল হয়। এবং যখন কাগজে বেরোবে তখন এক কপি পাঠিয়ে দিলে দেখ্‌তে পারব।

তোমাকে একটা পরামর্শ দিই। তুমি না কি ভার নিয়েছ[১] তাই বলা, না হ'লে বলতাম না। যদি ধারাবাহিক নভেল বার কর তা হ'লে যাতে বেশ সন্ন্যাসী টন্ন্যাসী—তপ—জপ— কুলকুণ্ডলিনী ফুলকুণ্ডলিনী থাকে তার চেষ্টা দেখবে। ওটা বাজারে বড় নাম ক'রে দেয়। আর দেখবে যাতে শেষের দিকে হয় দুটো চারটে হুড়মুড় ক'রে ম'রে যাবে—(একটা বিষ খাওয়া চাই!) আর না হয়, কোথা থেকে হঠাৎ সবাই এসে এক জায়গায় মিলে যাবে! এ হ'লে লোকে খুব তারিফ করবে। এবং নূতন কাগজ বার করতে হ'লে এই সব নবেলের বড় আদর। আমাকেও যদি অনুমতি কর আমি চরিত্রহীনের বদলে ঐ রকম একটা চমৎকার জিনিস অতি সত্বর লিখে দিতে পারব। যা ভাল বিবেচনা কর লিখ্‌বে; আমি সেই মতই রচনা সুরু ক'রে দেব। যদি আমাকে হুকুম দাও ত ঐ সঙ্গে দুটো লাল কালিতে ছাপা তন্ত্র টন্ত্র পাঠাবে বিশেষ আবশ্যক। ওগুলো এখানে পাওয়া যায় না। এবং লিখে জানাবে কতগুলো (অর্থাৎ দুটো কি চারটে) সন্ন্যাসী ফকিরের আবশ্যক। নায়িকা সতীত্ব রক্ষার জন্য কি রকম বীরত্ব করবে তারও একটু অভ্যাস দিয়ে দিলে ভাল হয়। এবং ষট্‌চক্রভেদের আবশ্যক কি না তাহাও লিখিবে। ভাল কথা—তোমাদের পরম বন্ধু সু—র সম্বাদ কি, কেমন আছেন তিনি? কি করলেন? কি কি মন্ত্রণা তিনি আজ পর্য্যন্ত দিলেন শুনি? মন্ত্রণা যে মূল্যবান্ হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার আন্তরিক ভালবাসা জেনো।—

তোমার স্নেহের শরৎ

১। "ভারতবর্ষ" পরিচালনার ব্যাপারে প্রমথবাবু একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

প্রমথ; তামাসা করলাম ব'লে রাগ কোরো না যেন! নিছক তামাসা কারু ওপরে কোন রকম reflection নয়, তাহা নিশ্চয় জেনো। তোমাকে একটু তামাসা করলাম শুধু এই জন্যে যে, তুমি না দেখেই 'চরিত্রহীনে'র জন্য মহা হাঙ্গামা লাগিয়েছিলে। আমি তোমাকে অনেক আগেই লিখিছিলাম এটা 'চরিত্রহীন', ষট্‌চক্রভেদ নয়। কেবল Ethics আর Psychology! ধর্ম নয়। যা হোক তুমি যে তোমার দলের মধ্যে আমার জন্যে অপ্রতিভ হবে সেইটাই আমার বড় দুঃখ। যে কেহ তোমাকে এ সম্বন্ধে বলবে তাকেই এই ব'লে জবাব দিয়ো, শরৎ লিখতে যে জানে না তা নয়, তবে এটাতে তার কিছু উদ্দেশ্য আছে, সেটা অসম্পূর্ণ অবস্থায়[১] চোখে পড়ছে না। আমি যে গল্প বানাতে পারি তার কতক নমুনা ছেলেবেলাতেও পেয়েছ, সম্প্রতিও বোধ হয় পেয়েছ। এই ব'লে জবাবদিহি কোরো। আমি ভবিষ্যতে তোমাদের যাতে ভাল লাগে এই রকম ক'রে একটা নভেল লিখে দেবো, কিছু মনে কোরো না। আর এক কথা—অনিলা দেবী আমার দিদি—আমি নয়। কি কোরে তুমি জানলে যে একই ব্যক্তি? কেন এ কথা দ্বিজুবাবুকে বললে? ভাল কর নি, আমি ত তোমাকে কোথাও বলি নি এঁরা এক ব্যক্তি? দু কান চার কান করতে করতে কথাটা (যাহা মিথ্যা) প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। তা হ'লে ভারী লজ্জার বিষয় হবে। কেন না, অনেক তীব্র সমালোচনা দিদি করবেন বলেছেন। ঠাকুরবাড়ীর বিরুদ্ধে তাঁদের কত স্থানে কত ভুল সেই সমালোচনা করবেন ব'লে আমাকে লিখে পাঠিয়েছেন। বোধ করি বড় grand হবে! শুনছি ঠাকুরবাড়ীর প্রায় সবাই শুধু নামের

১। শরৎচন্দ্র প্রমথবাবুর কাছে চরিত্রহীনের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি না পাঠিয়ে কিছুটা অংশ পাঠিয়েছিলেন।

জোরেই আজকাল যা তা লিখছেন। সম্প্রতি ঋতেন্দ্রবাবুর একটা সমালোচনা (ফাল্গুনের 'সাহিত্যে' কাণকাটার ইতিহাস ব'লে যা লিখেছেন) সমস্ত ভুল সম্বাদ, এমন মাথা উঁচু ক'রে সবজান্তা গোছ হয়ে যে মানুষে লিখ্‌তে পারে, দিদি লিখেছেন, এটা তিনি আর কখন কোন ইংরাজী বাঙলা বইয়ে পড়েন নি। আমার বিশ্বাস তাঁর অধ্যয়নটা a little bit wide. এ অবস্থায় লোকে যদি মনে করে একজন সামান্য কেরাণী এবং গল্পলেখক এই সমস্ত গম্ভীর সমালোচনা করছেন সেটা দেখ্‌তে শুন্‌তে বড় ভাল হবে না। তা ছাড়া দিদিও দুঃখ করতে পারেন। কথাটা পার ত উল্টে নিয়ো।[১]—শ

[জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ ?]

প্রমথনাথ—তোমার একসঙ্গে দুইখানি পত্র পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আমি যদিও ফণীর পত্র পাইয়া একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলাম, তথাপি তোমার বৃদ্ধ—মশায়কে লইয়া এতটা করা উচিত হয় নাই। বুড়ো মানুষ শাপ শাপান্ত করিবে ভাল নয়। একটু বিনয় ক'রে বলিও যেন আর কিছু না মনে করেন। তিনি যখন কিছু সত্যই বলেন নাই, তখন এ কথা এই পর্য্যন্ত। আমার তোমাদের Ev. Clubএ যে সুখ্যাতি হইয়াছে শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। কাছে থাকিলে দ্বিজুবাবুকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া আসিতাম। এর বেশী আর কিছুই করিবার আমার বোধ করি ক্ষমতা থাকিত না। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ভাগলপুরে এবং এখানে একটা মতভেদ এই হয় যে, 'রামের সুমতি'র চেয়ে 'পথনির্দ্দেশ' ঢের ভাল। দ্বিজুবাবুকে আমার প্রণাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করিয়ো ত কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ,

১। এখানে শরৎচন্দ্র আত্মগোপনের চেষ্টা করেছেন।

তাঁর কথাটাই final হবে এবং মতভেদও বন্ধ হবে। 'ভারতবর্ষ' যখ
তোমার কাগজের মতই তখন এ বিষয়ে আমার কর্ত্তব্য আমিই স্থি
করব। এ বিষয়ে মনের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে এই কথ
আমার বড় সময় কম। রাত্রে লিখিতে পারি না, সকালে ঘণ্টা দুই, ত
হয়ত তাও সব দিন ঘটিয়া উঠে না। তোমাকে আমার একটা নিবেদ
আমার 'যমুনা'কে একটু স্নেহ কোরো। 'ভারতবর্ষ' যেমন তোমার, 'যমুনা
তেমনি আমার। যাতে ওর ক্ষতি না হয়ে শ্রীবৃদ্ধি হয়, একটু সে দিবে
নজর রেখো ভাই। ফণীকে আমি স্নেহ করি সত্য, কিন্তু তাই ব'লে যে
তোমার অসম্মান ক'রে কিম্বা তোমাকে উপেক্ষা ক'রে, তা সে ফণী কেন
কাহারো জন্যই সেটা আমি পারিব না। সেই জন্যই 'চরিত্রহীন'
পাঠাই। যদিও এই পাঠানো লইয়া অনেক কথা হইয়া গিয়াছে এবং
হইবে, তাহা জানিয়াও আমি পাঠাইয়াছি। যা হোক্ তোমাদের যখন
ওটা পছন্দ হয় নাই, তখন আমাকে ফেরত পাঠাইয়ো। বিজ্ঞাপন যেমন
দেওয়া হইয়াছে, সেই মত 'যমুনাতে'ই ছাপা হইবে। তুমি বলিয়াছ
একেবারে পুস্তকাকারে ছাপাইলে ভাল হয়। সত্য, কিন্তু এতটা অগ্রসর
হইয়া পড়িয়াছে, যদি নিজের স্বার্থের জন্য ফণীকে না দিই সে বড়ই
দেখিতে মন্দ এবং লজ্জাকর হইবে। তুমি যা লিখিয়াছ তাহা আমিও
জানিতাম। আমি জানিতাম, ওটা তোমাদের পছন্দ হইবে না এবং সে
কথা পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াওছিলাম। তবে, সম্বন্ধে আমার এই একটু
বলিবার আছে যে, যে লোক জানিয়া শুনিয়া 'মেসের ঝি'কে আরম্ভতেই
টানিয়া আনিবার সাহস করে, সে জানিয়া শুনিয়াই করে। তোমরা
ওকে, ওর শেষটা না জানিয়াই অর্থাৎ সাবিত্রীকে মেসের ঝি বলিয়াই
দেখিয়াছ। প্রমথ, হীরাকে কাঁচ বলিয়া ভুল করিলে ভাই। অনেক
বিশেষজ্ঞ ও বইটা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। ইহার উপসংহার জানিতে

চাহিয়াছ। এ একটা Scientific Psych: and Ethical Novel: আর কেউ এ রকম করিয়া বাঙলায় লিখিয়াছে বলিয়া জানি না। এইতেই ভয় পেলে ভাই? কাউন্ট টলষ্টয়ের 'রিসরেকশন' পড়েছ কি? His Best Book একটা সাধারণ বেশ্যাকে লইয়া। তবে, আমাদের দেশে এখনো অতটা art বুঝিবার সময় হয় নাই সে কথা সত্য। যা হৌক, ওটা যখন হইল না তখন এ লইয়া আলোচনা বৃথা। এবং আমারও তেমন মত ছিল না। তোমাদের ওটা নূতন কাগজ, ওতে এতটা সাহসের পরিচয় না দেওয়াই সঙ্গত। তবে, আমারও আর অন্য উপায় নাই। আমি উলঙ্গ বলিয়া artকে ঘৃণা করিতে পারিব না, তবে যাতে এটা in strictest sense moral হয় তাই উপসংহার করব। আমাকে Registry ক'রে পাঠিয়ে দিও, ফণীকে দিবার আবশ্যক নাই। তোমাদের প্রথম সংখ্যার[১] জন্য কি দিব ভাই? কি রকম চাও একটু লিখে জানালে বড় ভাল হয়। আমার যথাসাধ্য করিব। হাঁ, আর একটা কথা, এর পূর্ব্বে আমাকে যদি কেহ এ বিষয়ে একটু সতর্ক করিত, অর্থাৎ বলিত—ঝি লইয়া স্বরু করাটা ঠিক নয়, আমি হয়ত আলাদা পথ দিয়া যাইবার চেষ্টা করিতাম। তা সে কথা কেহই বলিয়া দেয় নাই। এখন too late. 'পাষাণ'টা কি ভাল মনে নেই। নিজের কাছেও নেই। তা ছাড়া ও ছেলেবেলার লেখা। না দেখে না সংশোধন ক'রে কিছুতেই প্রকাশ করা যায় না। করলে হয়ত কাশীনাথের মত হয়ে দাঁড়াবে। আমার 'চন্দ্রনাথ' গল্পটা মনে আছে? সেটাকেও এখন সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে ঢালতে হয়েছে। সেটা যমুনায় বেরুচ্ছে। এটা শেষ হ'লে চরিত্রহীন বার করা হবে ব'লেই সকলে স্থির করেছেন। সমাজপতি মশাইকে

১। ১৩২০ সালের আষাঢ় মাসে ভারতবর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

দিবার কথা ছিল, এবং এ জন্য তিনি পত্রাদিও লিখেছিলেন কিন্তু ফণীর কাগজ যে আমার কাগজ।

তুমি ফণীর উপরে রাগ কোরো না। লোকটা ভালই। কিন্তু সে কি ক'রে জানবে তুমি আমি কি, এবং ২০ বছরের কি ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ। লোক মনে করে বন্ধু। কিন্তু বন্ধুত্ব যে কাহাদের মধ্যে, কিরূপ বন্ধুত্ব তা সে বেচারা কি ক'রে জানবে? তোমার আমার কথা তুমি আমি ছাড়া আর ত কেউ জানে না প্রমথ! যদি কোনদিন এ বিষয়ে তার সঙ্গে তোমার কথা হয় বোলো, বাইরের লোককে কি জানাব, শরৎ আমার কি এবং আমি শরতের কি! বরং না জানাই ভাল। তুমি আমাকে যা যা লিখেছ একটু ভেবে চিন্তে পরে তার জবাব দেব। তুমিও একটু শীঘ্র জবাব দিয়ো। হরিদাস বাবুকে এবং প্রাণধন ভায়াকে আমার কথা একটু মনে ক'রে দিও।—শরৎ

(ডাকমোহর ১২ মে, ১৯১৩)

প্রমথনাথ—তোমার তৃতীয় পত্র পাইলাম। পূর্ব্ব পত্রের যথাসাধ্য উত্তর দিয়াছি, তথাপিও যে ইহার উত্তর লিখিতে বসিয়াছি, তাহার কারণ আমি তোমাকে শুধু যে ভালবাসি তাহা নহে, শ্রদ্ধাও করি। অর্থাৎ মতামতের উচ্চ মূল্য দিই। আমার যাহা বলিবার বলি, তাহার পরেও যদি তোমার সেইরূপ ইচ্ছাই থাকে, যথাসাধ্য তোমার অভিরুচি পালন করিতে চেষ্টা করিব। লিখিয়াছ বিধবা ভিন্ন ছোট গল্প জমে না (ঠাট্টা করিয়া?) হয়ত তোমার কথাই সত্য, অত বড় বঙ্কিমবাবুও তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস দুটিতে (কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ) বাদ দিতে পারেন নাই। তুমি আমার 'পথনির্দ্দেশ'কেই কটাক্ষ করিয়া বোধ করি বলিয়াছ। বুঝিতেছি ওটা তোমার ভাল লাগে নাই। তাই যদি সত্য

হয়, আমার উপদেশ এই, আর উপন্যাস গল্প প্রভৃতি লিখিতে চেষ্টা ত নিশ্চয়ই করিবে না, পড়াও উচিত হইবে না। এক একটা painter যেমন colour blind থাকেন, তুমিও তাই। 'রামের সুমতি'তে আর্ট কম তবুও যদি একেই এত ভাল লাগিয়া থাকে, যার কাছে তার পরেরটাও কিছুই নয় হয়, তাহা হইলে আমি সত্যই নিরুপায়। এ শুধু আমার মত নয়। কথাটা বিশ্বাস কর এ প্রায় সকলেরই মত। তা ছাড়া, আমার উপর যদি তোমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে আমি নিজেও এই বলি। পরিশ্রমের হিসাবে, রুচির হিসাবে, আর্টের হিসাবে 'পথনির্দ্দেশে'র কাছে 'রামের সুমতি'র স্থান নীচে। অনেক নীচে। আমি একটা সম্পূর্ণ গৃহস্থ চিত্র লিখিব স্থির করিয়া 'রামের সুমতি'র মত একটা নমুনা লিখি—এই রকম হিন্দু গৃহস্থ পরিবারে যত রকমের সম্বন্ধ আছে—সব রকম সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া এক একটা গল্প লিখিয়া এই বইখানি সম্পূর্ণ করিব। এটা শুধু মেয়েদের জন্যই হইবে। যাক। 'চরিত্রহীন' ফিরিয়া (registry) পাঠাইয়ো। এ সম্বন্ধে ঋষি Tolstoy'র "Resurrection" (the greatest book) পড়িয়ো। অঙ্গবিশেষ যে খুলিয়া লোকের গোচর করিতে নাই, তাহা জানি, কিন্তু ক্ষতস্থান মাত্রই যে দেখাইতে নাই জানি না। ডাক্তারের উপমাটি ঠিক খাটে না। সমাজের যদি কেউ ডাক্তার থাকে, যার কাজ ক্ষত চিকিৎসা করা, সে কে শুনি? যাহা পচিয়া উঠে তাহাকে তুলা বাঁধিয়া রাখিলে পরের পক্ষে দেখিতে ভাল হইতে পারে, কিন্তু ক্ষত যে লোকটার গায়ে, তার পক্ষে বড় সুবিধা হয় না। শুধু সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা ছাড়াও উপন্যাস-লেখকের আরো একটা গভীর কায আছে। সে কাযটা যদি ক্ষত দেখিতেই চায়—তাই করিতে হইবে। Austin, Mary Corelli প্রভৃতি এবং Sara Grend

সমাজের অনেক ক্ষত উদ্ঘাটন করিয়াছেন, আরোগ্য করিবার জন্য, লোককে শুধু শুধু" দেখাইয়া ভয় দেখাইয়া আমোদ করিবার জন্য নয়। তা ছাড়া central figure করিতেছি কি করিয়া বুঝিলে? অবশ্য বদনাম যে হইবে তাহার নমুনা পাইতেছি, কিন্তু জানই ত, ভয়ে চুপ ক'রে যাওয়া আমার স্বভাব নয়। তুমি বলিতেছ, প্রমথ, লোকে নিন্দা করিবে, হয়ত তাই, কিন্তু এই এক 'চরিত্রহীন' অবলম্বন করিয়া 'যমুনা'র কিরূপ উন্নতি হইবে না-হইবে, দেখাও আবশ্যক। মনে করিও না, যাহা ছোট, তাহা কিছুতেই বড় হইতে পারে না। ছোটও বড় হয়, বড়ও ছোট হয়। সেও যাক্। গল্প লিখিয়া তোমাদের মনোরঞ্জন করিতে পারিব, সে আশা আমি আজ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিলাম। তোমাদের কাগজের জন্য কিরূপ গল্প খাটিবে—এটা বুঝিতে পারাই আমার পক্ষে শক্ত হইবে। এ যদি সন্দেশ তৈরি হইত, না হয় একটু ছোট বড় করিয়া ছানা চিনির ভাগ বেশী কম করিয়া করিতাম—কিন্তু এ যে মনের 'সৃষ্টি'। সেই জন্য সহস্র চেষ্টা করিলেও, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে ইচ্ছা করিলেও তোমার কাগজের জন্য কিছু করিতে পারিব তাহাও ভরসা করিতে পারিতেছি না। বাস্তবিকই যদি তোমার কাযে আসিতে পারি, তার চেয়ে সৌভাগ্য আমার আর কি হইতে পারে, কিন্তু আমার কায যে তোমাদের কাছে অকায বলিয়া ঠেকিবে। কিন্তু একটা কথা বলি ভাই, রাগ করিও না—তোমার view এত narrow হইয়া গেল কিরূপে এই একটা কথা আমি কেবলই মনে করিতেছি। তুমি "নারীর মূল্যে"র সুখ্যাতি করিয়াছ—জ্যৈষ্ঠের সংখ্যা (যমুনা) পড়িলে তুমি যে কত নিন্দাই করিবে আমি তাই ভাবিতেছি। তোমার "অর্থের মূল্য" লেখ। কি রকম লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছ, খুব ভাল। তবে বিদ্বানের সব দেশে

পূজা হওয়া (বড়লোকের চেয়ে) উচিত নয়—কথাটা প্রমাণ করিবে কি করিয়া বলিতে পারি না। অবশ্য পূজা ত সে পায় না কিন্তু পাওয়া উচিতও নয় সেইটাই প্রমাণ করা শক্ত হইবে বোধ হয়। তোমাদের কাগজের চারিদিকেই নাম হইয়াছে, সকলেই বলিতেছেন দুই এক মাস নমুনা দেখিয়া তবে গ্রাহক হওয়া উচিত কি না বিবেচনা করিব। সুতরাং প্রথম দুই এক সংখ্যা যা-তা হইলে কখনই চলিবে না। কেন না দাম ঢের বেশী—ঠিক এই পরিমাণেই লোকে আশা করিবে। অন্ততঃ এই ত বর্ম্মার view. প্রথমেই যেন লোকে prejudiced না হইয়া যায়। আশা করি ফিরৎ ডাকে 'চরিত্রহীন' পাঠাইবে। তোমাকে পূর্ব্ব পত্রেই জানাইয়াছি—ওটা যমুনাতেই বাহির হইবে—অবশ্য কাগজ বড় করিয়া। অবশ্য ফলাফল তার কপাল আর আমার চেষ্টা এবং ভগবানের হাত। নামে প্রকাশ করার কথা? এত কুরুচিপূর্ণ তখন ত নিশ্চয়ই আমার নিজের নামে প্রকাশ করা চাই। যা শক্ত জিনিস সেই ভার সইতে পারে। আর এক কথা। চোখের বালি তার নিন্দার কারণ বিনোদিনী ঘরের বৌ। তাকে নিয়ে এতখানি করা ঠিক হয় নাই। এটায় বাড়ীর ভিতরের পবিত্রতার উপরে যেন আঘাত করিয়াছে। যেমন পাঁচকড়ির "উমা"। আমি ত এখনো কাহারো পবিত্রতায় আঘাত করি নাই; পরে কি করিব কি জানি! তুমি আমার উপর রাগ করিয়ো না প্রমথ। তোমাকেও যদি মন খুলিয়া না বলিতে পারি, তা হইলে আর কাকে বলিব? তোমাকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা আমার খুবই প্রবল ছিল, কিন্তু আর সাহস নাই। 'বিধবা' ছাড়া গল্প জমে না, এই যখন তোমাদের negative standard—তখন আমার আর কিছুমাত্র উপায় নাই। তোমাদিগকেও একটা সামান্য উপদেশ আমার দিবার আছে, ইচ্ছা হয় গ্রহণ করিয়ো, না হয় করিও না। তোমাদের পোষা

লেখকগুলিকে যদি অমন ফরমাস্ দিয়া লেখাও, আর প্রতিপদে overseerএর মত 'level' দড়ি হাতে মাপ জোক করতে যাও, সমস্ত লেখাই আড়ষ্ট হবে। এ কাগজ ultimately failure হবে। যারা সুলেখক, এবং যথার্থই যাহাদিগকে 'কবি' বলিয়া মনে কর, তাহাদের সমালোচনা কর, কিন্তু লেখাও প্রকাশ কর। লোককে ভাল মন্দ দুইই বলিবার সুযোগ দাও—গাল দাও কিন্তু প্রকাশ হইবার পক্ষে অন্তরায় হইয়ো না। পাদরিদের 'hymn' বা গির্জ্জার 'prayer' শুধু যদি নিজেদের কাগজটাকে ক'রে তোল সে টিকসই হবে কি? আমি অনেক কথা লিখলাম—কিন্তু এখন ভয় হচ্ছে পাছে মনে কর আমার এই লেখার মধ্যে একটু রাগ বা জালা আছে। কিচ্ছুটি নেই। তুমি যে আমাকে সরলভাবে লিখেছ এতে আমি সত্যই কৃতজ্ঞ। এতে আমি বুঝতে পাচ্ছি, এমন অবস্থায় যিনি মিত্র ন'ন তিনি কি বল্‌বেন। অবশ্য বইটাকে immoral বলায় একটু দুঃখিত যে না হয়েছি তা নয়, কিন্তু উপায় কি? ভিন্নরুচিৰ্হি লোকঃ। 'পথনির্দ্দেশ' গল্পটাই যখন 'immoral' ঠেকেছে (কারণ লিখেছ,—"এটা ঠাট্টা" কিন্তু কোন্‌টা ঠাট্টা বোঝা ভার) তখন 'চরিত্রহীন' এ ত স্পষ্টই নিশান এঁটে দিয়ে immoral করা হয়েছে। এও যাক। তোমার খবর কি? খুব ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছ না? বাস্তবিক একটা মাসিক চালানো ভয়ঙ্কর শক্ত। কোন ক্রমশঃ উপন্যাস বার হবে কি? লেখক কে? কিন্তু জলধর সেন্ টেনের বিশুদাদা টাদা অত্যন্ত একঘেয়ে হয়ে গেছে। আমাদের এখানেও বড় কম বাঙ্গালী নেই এবং যারা আছে তারা একটু বেশ বোঝে সোঝেও, কিন্তু ওসব আর কেউ পড়তে চায় না। এমন কিছু বার কর্‌বার চেষ্টা কর যা—উজ্জ্বল! পতঙ্গ যেমন আগুনের পাশ থেকে নড়তে পারে না, আশা করি তোমরা যা বার কর্‌বে আমরা

তাতে সেইরূপ আকৃষ্ট হয়েই থাক্‌ব। তা যদি না পার, কাগজ চালিয়ো না। সেই থোড়—বড়ি—খাড়া আর খাড়া—বড়ি—থোড়ে আর আবশ্যক কি? আমার মনে আছে 'বঙ্গদর্শনে' যখন রবিবাবুর 'চোখের বালি' আর 'নৌকাডুবি' বার হয় লোকে যেন বঙ্গদর্শনের আশায় পথ চেয়ে থাক্‌ত। আসা মাত্র কাড়াকড়ি পড়ে যেত। তোমরা যদি কিছু কর, যেন এমনি successful হয়। কারণ তোমাদের resource বিস্তর—হাতে বিস্তর লোক আছে। এবং সবচেয়ে বেশী (টাকা) জিনিসটাও আছে। শুনেছি, তোমাদের অনুষ্ঠানপত্র বার হয়েছে, খুব আশা করেছিলাম একটা পাব। বোধ করি পাঠাবার আর আবশ্যক বিবেচনা কর নি। যাই হৌক তাতে কি কি ছিল একটু সংক্ষেপে যদি লিখে জানাতে পার হয় ভাল। আজ এই পর্য্যন্ত। কি জানি এত বড় দীর্ঘ পত্র লিখিয়া তোমাকে ব্যথা দিলাম, কি, কি করিলাম। আমিও ব্যথা পাইয়াছি। তুমি যে লিখিয়াছ চরিত্রহীন অপরের নামে প্রকাশ করিতে এইটাতেই সবচেয়ে বেশী। আমি কি এতই হীন? যা আমার মন্দ জিনিস তাকে বেশী ক'রেই আমার নামের আশ্রয় দেওয়া চাই। তা না করিয়া একটা fictitious নামে (নিজের নাম বাঁচাইবার জন্য) চালাইব? ভাল মন্দ যাই হোক consequence আমার ভোগ করা চাই। নাম আবার কি? কে এর লোভ করে? সে লোভ থাকিলে ভায়া, এত দিন চুপ করিয়া নষ্ট করিতাম না। আমার ভালবাসা জানিয়ো, মাঝে মাঝে চিঠিপত্র দিয়ো।—শরৎ

(ডাকমোহর ২৪ মে, ১৯১৩)

প্রমথ—দ্বিজুদার মৃত্যুসংবাদ[১] Rangoon Gazetteএ পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। তাঁহাকে আমি যে খুব কম জানিতাম তাহা নহে; অবশ্য তোমাদের মত জানিবার অবকাশ পাই নাই, কিন্তু যেটুকু জানিতাম, আমার পক্ষে তাহা বড় কম ছিল না। সত্যই তাঁহার স্থান অধিকার করিবার লোক মিলিবে না। কে যে কখন যাত্রা করেন তাহা কিছুতেই অনুমান করা যায় না। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙালী মাত্রেরই ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু তোমাদের পাড়ার যে কিরূপ ক্ষতি হইল, তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি। তাঁহার ছেলে, বাড়ী, Evening Club প্রভৃতির আরো একটু বিস্তারিত সম্বাদ শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম—এবার যখন পত্র লিখিবে একটু জানাইয়ো। তোমাদের ভারতবর্ষের সত্যই বড় দুরদৃষ্ট। আমি ভাবিয়াছিলাম হয়ত, এ কাগজ আর বাহির হইবে না। বাহির হইলেও খুব সম্ভব ইহা টিকিবে না। কারণ ইহার আসল আকর্ষণই অন্তর্হিত হইয়া গেল। যদি সম্ভব হয় অন্য সম্পাদক করিয়ো না। সারদা মিত্র কি করিবেন?[২] তিনি ভাল জজ এবং তৃতীয় শ্রেণীর সমালোচক। Compilerও বটে, লেখা অত্যন্ত মামুলি ও পুরাণ ধরণের। তিনি খুব সম্ভব failure হইবেন। সাহিত্য-পরিষদের মোড়ল[৩] হওয়া এক, মাসিক কাগজের সম্পাদক হওয়া আর। তিনি সাহিত্যিক ন'ন এটা মনে রাখিয়ো। অবশ্য

১। ভারতবর্ষের প্রথম সংখ্যার কিছুটা অংশ মাত্র সম্পাদনা করেই দ্বিজেন্দ্র লাল রায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

২। হাইকোর্টের জজ সারদাচরণ মিত্রকে ভারতবর্ষের সম্পাদক করা হবে, এরূপ একটা কথা উঠেছিল। কিন্তু তাঁকে সম্পাদক না করে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও জলধর সেনকে সম্পাদক করা হয়েছিল।

৩। সারদাবাবু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ছিলেন।

তোমরা কলিকাতায় থাক, আমরা মফস্বলে থাকি ; এ সব মতামত আমরা দিতে পারি না। দিলেও তোমাদের কাছে সেটা বোধ করি তেমন গ্রাহ্য হইবে না—যাই হৌক, যাহা ভাল বুঝিলাম, বলিলাম। এবং তাঁহাকে সম্পাদক করিলে যাহা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বিশ্বাস করি তাহাই জানাইলাম। শেষে আমার কথা। তাঁহার মান্য রক্ষা করিবার জন্য যাহা আমার সাধ্য তাহা নিশ্চয়ই করিতাম কিন্তু এখন তিনি আর নাই। তিনি সাহিত্যিক এবং যোদ্ধা ছিলেন, তিনি আমার মূল্য বুঝিতেন—এবং না বুঝিলেও, তাঁর কাছে আমার অপমান ছিল না। সেই জন্য মনে করিয়াছিলাম লিখিয়া পাঠাইব। তিনি ভাল বুঝিলে প্রকাশ করিবেন, না ভাল মনে করিলে প্রকাশ করিবেন না, তাহাতে লজ্জার কোন কারণ ছিল না—অভিমানও হইত না, কিন্তু এখন যে-সে আমার দাম কষিবে, হয়ত বলিবে প্রকাশ করার উপযুক্ত নয়—হয়ত বলিবে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দাও বা 'file' কর। সুতরাং আমাকে ভাই ক্ষমা কর।—তুমি আমার কত বড় সুহৃৎ তাহা আমি জানি—সে কথাটা এক দিনের তরেও ভুলিব না। তুমি আমাকে ভুল বুঝিলে বা আমার উপর রাগ করিলেও আমার মনের ভাব অটল থাকিবে, কিন্তু, এ অন্য কথা। অপরের কাগজের জন্য আমি নিজের মর্য্যাদা নষ্ট করিব না। সুরু হইতেই তোমাকে বলিতেছি তোমাদের লেখকেরা সাগরতুল্য। যাঁহাদের রচনা এবার বাহির হইবে বলিয়া লিখিয়াছ, অনুরূপা, বিদ্যাবিনোদ, নগেনবাবু[১] প্রভৃতি। তাঁহাদের লেখার কাছে আমার লেখা যে গোষ্পদের মত দেখাইবে! আমি ছোট কাগজে লিখি ভাই, আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। আমি সেখানে সম্মান পাই,

১। অনুরূপা দেবী, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, নগেন্দ্রনাথ বসু।

শ্রদ্ধা পাই—এর বেশী আর কিছু আশা করি না। আর একটা কথা চরিত্রহীন সম্বন্ধে। আমার সুরেন মামা লিখিয়াছেন—হরিদাস বাবুও তাঁহাকে জানাইয়াছেন ওটা এতই immoral যে কোন কাগজেই বাহির হইতে পারে না। বোধ হয় তাই হইবে—কারণ তোমরা আমার শত্রু নও, যে মিথ্যা দোষারোপ করিবে—আমিও ভাবিতেছি ওটা লোকে খুব সম্ভব ওই ভাবেই প্রথমে গ্রহণ করিবে। আমিও সেই কথা স্পষ্ট করিয়া এবং তোমার সমস্ত argument ফণীকে খুলিয়া লিখিয়াছিলাম, তৎসত্ত্বেও সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে যমুনাতে ওটা বাহির করিতেই হইবে তাহার বিশ্বাস আমি এমন কিছু লিখিতেই পারি না যাহা immoral সেই জন্য বাধ্য হইয়া তোমার অনুরোধ ভাই রক্ষা করিতে বো হয় পারিলাম না। কারণ advertise করা হইয়াছে আর ফিরা যায় না। আমার নিজের নামের জন্য আমি এতটুকুও মনে ভাবি না। লোকের যা ইচ্ছা আমার সম্বন্ধে মনে করুক, কিন্তু সে যখ বিশ্বাস করে, চরিত্রহীনের দ্বারাই তাহার কাগজের শ্রীবৃদ্ধি হইবে এবং immoral হোক, moral হোক লোকে খুব আগ্রহের সহি পাঠ করিবে—তখন সে যাহা ভাল বোঝে করুক। তবে, একট উপায় করিতে হইবে। 'রামের সুমতি'র মত সরল স্পষ্ট গ পাশাপাশি প্রকাশ করিয়া চরিত্রহীনের effect mild করিয়া আনিে হইবে। ফণী লিখিয়াছে লোকে আমার গল্প পড়িবার জন্য উত হইয়া আছে। যাক এ কথা। 'কাল' আমার 'বিচার করিবে। মানু সুবিচার অবিচার দু-ই করিবে সে জন্য দুর্ভাবনা করা ভুল। যাক্ এই সময়টা যদি আমি কলিকাতায় থাকিতাম, তোমাদের ভারতবর্ষে জন্য অনেক করিতে পারিতাম। কোন নামজাদা সম্পাদকে আড়ালে থাকিয়া কাগজটাই edit করিয়া দু এক মাস চালাইয়া দি

পারিতাম। আমি শুধু পদ্য লিখিতেই পারি না, তা ছাড়া সব রকমই পারি, এবং যেটা সম্পাদকের প্রধান কাজ, 'সমালোচনা' (অপর কাগজের লেখার উপর) সেটাও আমার বেশ আসে। তবে, যখন কলিকাতাতে নাই, এবং শীঘ্র থাকিব এ আশাও নাই—তখন এ সব কথার আলোচনায় লাভ নাই। এই দূর দেশে কম সময়ে আমি শুধু যমুনার জন্যই একটু আধটু লিখিতে পারি এর বেশী সময় এবং স্বাস্থ্য দু-ই নাই। তুমি আমার উপর যেন একটুও দুঃখ করিও না এই আমার মিনতি। দ্বিজুবাবু আর নাই—আর আমিও অন্য সম্পাদকের কাছে নিজের লেখার যাচাই করিতে পারিব না। সেটা আমার পক্ষে অসাধ্য। অবশ্য রবিবাবু ছাড়া। তা ছাড়া আমি একরকম প্রতিশ্রুত হইয়াছি, ছোট্ট যমুনাকে বড় করিব। এ জন্য আমার শিষ্যমণ্ডলীকেও[১] অনুরোধ করিতে হইবে বলিয়াও একটা কথা উঠিয়াছে। আমি জানি আমাকে তারা এত শ্রদ্ধা করে যে, আমি অনুরোধ করিলে তাহা কিছুতেই অস্বীকার করিবে না—শুধু এই জন্যই এখনো তাহাদিগকে অনুরোধ করি নাই। আশা আছে প্রমথ, এদের সাহায্য লইলে আমার সঙ্কল্প কাজে পরিণত হইবে। শুনিতেছি এরি মধ্যে যমুনার বেশ আদর হইয়াছে। তাই প্রতি মাসে যদি এমনই আদর অর্জ্জন করিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বড় হইবে আশা করা যায়। কাগজটা আগামী বৎসর হইতে ডবল সাইজে বাহির করিবার কথা আছে। তোমার কথা রাখিবার জন্য

১। শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরের "সাহিত্য সভা"র যাঁরা সভ্য-সভ্যা ছিলেন—বিভূতিভূষণ ভট্ট, নিরুপমা দেবী, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।

সমস্ত জানিয়াও এবার চরিত্রহীন পাঠাইয়াছিলাম আবার যখন আবশ্যক হইবে, তোমার কথা রাখিবই। কিন্তু পরের জন্য আমাকে আর লজ্জা দিও না ভাই। হরিদাস তোমার বন্ধু, আমি কি তার চেয়ে কম? তোমাকে যত লোক যত ভাল বাসিয়াছে, আমি কারুর চেয়ে কম বাসি নাই, সেই কথাটা যখন আমার উপর রাগ হইবে তখন স্মরণ করিয়ো। আর কি বলিব! আমি ওখানে লেখা দিয়া আর অপ্রতিভ হইতে ইচ্ছা করি না। ওখানে ঢের বড়লোক লেখেন, আমার জন্য এতটুকু এক তিলও ফাঁক পড়িবে না। ফণীও তোমার নাম করিয়াছে। বিস্তর সুখ্যাতি করিতেছিল।

তোমার নিজের সম্বাদ লিখিবে। আমার সম্বাদ একই রকম। কখন ভাল, কখন মন্দ। রেঙ্গুন আর সহ্য হইতেছে না, প্রতি পদেই টের পাইতেছি। কিন্তু অন্য কোন উপায়ও দেখিতে পাইতেছি না। কি জানি এইখানের মাটিই কেনা আছে কি না!—তোমার স্নেহের শরৎ

31. 5. 13
Rangoon.

প্রমথনাথ—আজ তোমার পত্র পাইয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, আমার পূর্ব্বেকার পত্র তোমার হাতে যায় নাই। যদি এত দিনে গিয়া থাকে নিশ্চয়ই সমস্ত বুঝিয়াছ। এই ত ভাব। তার পরে আমার যাবার কথা। আগে চাকরির ব্যাপারটা বলি। আমাদের বড় সাহেব Newmarch. 'গোরা'তে রবিবাবু বলিয়াছেন "আমি মাধব চাটুয্যে নীলকরের গোমস্তা।" এর বেশী আর বলার আবশ্যক নাই।

Newmarchও ঠিক তাই। ইনি এক বৎসর আসিয়া ৩৭ জন কেরাণীকে reduce করিয়াছেন। অপরাধ একজনের চিঠি despatch করতে ৩ দিন দেরী হয়—আর একজনের একখানা ১৫ দিনের পুরাণ চিঠি বার হয় এই রকম। এঁর দৌরাত্ম্যে, Deputy Acctt. General Chanter সাহেব, Dy. Acctt. General শ্রীনিবাস আইয়ার, Asst. Acctt. General সুন্দরাম, Asst. Acctt. General Mgset, ১ মাসের মধ্যে Medical certificate দিয়ে পালাতে বাধ্য হয়। আমাদের প্রত্যেকের কাজ প্রায় দ্বিগুণ ক'রে দিয়ে, আমাদের P. W. D. লোকেদের নিজের অফিসে নিয়ে গেছে। আমাদের office hour, strictly with hardest labour from 10-30 to 6-30। নিয়ম এই যে যদি কারু কোন দিন কোন তরফ থেকে reminder আসে—৬ মাসের জন্য ১০৲ হিসাবে (জরিমানা) reduction. এই ত সুখের চাকরি। তার উপর সে দিন Local Govt.কে এই ব'লে move করেছেন যে আফিসের কেরাণী ঘুষ দিয়ে m. certificate দিয়ে পালায়, তাতে আফিসের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। সেই জন্য আফিসের চিঠি না গেলে Civil Surgeon কাউকে যেন m. certificate না দেন। আমাদের এখন m. c. দেবার পথও বন্ধ হয়েছে। M. c. দিলেও বলে ওর Service bookএ নোট ক'রে রাখ মিথ্যা m. c.। বর্ম্মা ব'লেই এত জুলুম চ'লে যাচ্ছে। দিন ৩।৪ পূর্ব্বের ঘটনা বলি। হঠাৎ আমার একটা reminder আসে। এত কাজ যে ছোটখাট কাজ আমি দেখতেই পারি না—এটি আমার Sub Auditor ভৌমিক বাবু ও Peria Swamyর দোষ, অবশ্য আমিই সমস্ত দোষ নিলাম। Explanation দিলাম আমারই oversight: ইত্যবসরে resignation লিখে রাখলাম। ঠিক জানি ১০৲ টাকা গেছেই।

এ অপমান সহ্য ক'রে যে চাকরি করে সে করে, আমি ত কিছুতেই পারব না, এই জেনেই লিখে রাখি। যা হোক কি জানি New-march দয়া ক'রে কোন কথাই বল্লেন না। দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানি না, আমার আর resignation দেওয়া হ'ল না। কিন্তু শরীরও আমার আর বয় না। লেখা-টেকাও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এত দিন চাকরি কচ্ছি ভাই, এমন ভয়ানক দুর্দ্দশায় কখন পড়ি নি। সে দিন ঝোঁকের উপর লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ ক'রে মিত্তির মশাইকেও[১] চিঠি লিখি যে যা হোক একটা চাকরি কলকাতায় দাও, আমি resign দিয়ে চ'লে যাই। তাঁর এখনো জবাব আসবার সময় হয় নি। তবে এও বুঝতে পাচ্ছি এই সাহেব (ডালকুত্তা) যদি না যায়, শীঘ্র যাবার বড় আশাও দেখি নে—তা হ'লে আমাকে অন্ততঃ ছাড়তেই হবে। শালা অন্য অফিসে application পর্য্যন্ত forward করে না। ঢের পাজি লোক দেখেছি কিন্তু এমনটি শোনাও যায় না।

দেখি মিত্তির মশাই কি লেখেন।

আমার 'ভারতবর্ষে' লেখার অনেক গোলমাল। সারদাবাবুকে জানি না—তিনি যে কি করবেন তিনিই জানেন। দ্বিজুবাবুই এ কাজ পারতেন—এ কি সারদাবাবুর দ্বারা হবে। ওর চেয়ে তোমার যোগ্যতা এতে বেশী। বিদ্যাপতি edit করা আর ভারতবর্ষ edit করা এক জিনিস নয়। তা ছাড়া তাঁর অনেক কায। এ selection একেবারেই ভাল হয় নি। সারদাবাবু সত্যরঞ্জন রায়ের 'অবগুণ্ঠিতা'র যে প্রশংসা করেছিলেন, তাইতেই বোঝা গেছে উনি কি রসগ্রাহী!!

১। রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রকে যে মণীন্দ্রকুমার মিত্র চাকরী করে দিয়েছিলেন, সম্ভবতঃ ইনি তাঁরই কেউ হবেন।

সত্যরঞ্জন এখানে ছিল তার অনেক লেখাই পড়েছি। অবগুণ্ঠিতার চেয়ে হেমেন্দ্রপ্রসাদের[1] 'অধঃপতন' ভাল।

Very bad selection—ভারতবর্ষ এক বৎসরের মধ্যে 'Failure' হবে !!!

এ যদি না হয়, মিথ্যাই এত দিন সাহিত্য সেবা করলাম।

দ্বিজুবাবুর মৃত্যুর পর রবিবাবু ছাড়া এত বড় কাগজ—এত বেশী আয়োজন, এত বেশী subscription—আর কেউ চালাতে পারবে না। হরিদাসবাবুর বোধ করি বন্ধ ক'রে দেওয়াই উচিত। এ কাগজ successful হবার হ'লে দ্বিজুবাবু অন্ততঃ ৬টা মাসও বাঁচতেন। এই আমার ধারণা। একে superstitionই বল আর যাই বল।

দ্বিজুবাবু আবশ্যক হ'লে ও কাগজ প্রায় একাই ভরিয়ে দিতে পারতেন। প্রবন্ধে, গল্পে, নাটকে, কালিদাস ভবভূতির সমালোচনার মত সমালোচনায় যেমন ক'রে হোক আবশ্যক হ'লে চালিয়ে দিতে পারতেনই—এ কি আর কারো কাজ। তা ছাড়া কাগজ যে ছোট নয়—৬৲ টাকা চাঁদা—সেটাও বড় কম ভাবনার বস্তু নয়। প্রবাসী এত দিনের কাগজ—এতটা স্থায়িত্ব লাভ করেছে, তবু তাকে অনুবাদ ক'রে, পাঁচটা খবরের কাগজের বাজে খবর তুলে ভরাতে হয়। ওর অর্দ্ধেকের উপর ত অপাঠ্য। তবু ওর চাঁদা কম। তোমাদের সে excuseও নাই। তা ছাড়া, ভাই, অনেকেই বলে লিখবে, কিন্তু শেষকালে যারা নিতান্ত তোমার আমার মত লেখক তারাই লেখে। তা ছাড়া ভাল লেখক প্রায়ই লেখে না। দ্বিজুবাবুর সঙ্গে কি শুধু তিনিই গেছেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর অসাধারণ influence পর্য্যন্ত

১। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

গেছে। এই ধর আমি। আর আমার সাহস নেই যে কিছু লিখে পাঠাই। অথচ দ্বিজুবাবু থাকলে তাঁর appreciationএর লোভেও লিখতাম। সারদাবাবুর ভাল মন্দ বলার দাম কি? কে গ্রাহ্য করে?—শরৎ

প্রমথনাথ—আজ তোমার পত্র পাইলাম। আজই একটা টেলিগ্রাফ করিয়াছিলাম আমার পূর্ব্বপত্র রদ করিয়া, বোধ হয় পাইয়া ব্যাপারটা বুঝিয়াছ। তোমার কথাই সত্য। ঠিকানা ছিল S. Chatterjee, Asst. Actt. General's Post office. আমার বুদ্ধিমান asst. নগেন ভৌমিক আমার অবর্ত্তমানে V. P. P. গ্রহণ করিয়াছিল, আমি উপস্থিত থাকিলেও হয়ত লইতাম। সেই জন্য দোষ আমার—তোমাদের নয়। তোমাদের দোষ নাই বলিয়াই টিকিটগুলো লইতে পারিলাম না—না হইলে তোমার মান রক্ষা করিয়া গ্রহণ করিতাম। Book Post পাই নাই এবং ভবিষ্যতে দিলেও পাইব না। ওসব আমার বাড়ীর ঠিকানায় দিলেই পাই, অন্যথা পাই না।

S. Chatterjee. 14 Lower Pozoungdoung Street, Rangoon. এ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত।

তোমার পত্রের একটা একটা করিয়া জবাব দিই। দুটি একটি প্রবন্ধ মন্দ হয় নাই। তাম্রশাসন, আমার মত বেরসিক লোকেই পড়ে। সার অসার কি আছে না আছে আমাদের জানা উচিত। "কৌতূহল" ভাল।

১। Variety হিসাবে তোমার কথা হয়ত সত্য; কিন্তু variety মানে যদি ৩২॥০ ভাজা হয়, ত খেতে মন্দ লাগে না। তাতে বড়-লোকের পেট ভরে, গরীবের ভরে না। Substantial জিনিস দুটোও ভাল, কিন্তু ৩২॥০ ভাজা ভাল নয়—আমি ওর পক্ষপাতী নই।

২। ছবির সম্বন্ধে—noted.

৩। নির্ভীক মতামত—ঠিক কথা। যত দিন ঐ রকমের দ্বিজু বাবুর কাছাকাছি—ভাল মানুষ, সরল অথচ গোঁয়ার-গোছের লোক না পাও; ততদিন সমালোচনা বাহির না করাই বুদ্ধির কায। তবে, সাহিত্যের সমালোচনার মত সমালোচনা ভদ্রলোকের বাহির করা উচিত নয়। কেবল তীব্র ভাষা অথচ কেন তীব্র ভাষা তার কারণ দেখানো নাই। "তোমারটা ভাল নয়" "ওতে অনেক কথা বলবার আছে" "এরকম সবাই জানে" "এ রকম না লেখাই উচিত" এ সব সমালোচনা নয়। সমালোচনায় যেন তাহার চৈতন্য হয়, জ্ঞান হয়, শিক্ষা হয়। সমালোচনার উদ্দেশ্য সাধু হওয়া উচিত—গালাগালি দিয়া অপ্রতিভ করিব, দাবাইয়া ধরিব এ মৎলব ভাল নয়। হাঁ কানকাটার সমালোচনার মত সমালোচনাই যথার্থ সমালোচনা। সবাই লিখ্‌তে পারে না তাও হয়ত সত্য। কিন্তু আমারও বড় অসংযত ভাষা হয়ে গেছে। ঐ যে তুমি লিখেছিলে সবাই আজকাল প্রত্নতত্ত্বের লেখক—তাতেই আমার রাগ এবং একটু দ্বেষ হয়েছিল। সবাই যদি এত সহজে লিখ্‌তে পারে, তবে, কেন মিছে আমরা এত খেটে মরছি? এই একটু রাগ—তাইতেই কিছু অতিরিক্ত তীব্র হয়ে গেছে। তবে, তাঁরও জ্ঞান হবে যদি দয়া ক'রে প'ড়ে দেখেন—ভবিষ্যতে আর অমন ওপর-চালাকি করতে ব্যস্ত হবেন না। সত্যিই এতে একটু solid পরিশ্রমের দরকার হয়।

৪। না, যমুনাতে একসঙ্গে অত বার হবে না। চন্দ্রনাথ[১] এখনো শেষ হয় নি। নারীর মূল্য[২] এবারে অসুস্থতার জন্য শেষ করতে

১। ১৩২০ সালের বৈশাখ—আশ্বিন সংখ্যা যমুনায় প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীমতী অনিলা দেবীর ছদ্মনামে ১৩২০ সালের বৈশাখ—আষাঢ় ও ভাদ্র—আশ্বিন সংখ্যা যমুনায় প্রকাশিত হয়।

আমার ইচ্ছে করে চাকরি ক'রে পেটের ভাতের যোগাড় ক'রে সাহিত্য সেবা ক'রে যদি দু পয়সা পাই ত বই কিনি। আমার বিস্তর বই পুড়ে যাবার পড়ে এই আকাঙ্ক্ষাটাই আমার বড় প্রবল।

আমার 'চরিত্রহীন' বোধ হয় modified হয়ে, আশ্বিন কার্ত্তিক থেকে বেরুবে। তত দিনে চন্দ্রনাথ শেষ হবে।

হাঁ ভাল কথা। আমি কলিকাতা এবং আরো দু-এক যায়গা থেকে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে মতামত পেয়েছি। সত্যি কেউ সন্তুষ্ট হয় নি। সকলেই লিখেছে—ওঁদের মধ্যে "পছন্দ" ব'লে যে একটা জিনিস আছে তা নমুনা দেখে মনে হয় না। কিন্তু তাঁরা ত ভেতরের কথা জানেন না। দ্বিতীয় issue দেখে তাঁদের মত ফিরবে ব'লেই আশা করি। 'ভারতবর্ষ' প্রথমে বিপুল আয়োজন ক'রে, দ্বিজু বাবুর সম্পাদকতায় বার হবে শুনে আমাকে অনেক সম্পাদকই লিখেছিলেন যে, "আমাদের সংহার করবার জন্য ভারতবর্ষের উদয় হচ্ছে"। তাদের শাপ সম্পাতেই দ্বিজু দাদা মারা গেলেন—অত দীর্ঘশ্বাস হা হুতাশ তাঁর সইল না। এখন সেই সম্পাদকেরাই খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। কি করবে কপাল! দ্বিজুদা একটা বছর বাঁচলেও ভারতবর্ষ অক্ষয় হয়ে যেত তা নিশ্চয়! এখন এর stability সম্বন্ধে সত্যই আশঙ্কা হয়। পাছে লোকে ক্রমশঃ মনে করতে থাকে not worthpaying Rs. 6, এই ভয়।

প্রমথ, আমিও একটা নাটক লিখ্‌ব ব'লে ঠিক করেছি। যদি ভালো হয় (হবেই!) কোনো theatreএ প্লে করিয়ে দিতে পার? আজ এই পর্য্যন্ত।—তোমার শরৎ

14, Lower Pozoungdoung Street
Rangoon, 17. 7. 13.

প্রমথ—তোমার চিঠি পাইয়া বড় খুশী হইলাম। আগেকার পত্রে তোমার যেন একটা রাগের ভাবই আমার চোখে পড়িত, এবার দেখিতেছি সেটা গিয়াছে। তুমি শান্ত এবং প্রকৃতিস্থ হইয়াছ। আমি মনে করিয়াছিলাম ভায়া আমার এবার ক্ষেপিয়া না গেলে বাঁচি। যাহোক ভালয় ভালয় যে সামলাইয়া গিয়াছ তাহা বড় সুখের কথা। আজ সুরেনকে দেবদাস পাঠাইবার জন্য চিঠি লিখিয়া দিলাম।···

আচ্ছা আশ্বিনের জন্য আমি একটা গল্প দিব, নিশ্চিন্ত থাক। তবে, হয়ত একটু বড় হইবে। ২০।২৫ পাতার কম নয়। তবে, এমন গল্প এ বৎসর আর বাহির হয় নাই তেমনি করিয়া লিখিব। পূজার সংখ্যায় আমার জন্য ২০।২৫ পাতা ভারতবর্ষের খালি রাখিয়ো। তবে, tragedy লিখিব না। Tragedy ঢের লিখিয়াছি আর না। তা ছাড়া, ছেলে-ছোকরারা tragedy লিখুক, আমাদের এ বয়সে tragedy লেখা কালি কলমের অপব্যয়। আর ইংরিজির তর্জ্জমা করা লিলি-টিলি আমার আসে না। খাঁটি দিশি জিনিস, একেবারে indigenous goods! চাই ত ব'লো। আর ইংরিজির ছাঁচে ঢালা তাও চাও ত লিখো। এ রকম ইংরিজি ধরণের গল্প লিখ্‌তে পারি নে যে তা নয়, তবে লজ্জা করে। যাক। সমালোচনা সম্বন্ধে যা লিখেছ ঠিক তাই। সমাজপতির মত স্পষ্টবাদিতার ভাণ ক'রে গালিগালাজ করা সত্যই ভাল নয়। তবে, তুমি যা বলছ গুণের কথাই বল্‌ব, দোষ দেখাব না এটাও ঠিক নয়। দোষ দেখাব, কিন্তু, বন্ধুর মত, শিক্ষকের মত। যেন সে নিজের দোষটা দেখ্‌তে পায়। তা না ক'রে ঐ রকমের সমালোচনা—"অত্যন্ত কদর্য!" "কিছুই হয় নি"

"পণ্ডশ্রম" "কালি কলমের অপব্যবহার" ইত্যাদিকে সমালোচনা বলে না। কোথায় দোষ করিয়াছি, কোথায় ভুল হইয়াছে যদি যথার্থ বলিয়া দিয়া লেখকের উপকার করিতে পার ত কর, না হইলে ও-রকম ওপর চালাকীতে কায হয় না, শুধু শত্রু বাড়ে। পুস্তকের সমালোচনা এমন করিয়া করা উচিত, যেন সেই সমালোচনাটাই একটা সাহিত্যিক প্রবন্ধ হয়। যেন সেইটাই একটা পড়বার জিনিস হয়।

তোমার চিঠিতে ফণির অসুখের অবস্থা শুনে ভয় পেয়ে গেছি। সুরেনও ঠিক ঐ কথাই লিখেছে। বাস্তবিক ফণির অসুখে যদি 'যমুনা' বন্ধ হয়ে যায় সে ত বড় দুর্ঘটনা। আমি ঐ কাগজখানিকে বড় করিবার জন্য যে কত আশা করিয়া আছি, তাহা আর কি বলিব। যদি তাহার changeএ যাওয়াই উচিত হয় ত তাই পরামর্শ দাও না কেন? দুই এক মাস ভাগলপুর কি মোজাফ্‌ফরপুরের মত যায়গায় গিয়ে থাকলে বোধ হয় দেহটা শুধরে যেতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে কাগজটা চালাবে কে? তবে তুমি যদি একটা কিছু উপায় ক'রে দাও ত হতে পারে বোধ হয়। বেচারী একা, অথচ, এটুকু কাগজের জন্য লোক রাখাও যায় না, সমস্তই একা করিতে হয়, বড় মুস্কিল।

আমার চাকরির চেষ্টা কচ্চ শুনে খুশী হলাম। সাহিত্যচর্চ্চা ক'রে পেট ভরে না ভাই। তাছাড়া, ধর যদি এক মাস কিছু নাই লিখ্‌তে পারি, তা হ'লেই ত বিপদ। অত সংশয়ের পথে পা বাড়াতে ভাল বোধ হয় না। যাহোক মনে কচ্চি পূজোর পর দু-এক মাসের ছুটি নিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা ক'রে আসব। সেই সময়ে মিত্তির মহাশয়ের সঙ্গেও দেখা করব। কিন্তু সেখানে চাকরি করতে আমি নারাজ। শুনি হাড়ভাঙা খাটুনি—মাইনে কম। কে ঐ কম মাইনের জন্য হাড়ভাঙা খাটবে আর তাতে সাহিত্যচর্চ্চাও বন্ধ হবে। সে আমি পারব না।

ভাল কথা। এবার 'সাহিত্যে' "দাদা" ব'লে একটা গল্প পড়েছ? কি ভীষণ লেখা। সবাই জানে অকৃতজ্ঞতা বাজারে আছে, তাই ব'লে কি ঐ রকম ক'রে লেখে? ওতে কার কি উপকার হবে? সমস্তটা প'ড়ে একটা বিতৃষ্ণার ভাবই আসে, মন উঁচু হয় না। ওকে সাহিত্য বলা যায় না—ঐ গল্পই আবার সাহিত্যে বার হ'ল। ওর চেয়ে তোমাদের আষাঢ়ের ঐ দর্পচূর্ণ গল্পটি ঢের ভাল। মনের মধ্যে শেষে একটা আহ্লাদ হয়, আমি ঠিক ঐ রকমই আজকাল ভালবাসি।

তোমার বায়স্কোপ ছু-বার পড়েছি। অনেক জিনিস যা জানতাম না জানা গেল। আর ঐ যে ছোট ছোট পাস্তুয়ার ইতিহাস প্রভৃতি ও গুলি সবচেয়ে ভাল। কত ছোটখাট দরকারী ঘরের কথা যে ওতে জানা যায় তা' ব'লে শেষ করা যায় না। ঐ রকম যেন প্রতি বারে থাকে।

আর না, মেল ক্লোস হয় হয়—

ভাল আছি।—শরৎ

প্রাণধনবাবু কি আমাকে আর মনে করেন? হয়ত ভুলে গেছেন, না? আমি তাঁকে কিন্তু প্রায়ই মনে করি। অতি অল্প দিনের আলাপে তাঁর উপর আমার একটা বোধ করি স্থায়ী আকর্ষণ হয়ে আছে। অবশ্য এ সব কথা তিনি যেন না শোনেন—হয়ত তা হ'লে কি মনে করবেন। তোমার বাড়ীর খবর লেখ না কেন?—শ

প্রমথনাথ—ভাই অনেক দিন যাবৎ তোমার চিঠির জবাব দেওয়া হয় নাই। এ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আশা করি তুমি ভাল আছ, বাড়ীর সকলেও ভাল আছেন। পরশু V. P. ডাকে তোমার 'ভারতবর্ষের' এক খণ্ড sample copy দশ

আনা পয়সা দিয়া লইয়াছি। অর্থাৎ দাম ॥০ মাসুল খরচা ৵০ একুনে ॥৵০। সেখানি ক্লাবে দিয়াছি—ফিরিয়া পাইলে পড়িব। যেদিন আসে সেই দিন ঘণ্টাখানেক কতক কতক দেখিয়াছি মাত্র। আমার একটা ভুল ধারণা ছিল, যে, তোমাদের লেখার অভাব, কিন্তু ছাপাইয়াছ যে, এত ভাল জিনিস রহিয়া গিয়াছে যে স্থান সঙ্কুলান করিতে পার নাই। বাস্তবিক এটা বড় আশার কথা। কেন না আমিই এত বেশী telegraph, registered letter, শুধু পত্র, এবং উপহার মাসিক পত্র পাইতেছি, যে মনে হইয়াছিল, মাসিক পত্রের সম্পাদকেরা লেখার জন্য বড়ই অসুবিধা এবং অভাব বোধ করেন, তাই আমার মত নগণ্য লোককেও এত বিব্রত করেন। যাঁদের কখনও নামও জানি না, তাঁরাও লম্বা চওড়া চিঠি দেন, শুধু যে বিপদে পড়িয়াই, এই বিশ্বাস আমার মনে ছিল। এখন দেখিতেছি বাস্তবিক তাহা নয়, কেন না, তোমাদের মত এই মর্ম্মে 'প্রবাসী'ও ছাপাইয়াছেন যে তাঁহারা শীঘ্র আর কাহারও কোন লেখা পাইতে ইচ্ছা করেন না—কারণ ভাঁড়ারে তাঁহাদের অত্যন্ত বেশী জমিয়া গিয়াছে। আমি নিজেও অনেক দিন আর কিছু লিখি নাই মুখ্যতঃ অসুস্থ বলিয়াই। তবে, 'যমুনা'র জন্য না কি না-লিখিলেই নয়, তাই আষাঢ়ে গোটা দুই প্রবন্ধ (একটা প্রতিবাদ) লিখিয়াছিলাম মাত্র। গল্প লিখি নাই—লিখিতে ভালও লাগে না! তবে, তোমার কথামত আমার একটা মতলব হইয়াছে। "রামের সুমতি"র মত প্রেমবর্জ্জিত আমাদের বাঙালীর ঘরের কথা—(যাহাতে মানুষের শিক্ষাও হয়) series of stories লিখিব মনে করিয়াছি। বাঙালীর ideal অন্তঃপুর যে কি, ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়। "বিন্দুর ছেলে" বলিয়া আর একটা লিখিয়া পাঠাইয়া দিয়াছি—একবার মনে করিয়াছিলাম একবার তোমাকে দেখাইব, কিন্তু সময় হইল না। অবশ্য তোমাদের 'ভারতবর্ষ' কাগজের

যোগ্য সেটা মোটেই হয় নাই, তার উপর আবার একটু বড় আয়তনের হইয়া পড়িয়াছে। 'ভারতবর্ষে'র মত কাগজের অন্ততঃ ২৬।২৭ পাতা—তাই, ও কাগজে ছাপান অসম্ভব বুঝিয়াই 'যমুনা'য় পাঠাইয়া দিয়াছি।

কৈ প্রভাত বাবুর[1] লেখা দেখিলাম না ত? ও ভদ্রলোক প্রায় শতাবধি গল্প লিখিয়াছেন। আর যে কি চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিবেন আমি ত ভাবিয়াই পাই না, অথচ অগ্রিম টাকাও লইয়াছেন। এ দিকে 'সাহিত্য'-সম্পাদকও 'বঙ্গবাসী' কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে প্রভাত বাবুর লেখা তাঁর কাগজ ছাড়া আর কোথাও বাহির হইবে না। ব্যাপার কি!

তোমাদের কাগজ বাহির করিবার জন্য তোমাকে বোধ হয় খুব পরিশ্রম করিতে হয়; এটা ভাল। এই সময়ে হয়ত তোমারও কায হইয়া যাইতে পারে। যদি সত্যই তোমার ভিতরে পদার্থ থাকে নাড়াচাড়া করিয়া এই সময়ে বাহিরে আসিতে পারে। এ সাহিত্যচর্চ্চার সংস্রবই আলাদা। তোমার মত এক হিসাবে নিষ্কর্ম্মা লোকের এই সময় যদি কিছু দায়ে পড়িয়া পরিশ্রম করিবার সময় নিজের বস্তু উজ্জ্বল হইয়া উঠিবার অবকাশ এবং সুযোগ পায় সেইটাই লাভের কথা তোমার।

গত বারে তুমি আমাকে লিখিয়াছিলে "এ বিষয়ে এত সাধাসাধি" অনুনয় প্রভৃতি আরও কত কি হইয়া গিয়াছে যে আর বলা শোভা পায় না। আমি এইটাই ভয় করিয়াছিলাম যে পরের ভালো করিতে গিয়া নিজেদের মন্দ না হইয়া যায় অর্থাৎ আত্ম-মনোমালিন্যে না দাঁড়ায়!—শরৎ

১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

প্রমথনাথ—ইতিপূর্ব্বে বোধ হয় আমার অসম্পূর্ণ চিঠিটা পেয়েছ। যে দিন চিঠি লিখছিলাম, হঠাৎ দেখি ডাক নিয়ে পিয়াদা যাচ্ছে, আর সময় নাই, কাজেই যেটুকু লিখেছিলাম বন্ধ ক'রে পাঠালাম। আজ তোমার আর একটা পত্র পেলাম। প্রথমে কাজের কথা বলি। 'দেবদাস' নিয়ো না, নেবার চেষ্টাও ক'রো না।…ওটার জন্যে আমি নিজেও লজ্জিত। ওটা immoral. বেশ্যা চরিত্র ত আছেই, তাছাড়া আরও কি কি আছে ব'লে মনে হয় যেন। আর আগেকার লেখাও প্রকাশ করা সম্বন্ধে আমার বিশেষ আপত্তি তা তোমাদের কাগজেই হোক আর ফণীর কাগজেই হোক। আষাঢ়ের 'যমুনা'য় "আলো ও ছায়া" ব'লে একটা অর্দ্ধসমাপ্ত গল্প বেরিয়েছে দেখলাম। আমার আশঙ্কা হচ্ছে হয়ত বা আমারই লেখা। কিন্তু, এই একটা কথা যে আমার এত আপত্তি সত্ত্বেও তারা প্রকাশ করতে নিশ্চয়ই ভরসা করবে না, সেই কারণেই ভাবছি—হয়ত আমার ছেলেবেলার লেখার অনুকরণে আর কেউ লিখেছে। যা হোক জিজ্ঞাসা ক'রে দেখবো। সুরেনের সঙ্গে দেখা হয়ে আমার কথা হয়েছে শুনে সুখী হলাম। তুমি যে বার বার বলছ আমি চাকরি ছেড়ে দিলেও ভয় নেই, এ কথাটা বিশ্বাস করতে পারলাম না। মিত্তির মশাই জবাব দিয়েছেন যে তিনি ৬ মাসের ছুটিতে আছেন, এবং এ অবস্থায় কি করতে পারেন? কথা ঠিক! আরও ভাবছি যদি চাকরি করতেই হয়, তবে সেখানেই বা কি, আর এখানেই, বা কি; মৃত্যু এক দিন হবেই এবং তাহা সত্যই আসন্ন সে চিহ্নও চারি দিকে ফুটে উঠেছে। তবে নিরর্থক ছুটাছুটি ক'রে লাভ কি! তবে, এই পূজার সময় একবার কলকাতায় যাব। ততক্ষণ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে অধিক কিছু চিন্তা ক'রে নিজেকে এবং পরকে পীড়িত করা যুক্তিসঙ্গত নয় ভেবে চুপ ক'রে আছি। 'ভারতবর্ষ' মোটের উপরে

কি হয়েছে, তা কি তুমি নিজে জান না। আমাদের আষাঢ়ের 'যমুনা'য় এবার কিছু নেই, তবু বল দেখি ঐটুকু কাগজে যথার্থ readable matter যতটা আছে, তার চেয়ে বেশী 'ভারতবর্ষে' আছে কি না! তোমাদের গল্পের ছবিগুলি আরও চমৎকার! পাঁজিতে জামাইষষ্ঠীর পুরাণো ব্লক তোলা ছবির মত। রাগ ক'রো না ভাই, সত্যি কথা একা বন্ধুর কাছেই বলা যায় ব'লেই বললুম। দ্বিজুবাবু থাকতে লোকে কত আশা করেছিল, তার চার ভাগের এক ভাগও যদি প্রথম সংখ্যাটায় বার হ'ত সেও ভাল হ'ত, কিন্তু, তাও হয় নি। ওর মধ্যে যেটুকু দ্বিজুবাবুর লেখা, সাহিত্য হিসাবে সেইটুকুই ভাল। তার পরে তাম্র-লিপ্তি আর বেদের তর্জ্জমা। কি করব আমরা নিরক্ষর লোকে বেদের তর্জ্জমা ক'রে? আর অত বড় কাগজ এতে কি চলে? অন্ততঃ এমন একটা জিনিস continuously থাকা চাই যার জন্য গ্রাহকের মনে আশা জেগে থাকবে—সে কোথায়? একটা bold review থাকা প্রয়োজন—কই তা? শুধু তাম্রলিপ্তিতে সুবিধা হবে না দাদা, তা ব'লে দিলাম। গল্প অতি বদ। এই কি তোমাদের selection?

'ছিন্নহস্ত'টা বোধ করি হবে ভাল। তোমার লেখাও পড়েছি—কিন্তু একে সাহিত্য বলা চলে না। তবে প্রথম বারের কাগজ দেখে কিছুই বলা যায় না—খুব চেষ্টা কর যাতে 100 times ভাল হয়। এবারের 'প্রবাসী'ও দেখলাম। তারা তোমাদের কাগজের চেয়ে ভালই করেছে। এই সমস্ত আমার স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ মতামত—এর কতটুকু দাম, সে কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যদি কিছু থাকে, সেটা তুমি নিজের কাছেই গোপনে রেখো। তবে, 'প্রবাসী' লোকের কাছে অশ্রদ্ধাভাজন হয়ে পড়ছে, এই সময় ঠিক প্রতিযোগিতায় তাকে টলান যায়। অন্যথা যায় না। কারণ সে established! যাক এ সব কথা। কেন না, আমি দূরে থেকে

যা বলব, হয়ত ঠিক না হতেও পারে। তোমরা সরজমিনে—man on the spot! প্রভাতবাবুকে দাদন দিয়ে রেখেছ, গল্প কই হে? তার পরে তোমরা টাকা দেবার অধিকারে গল্পের জন্য যখন তাগাদা সুরু করবে, তখন তেমনি গল্পই বোধ করি তিনি দেবেন।

যা হোক, এ সব বাজে কথা। আসল কথা এই যে, এই সব বাহিরের হাঙ্গামা নিয়ে যেন আপোষে বিবাদ না হয়। তুমি গত বারে যে রকম খাপ্পা হয়ে উঠেছিলে, ভয় হয়েছিলে, এই বারে বুঝি ভীষণ একটা কিছু হয়। তোমার সুবুদ্ধি ফিরে এসেছে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। আজ কাল আছি ভাল। গত মাস দুই যাবৎ ঘাড় নীচু করলেই মাথা ধ'রে উঠত, তা লিখবই বা কি, আর পড়াশুনা করবই বা কি! গত চিঠিতে তোমাকে জানিয়েছি যে, একটা গল্প লিখে 'যমুনা'য় পাঠিয়েছি—বস্তুটা ভালও হয় নি, অথচ দীর্ঘকায় হয়েছে—তোমাদের কাগজে সেটা কিছুতেই চলত না। চলবার মত নয় বুঝেই আর পাঠালাম না। ও কি প্রমথ, আমাকে 'ভারতবর্ষ' পাঠিয়ে দাম আদায় করছ কেন? আমি গরীব মানুষ, তোমাদের অত দামী কাগজ কিনে পড়বার যোগ্য লোক নই ভাই—আমি কোথাও থেকে চেয়ে টেয়ে পড়বার চেষ্টা করব,—আমাকে আর পাঠিয়ো না। আমি দরিদ্র ব'লেই এ কথা অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে জানালাম—কিছু মনে ক'রো না। বাড়ীর খবর ভাল ত? তোমার নাটক প্লে হবে না কি? খুব ভাল, খুব ভাল—বড় আনন্দের কথা!—শরৎ

14, Lower Pozoungdoung Street
Rangoon
[ডাকমোহর ২৫ জুলাই ১৯১৩]

প্রমথ—তোমাদের প্রেরিত 'ভারতবর্ষ' ও তোমার পত্র উভয়ই পাইয়াছি। কাগজখানির জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। এবারকার কাগজের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছ তাহা সত্য। "বিন্দুর ছেলে" তোমার ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া খুব খুশী হইলাম। বোধ হয় ওটি মন্দ হয় নি, কেন না, অনেকেই ভাল বলিতেছেন। অনেকে "রামের সুমতি"র চেয়েও ভাল বলেন শুনিতেছি। প্রায় "পথনির্দ্দেশে"র কাছাকাছি। পূজার সংখ্যার জন্য আমার সাধ্যমত একটি গল্প লিখিয়া পাঠাইব—কিন্তু, প্রকাশ করিবার জন্য কাহাকেও অর্থাৎ সম্পাদক-যুগলকে খোশামোদ করিও না। আমার শপথ রইল। কেন না, তোমার ভাল লাগিলেই তাহা যে তাঁহাদের ভাল লাগিবেই অথবা প্রকাশের যোগ্য হইবে—সে কথা কোন মতেই জোর করিয়া বলা চলে না। কেন, তাহা পরে বলিব। তোমাদের এবারের কাগজ পড়িয়া গোটা দুই প্রশ্ন মনে হইয়াছে, তাহাই বলিতেছি। ১ম সুরজ কওর সম্বন্ধে। সুরজ কওর বেশ্যা এবং খুনে। হরি সিংকে এক স্থানে বলিতেছে—"এই ত দরশ পরশ হইল! আমি যে কায বলিয়াছি করিয়া আইস তখন আমার অদেয় আর কিছুই থাকিবে না।" অর্থাৎ, সোজা বাংলায়, "কাজ ক'রে এলেই তোমার কাছে শোব।" ঠিক কি না? কেন না ইতিপূর্ব্বে, নির্জ্জন ঘরে বেশ্যা সুরজ "হাসিয়া মুখে কাপড় দিয়াছে" এবং "চোখে প্রেমের আহ্বান করিয়াছে" এবং "হরিসিং আঁচল ধরিয়া ওড়না টানাটানি করিয়াছে।" কি প্রমথ, অস্বীকার করিবে সমস্ত গল্পের driftটা কি? অনাবৃত রূপ যে শুধু জানিয়া শুনিয়া মঙ্গলসিংকেই দেখায় নাই—পাঠককেও দেখাইবার

চেষ্টা করিয়াছে! তাহাতে ছবি দিয়া জিনিসটি বেশ ফুটিয়াছে! সাবাস!! "তবে দেখ! রূপ দেখ!" অনেকেই তাহা দেখিতে পাইয়াছে!

২। ১৯৩পাতা—"অন্ধকার বৃন্দাবন"। চতুর্থ stanza: "করে না দধি মন্থ গোপী নাচায়ে কটি চন্দ্রহার"। কটির চন্দ্রহার নাচিয়ে নাচিয়ে দধি মন্থ করলে, দেখতে পুরুষ মানুষের বোধ করি বেশ ভালই লাগে। চোখ বুজিয়া একবার উচ্চাঙ্গের ভাবটা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করিও, সুখ পাবে। তাছাড়া গোপীর মধ্যে যশোদাও আছেন। উপানন্দের স্ত্রীটিও 'দধি মন্থ' করতেন, চন্দ্রহারও পরতেন। কৃষ্ণচন্দ্রকে কটি নাচিয়ে দেখাতে পাচ্ছেন না ব'লে তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন দেখ্‌ছি! ভট্টিকাব্য না কোথায় এই কথাটা আছে না? কিন্তু এ ভট্টির দিন নয়—ইংরাজের রাজত্ব। আমি সময়াভাবে সব কাগজটা পড়ি নি—প'ড়ে বলব। এই কবিতাটির তৃতীয় stanza—"যমুনা জল শিহরে, শুনি বাঁশীটি শ্যাম চন্দ্রমার"। শ্যামচাঁদটি তখন কোথায় শুনি? বোধ করি মথুরা থেকে Bagpipe বাজাচ্ছিলেন, না হ'লে অত দূরে বৃন্দাবনের যমুনা-জল শিহরে কি ক'রে? অত দূরে আর একটা জেলা থেকে বাঁশী বাজালে? তবে, দেবতার কথা বলা যায় না, ওঁরা জাহাজের বাঁশীর মত ইচ্ছা করলে বাজাতে পারেন। সম্ভব বটে! ৪র্থ stanza—"যায় না চুরি নবনী ক্ষীর, বলিয়া ফেলে অশ্রুনীর"—ক্রিয়া আছে ছত্রের কর্ত্তাটি কি? আর একটা কথা ভাই। ছেলে-ছোকরায় গল্প লিখলে ধরি নে। কোকিলেশ্বরের "ভারতবর্ষের অদ্বৈতবাদ" বাপ রে! যা হোক, ১৬ এবং ১৮ লাইনে লিখছেন, "দেবতাবর্গ" দেবতৃ শব্দের ষষ্ঠি কি হয় পণ্ডিত মশাইকে জেনে ব'লে দেবে ভাই? যদি দেবতাবর্গই হয়, 'দেবতৃবর্গ' না হয় (বাঙলা ব'লে) তবে এবার থেকে যেন

'পিতাকুল' 'মাতাকুল' লেখেন। পিতৃকুল ইত্যাদি লেখেন না। কই বার কর দেখি এমনি লেখা, অক্ষয় মৈত্রের কিম্বা বিজয়বাবুর[১] প্রবন্ধে? তোমাদের কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ সম্পাদকের কি এটাও নজরে পড়ে না? যদি নাই পড়ে, ত অত বেদ বেদান্ত নিয়ে নাড়াচাড়া ঠিক নয়। দুটো একটা ভুলও আছে। যথা "মাসিক সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ—বৈশাখ" ২৯৪ পাতা। গল্প ও উপন্যাস—"রামের স্থমতি"—কিন্তু "রামের স্থমতি" ফাল্গুন ও চৈত্রে বার হয়েছিল। অর্থাৎ গত বৎসরে। বৈশাখের 'যমুনা'য় উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না—তাতে "পথ-নির্দ্দেশ" আর "নারীর মূল্য" ছিল। নিশ্চয়ই কোনটা উল্লেখযোগ্য হ'তে পারে না, অবশ্য সে জন্য আমি দুঃখ করছি নে, কেন না তাঁর কথার মূল্য আমার কাছে অতি অল্পই। কিন্তু ভাবছি 'অজ্ঞাতবাস' ফকির বাবুর বইয়ের মত আমার কোন একটা বই যদি থাকৃত আর বিদ্যাভূষণ তার হতেন প্রকাশক—তা হ'লে নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য হ'ত। "রত্ন-দীপ" নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। কেন না, নায়ক রাখাল পরস্ত্রীর সতীত্ব হরণ করবার মানসে যাত্রা করেছেন এবং 'মানসী'তে বার হচ্ছে। হায় রে দ্বিজুদার প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ'! "সাহিত্য সমালোচনা"র মধ্যে পাঁচকড়ির 'নববর্ষ'ও উল্লেখযোগ্য! যার দুটো ছত্র consistent নয়। "তারে জোর ক'রে শ্যামের বাঁশী" আর "আমার মরণ হ'ল না" আছে কি না! 'নববর্ষ' প'ড়ে দেখো—এমন এলো-মেলো গাঁজাখুরি jargon আর সম্প্রতি দেখেছি কি না মনে হয় না। আরো একটু মন দিয়ে 'ভারতবর্ষ' পড়ি, তার পরে 'আশ্বিন' সংখ্যায় "সাহিত্যে" একটি বিরাট সমালোচনা লিখব। সমাজপতিও

১। বিজয়চন্দ্র মজুমদার।

কিছু লিখে দেবার জন্য ঘন ঘন registered letter এবং telegram পাঠাচ্ছেন, তাঁর কথাটাও রাখা হবে। প্রমথ ভাই, দোকানদারি দেখতে দেখতে আর অসহ্য খোশামোদ ভণ্ডামি শুনতে শুনতে হাড় কালি হয়ে গেল। সব কাগজই কি এক সুরে বাঁধা? যদি তাই হয়, প্রাতঃস্মরণীয় দ্বিজুদার নামটা 'ভারতবর্ষ' থেকে তুলে দাও—তার পরে এই রকম অবিচার এবং মানুষকে mislead ক'রো। নারীর মূল্য তাঁরও ভাল লেগেছিল—দুঃখ হয় শেষটা তিনি পড়লেন না। এতে অনেক সত্য কথা আছে, তাইতেই এটা প্রবন্ধের যোগ্য নয়। যাক্। যথার্থ সুখও পেয়েছি। 'প্রাক্তন' গল্পটি যথার্থই উঁচু লেখা! আর জলধরবাবুর 'দিনাজপুর'টিও মন্দ নয়। 'ঘাটে' ছবিটি বেশ। নোলকটা না থাকলে আরো ভাল হ'ত। 'কানাকড়ি' এখনও পড়ি নি। এই অবনীন্দ্র ঠাকুরের ওপর আমার ভয়ানক রাগ আছে—অনেক দিন থেকেই ইচ্ছা হয় খুব একচোট ঝাল ঝাড়ি—কিন্তু কোনদিন করি নি। 'Art painting' আমিও নিজে করি। Oil-painting আমিও বুঝি—ও সম্বন্ধে নিতান্ত কম বইও পড়ি নি—কিন্তু 'যমুনা' ছোটো কাগজ ওতে সুবিধে হবে না। তা ছাড়া 'অনিলা দেবী' নাম নিয়ে সমালোচনা করতে আর ইচ্ছা করে না। আমাদের ফণীন্দ্রভায়ার proof দেখার চোটে, আমার লেখার ত ছত্রে ছত্রে ভুল বিরাজ কচ্ছেন—বিপক্ষ সেইগুলো তুলে ধরলেই ত গিছি! দেখা যাক কি হয়। যাই হোক তোমাকে না দেখিয়ে বা তোমার মত না নিয়ে কিছুতেই প্রকাশ করব না। তবে, আর একটা কথা ব'লে রাখি ভাই। তুমি মনে ক'রো না আমি সেই পুরাতন কথার শোধ তুলছি। চরিত্রহীনের এখন বাজারে অত্যন্ত দুর্নাম, তা সত্ত্বেও আমি সে জন্যে আজকের এই কথাগুলো লিখি নি। কথাগুলো যদি সত্য না হয়, ভালই, যদি সত্য হয়, ভবিষ্যতে সাবধান হ'লেই হবে। এই

স্বরজ কওরটা আমাদের clubএর সকলেই একবাক্যে নিন্দা করেছে। অনেকে এমনও বলেছে ওটা প্রকাশ্য অনাবৃত immorality. সত্যিও ওর ছত্রে ছত্রে এই exciting ভাব ছাড়া আর কিছুমাত্র দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নাই। যা হোক আমারও একটা নজির হয়ে রইল। চরিত্রহীন প্রকাশ করার সময় লোকের মুখ সহজেই বন্ধ করবার উপায়ও আমাকে ইতিমধ্যে খুঁজে রাখতে হবে। আমি বিদ্রূপ করলে কিরূপ করি তা জানই—এমনি ক'রে প্রতি ছত্রে প্রতি পাতা তুলে ধ'রে expose করব। আমি অনেক নজির এর মধ্যেই জোগাড় করেছি। রবিবাবু প্রভৃতি সর্ব্বত্র হ'তেই।

হাঁ, আর একটা কথা। সেই সাবিত্রীকে আর নিতান্ত মেসের ঝি রাখি নি। প্রথম থেকেই মানুষে তাকে যেন অশ্রদ্ধার চোখে না দেখে সে উপায় করেছি। বড় মন্দ হয় নি প্রমথ! আর ক্রমশঃ প্রকাশ্য নভেল ও রকম না হ'লে গ্রাহক জোটে না। লোকে নিন্দে হয়ত করবে—কিন্তু পড়বার জন্যেও উৎসুক হয়ে থাকবে। আমরা এক রকম আশা ক'রে আছি, ওতে 'যমুনা'র পশার বাড়বে। নইলে দেখছি ত ভাই, এই সব খবরের কাগজে ফেকাসে, রক্তহীন উপন্যাস বেরিয়েই যাচ্ছে—কেউ পড়ে না। ঐ 'ভারতী'র বাগদত্তা, পোষ্যপুত্র, দিদি—অরণ্যবাস—বারো আনা লোকেই পড়ে না, যদিও পড়ে নেহাৎ ব্যাগার খাটা গোছ। অথচ রত্নদ্বীপ এর মধ্যেই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—অথচ সেটা বটতলার যোগ্য বই। এই ধর তোমাদের "মন্ত্রশক্তি!" ঐ পুরুত, আর মন্দির আর ঐ সব ঘ্যানোর ঘ্যানোর কেউ পড়ে না—অপরের কথা কি বলব ভাই, আমি এখনো পড়ি নি। অথচ আমার এই ব্যবসা।

দেখ না লেখবার কায়দা, বঙ্কিমবাবু রবিবাবুর। প্রথমেই একটা

something! যাই হোক দেখাই যাবে। আমার ছেলেবেলার 'চন্দ্রনাথ'টা কি জানি কেউ পড়েছে কি না! ওটা আমার দেবার ইচ্ছেই ছিল না। ঐ ঘ্যানোর ঘ্যানোর ক্রমশঃ হ'লে লোকের patience থাকে না। তা যতই শেষে ভাল হোক্। কেমন আছ, বাড়ীর খবর লেখ না কেন?—শরৎ

মনে হয় প্রমথ নিজের একটা কাগজ থাকত ত, বাক্যবাণে এই তথাকথিত পণ্ডিতগুলির চৈতন্য করিয়ে দিতাম। কতক বলে সমাজপতি, কিন্তু তার বলায় কোন ফল হয় না। কেন না, তার অনেকটাই শুধু গ্লানি আর গালিগালাজ—প্রায় ফাঁকা আওয়াজ। তাতে আওয়াজ থাকে কামানের মত, কিন্তু ভেতরে একটা ছররাও থাকে না। তাই লোকে বড় গ্রাহ্য করে না। কিন্তু আমি Jack of all trade কি না, সঙ্গীত, চিত্র, দর্শন, কাব্য, নাটক, নভেল, সব বিষয়েই এক ফোঁটা এক ফোঁটা জানি, তার উপর নির্ভর ক'রে মনের সাধে 'যুদ্ধং দেহি' ক'রে দিতাম। হাঁ হাঁ—আমি উদাসীনও বটে, গৃহীও বটে। চোখ বেশ ক'রে খুলে রাখলেই দেখা যায়। দেখতে তুমিও পার, আমিও পারি, কিন্তু মনে রাখা চাই। আমি মনে ক'রে রাখি, তোমরা ভুলে মেরে দাও—এই প্রভেদ আর কিছু নয়।

Rangoon
9. 8. 13

প্রমথ—তোমার চিঠি যেদিন পাইলাম তার পরদিন manuscript পাইলাম। দেখিয়া শুনিয়া দিয়া পাঠাইতে গেলে আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম ২৩।২৪ শ্রাবণের আগে পৌঁছিবে না, সেই জন্য ভাদ্রে কিছুতেই ছাপা হইবে না বুঝিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া পাঠাইলাম না।

এমন কোন অর্থ নাই যে পরের মাসে না বাহির হইলে আর উত্তর দেওয়া চলে না। ওটা আশ্বিনে ছাপাইলেই হইবে। এ সম্বন্ধে কিছু বলিবারও আছে। প্রবন্ধ কিছু দীর্ঘ হইয়াছে এবং এমন সব কথা আছে যাহা 'ঝগড়া,' ওটা উচিত কিনা সন্দেহ। আমি ঐ কথাগুলাই আর একটা কাগজে লিখিয়া আশ্বিনের জন্য পাঠাইব মনে করিয়াছি। তবে, আক্রমণ করিতেই হইবে এবং তাহা একটু polite ধরণে—অনেকটা কানকাটার মত করিয়া। আশা করি ইহাতে তুমি মনে কিছু করিবে না। যাহা ভাল হইবে, নিশ্চয় তোমার জন্য তাহাই করিব। তা ছাড়া দেখ গৃহস্থ কি বলে? দুঃখ এই যে আমি ওঁর original painting দেখি নি, তাহা হইলে এমন বলা বলিতাম যে, তিনি বুঝিতেন এ কোন চিত্র-ব্যবসায়ীর লেখা—যার তার নয়। আমি তোমার জন্য গল্প লিখিতেছি অর্থাৎ দু-দিন লিখিয়াছি আর দু-দিন লিখিব। ছবি দেবে কি হে? দোহাই প্রমথ, আমার গল্পের ভেতরে ছবি দিও না—ওরে বাপ্ রে। সেই "কুলগাছ" আর সেই ব্যথিতের মৃত্যুশয্যা। আমি তাহ'লে লজ্জায় বাঁচব না। তাছাড়া আশা করি, ছবি আমার গল্পে না দিলেও লোকে পড়বে। ১ হপ্তা পরে পাঠাব। তুমি সমাজপতির সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, ফণি তার চেয়েও বেশী করিয়া লিখিতেছে—অথচ সমাজপতি মহাশয়ের কালকের রেজেষ্ট্রী পত্র এই সঙ্গে পাঠালাম পড়িলেই বুঝিবে, কি মুস্কিলে পড়িয়াছি। কি যে করি ঠিক করিতে পারি না, অথচ, আমার হাতেও গল্প লেখা নাই, মগজেও আসিতেছে না। তার ওপর আফিসের কাজ এত বেশী এই মাসটায় পড়িয়াছে যে রাত্রি সাতটার পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিতে পারি না। তার পরে লেখাপড়া, বিশেষ, মাথার ভেতর থেকে কিছু বার করা প্রায় অসাধ্য! তবে আমার নাকি বড় শক্ত মাথা, তাই এত ঘা খেয়েও কিছু কিছু ঠুকলে ঠাক্‌লে বার হয়। সকালে আজকাল আবার

আরো বিপদ—লোকের অসুখ আমাকে নিজেই বাজারে যেতে হয়। না গেলে, যিনি আছেন তিনি বলেন "খেতে পাবে না"। ইনি ত দিনরাত জপতপ পূজো আচ্চা নিয়েই থাকেন, একটু আধটু লেখাপড়া জানেন বটে কিন্তু কাজে আসে না। এক দিন বলেছিলাম, আমি শুয়ে শুয়ে ব'লে যাই, তুমি লিখে যাও—স্বীকারও করেছিলেন, কিন্তু, সুবিধা হ'ল না। "বরং" লিখতে জিজ্ঞেস করেন অনুস্বরের ঐ টানটা ফোঁটার ভেতর দিয়ে দেব, না বাহিরে দিয়ে দেব? অর্থাৎ "ং" হবে না "ঃ" হবে? কাজেই আমাকে সমস্ত নিজেই লিখতে হয়। রাত্রে একটু আফিমের ঘোরও ধরে উঠে, ব'সে লিখতে পারি নে। এ সব কারণেই লেখা এত কম হয়। তাই আর এক কায করেছি প্রমথ, আমি নিজে ত 'যমুনা' চালাতে পারি নে, তাই আমার সমস্ত শিষ্যগুলিকে লাগিয়ে দিয়েছি। নিরুপমা, বিভূতি, সুরেন, গিরীন এবং ভাগলপুরের আরো দুই একজন সাহিত্যিক লিখতে সুরু ক'রে দিয়েছেন। দেখা যাক 'যমুনা'র অদৃষ্টে কি সঞ্চয় হয়। তারা ত বলেছে তুমি গুরুদেব তোমার কথার আমরা অবাধ্য হব না। এই যা আশা। আর একটা কথা সেদিন একটা চিঠি পেলাম (ভাবী সম্পাদক হইতে) 'অয়ন' ব'লে একটা কাগজ ও 'কর্ম্মক্ষেত্র' ব'লে আর একটা কাগজের জন্য তাঁরা বিশেষ লোভ দেখিয়ে পত্র দিয়েছেন—কিন্তু লোভ দেখালে কি হয়? আমার পুঁজি কই, আমি ত আর সত্যেন দত্ত নই যে বল্‌লেই কবিতা লিখে ফেল্‌ব! শুনছি 'অয়ন' পত্রিকা আমার "কোরেল" গল্পটা সুরেনের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে—তবে বেনামি ছাপাবে এ সর্ত্ত বুঝি তার সঙ্গে হয়েছে। সেটা না কি ভাল গল্প। কি জানি, আমার ভাল মনেও নেই। আচ্ছা, আজকাল হুহু শব্দে এত মাসিক পত্রের আয়োজন হচ্ছে কেন? এটা কি খুব লাভের ব্যবসা? একে ত

খোশামোদ ক'রে ক'রে প্রাণ অস্থির, তার পরে ঐ যে লিখেছ, এতটুকু স্বাধীনতা নেই। আমার গল্পগুলো বই ক'রে ছাপিয়ে কি হবে? কে কিনবে? কত গল্পের বই রয়েছে আমার বই কি কেউ পড়বে? আমার নষ্ট করার মতো টাকা নেই—ইচ্ছেও নেই। তাছাড়া হাঙ্গামা কত, advertise কর, ক্যানভাস কর, লোকের opinion সংগ্রহ কর—ও সব আমি চাইও না, পারবও না। আমি একটু চুপচাপ থাকতে পেলে বাঁচি। অত হৈ চৈ কে করবে? আমার ত সাধ্য নয়। প্রমথ, একটা কথা তোমাকে গোপনে বলি।✓এত দিন এ কথাটা আমার মনে ওঠে নি। এত বড় বড় কাগজ বার হচ্ছে, আমাকে কেউ Sub-Editor কি কিছু একটা করে না? অনেক কাজ তাদের ক'রে দিতে পারব। একটা বড় গল্প, একটা ধারাবাহিক ভাল উপন্যাস, একটা প্রবন্ধ, একটা সমালোচনা এও আমিই দিতে পারব। তাছাড়া, ছবি judge করা, গানের স্বরলিপির দোষগুণ ধরা, বৈজ্ঞানিক আলোচনা, সাহিত্যিক আলোচনা এও, (আর কিছু ভাল না জুটলে) আমি ক'রে দেব। ১০টা থেকে ৪।৫টা পর্য্যন্ত খাটুলে আমি খুব পারি। অবশ্য তাম্রলিপ্তি টিপ্তি পারব না। তার পরে এখন যেমন সকালে ও রাত্রে নিজের কায করি তখনও করব। দেখো ত যদি কেউ আমাকে নিতে স্বীকার করে। একজন ভাল Editor থাকলেই আমি কায চালিয়ে দেব। অন্ততঃ ছিছি কাগজ কোন মাসেই হ'তে দেব না, এ assurance তুমি আমার হয়ে দিতে পার। এ চাকুরি আমার খুব ভাল লাগ্‌বে, তবে যদি টিকসই হয়। এমন না হয় দু-দিন পরেই বলে, তোমাকে চাই নে যাও। এর মধ্যে যদি কোন কাগজ বার হবার কথাবার্ত্তা হয়, আর তোমার চেনা-শোনা থাকে তাহ'লে চেষ্টা দেখো—আমার বর্ম্মা আর পোষাচ্ছে না। দেশ দেশ মন কচ্ছে। সমাজপতির সম্বন্ধে কি পরামর্শ দাও? তোমার

মত ছাড়া আমি কিছুই করব না। কিন্তু বিপদেও বড় পড়েছি তা বোধ করি বুঝতে পাচ্ছ। সমাজপতি সম্বন্ধে কি করা উচিত অতি সত্বর জবাব দিয়ো। আর চিঠিটা হারিয়ো না, আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো, কেন না, এক সময়ে যখন আমার নিন্দে সুরু করবে, তখন কাযে আসতে পারে। Documentary evidence! আজ রাত্রে কিছুই হ'ল না, কেবল চিঠিই লিখছি।—শরৎ

14, Lower Pozoungdoung Street
Rangoon. 18. 8. 13

প্রমথ—আজ তোমার পত্র পাইয়া অনেক কথা জানিলাম। ইতিমধ্যে আমার এক মহা বিপদ ঘটে গিয়েছিল। একটা দাঁত (কসের) প্রায় তিন চার বছর থেকেই নড়ে। ১০।১২ দিন পূর্ব্বে হঠাৎ তাতে যন্ত্রণা সুরু হয়ে গেল। একটু একটু নড়ে কি না, তাই নাড়ালে একটু আরাম পাই। উনি পরামর্শ দিলেন, খুব ক'রে নড়াও, যদি ভিতরে বদ রক্ত থাকে ত বার হয়ে যাবে। তখন সেই ভাবে তাকে ঘণ্টাখানেক বেশ নড়ানো গেল, তখন রাত্রি প্রায় বারোটা। সকাল বেলা উঠে দেখি আর হাঁ করতে পারি নে। তার পরে সে কি যন্ত্রণা!! সে দিনরাত যে কি ক'রে গেল তা শুধু ভগবানই জানেন। পরদিন Dentistএর কাছে গেলাম। তিনি বল্লেন, উপড়ে ফেলে দিতে হবে। উনিও সঙ্গে গিয়েছিলেন, বল্লেন "ওরে বাপ রে! একটি দাঁত তুল্লে সব কটি দাঁত দু-দিনে ঝুর্ ঝুর্ ক'রে প'ড়ে যাবে এবং বেশ একটু scientific ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিলেন যে দাঁতে দাঁতে ঠেকে আছে—অসময়ে তুললেই আর রক্ষে থাকবে না। সাত পাঁচ ভেবে চ'লে আসা গেল, তার পর জ্বর। বুঝতেই পাচ্ছ কি কাণ্ড হচ্ছে। আর সহ্য হ'ল না,

তার পরদিন তুলে এলাম। সে যা Dentist! প্রথমে সে নড়া দাঁতের পাশে একটা ভাল দাঁত ধ'রে প্রায় আধ-ওপড়ানো-গোছ ক'রে তুলেছিল। যত বলি ওটা না ওটা না সায়েব থামো থামো—সে ততই বলে সবুর কর আর একটু টানি। তখন তার সাঁড়াশি হাত দিয়ে ঠেলে দিয়ে তবে দাঁতটা রক্ষা করি। তার পর নড়া দাঁত ওপড়ানো হ'ল। ওপড়ানো ত হ'ল—কিন্তু রক্ত থামে না। Dentist বল্‌লেন, "বাবু, তোমার দাঁত বড় খারাপ।" কথা শোন প্রমথ! তুই শালা তুল্‌তে জানিস নে—রক্তপড়ার দোষ হ'ল আমার দাঁতের! যা হোক এমনি ক'রে প্রায় ঘণ্টাখানেকের পর রক্ত বন্ধ ক'রে বাড়ী ফিরে এসে আবার জ্বর! আজো সেরে উঠতে পারি নি। ৮।১০ দিন লেখাপড়া আফিস সমস্ত বন্ধ! না হ'লে তোমাদের লেখাটেখাগুলো শেষ হয়ে যেত। যাহোক তাড়াতাড়ি ক'রে এইবার লিখে পাঠাব। ভেবো না। আমার ঐ তিনটা গল্প[১] বই ক'রে ছাপানো সম্বন্ধে আমার আপত্তি নেই, যদি না কিছু ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়। হাঁ বিক্রী হবে ব'লেই মনে হয়, কারণ এর মধ্যেই অনেকে জান্‌তে পেরেছেন। তুমি যেমন ক'রে ছাপতে বল্‌বে তাই হবে—শুধু ছবি দেওয়া হবে না, এইটি আমার অনুরোধ। Copyright বিক্রী করতে চাও কর, না করতে চাও ক'রো না—যা তোমার খুশী, আমি তোমার উপর সম্পূর্ণ ভার দিলাম, এ সম্বন্ধে আমাকে আর জিজ্ঞাসা করবারও আবশ্যক নাই। তবে, এই আশ্বিনে 'ভারতবর্ষে' যে গল্পটা বার হবে সেইটে নিয়ে চারটে একসঙ্গে ক'রে ছাপালেই ভাল হয় বোধ হয়। Copyright বিক্রী ক'রে যদি টাকা পাই ত H. Spencerএর বইগুলো কিনে ফেলি। যাহোক যা ইচ্ছা ক'রো।

১। বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি ও পথনির্দ্দেশ।

আমার চাকরি ছাড়ার এত আবশ্যক নাই—ছুটি নিয়ে যাই—দেখি শুনি তার পরে যা হয় করা যাবে।

সমাজপতিকে চিঠির জবাব দিয়ে দিয়েছি। এই রকম লিখেছি যে আপনি চতুর্দ্দিকে advertise করেন তাতে প্রসিদ্ধ গল্পলেখক এবং চমৎকার গল্পলেখক দীনেন্দ্রবাবু, প্রভাতবাবু, সরোজনাথ প্রভৃতির উল্লেখ করেন, কিন্তু আমার কিছুমাত্র উল্লেখ না থাকায় মনে করি আপনার মত প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সমজদার ও সমালোচক যখন আমার গল্পের কিছুমাত্র উল্লেখ করেন না, তখন নিশ্চয়ই আমার গল্প ভাল নয়। এই সঙ্কোচেই আমি আপনার প্রসিদ্ধ 'সাহিত্য' পত্রিকায় লিখিতে ভয় পাই এবং ভবিষ্যতেও পাইব।

এখনো ত জবাব পাই নি। পেলে জানাব। বাস্তবিক লোকটি সহজ নয়। শুনলাম 'যমুনা'র বিনিময় বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। যত আক্রোশ তাঁর 'যমুনা'র উপর। অথচ, তিনি যমুনাটি আগ্রহে পড়েন।

আজ আর না, রাত্রি ১॥০টা, শুইগে।—তোমার শরৎ

14, Lower Pozoungdoung Street
Rangoon.
[ডাকমোহর ২ সেপ্টেম্বর ১৯১৩]

প্রমথনাথ—আজ তোমার চিঠি পেলাম। কন্যার জন্ম হয়েছে শুনে বড় খুশী হলাম। এই দুটি বেঁচে থাক—আর আবশ্যক নাই। জর জর হয়েই আছে। ডাক্তারের ওষুধ খাচ্ছি, পড়াশুনো একেবারে থামিয়েছি। কেন না, আমার এ বিষয়ে নেশার মত ঝোঁক ধরে। একবার সুরু করলে মোটেই moderation থাকে না, হয়ত রাত্রি ৩।৪ হয়ে যায়। হাঁ, নারীর মূল্য ও চন্দ্রনাথ দু-ই এইবারে শেষ হয়েছে। আমি

তোমাকেও সময়ে গল্প পাঠাতে না পারার জন্য লজ্জায় তোমাকে চিঠি দিতেই পারছিলাম না। যাহোক শুন্‌লাম প্রভাতবাবু প্রভৃতির গল্প পেলে আর তাড়াতাড়ি নাই। তাছাড়া, পূজার সংখ্যায় ওঁর গল্প দিয়ে আবার আমার গল্প দেবার স্থান সঙ্কুলানও হয়ত হ'ত না। হাঁ ঐসব গল্প বই ক'রে ছাপার জন্য কিছু কিছু সংশোধন ক'রে দিতে হবে, কেন না বিস্তর ছাপার ভুল, sentence লোপ প্রভৃতি দোষ আছে। ভাই প্রমথ আজ তোমাকে একটা সত্য কথা বলি। আমার সন্দেহ হচ্ছে আমার আর বেশী দিন নেই। হয়ত বা এই বছরটাই শেষ বছর। যদি হঠাৎ মরি ভাই, মনে-টনে রেখো। তুমি ছাড়া আমার বোধ করি আর বন্ধুই নেই—কত যে তোমাকে ভালবাসি, তা একটু পূর্ব্বেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভেবে দেখছিলাম। যাক্ এ সব মেয়েলি দুঃখের কথা—যেতে হয় যাওয়া যাবে। তবে আর একবার যেন দেখা হয় এইটাই মনের শেষ সাধ। গেলে তোমার ওখানেই থাক্‌ব। মরি ত সদ্গতি হবে—বামুনের কাঁধে চ'ড়ে পরম মিত্রের মুখ দেখে, শেষ সেবা নিয়ে, নিমতলায় যাওয়া যাবে। কেমন? আমার কতটুকু ক্ষমতা ভাই, কিবা জানি, মাতৃভাষা আমার কাছে আর কি আশা করে? শুয়ে শুয়ে চিঠি লিখতে কষ্ট হচ্ছে—একটু জোর পেয়ে সব কথা ভাল ক'রে জবাব দেবো। প্রাণধনকে আমার কথা বলো। আর একটা কথা—'বিন্দুর ছেলে' গল্পটার অত্যন্ত সুনাম হয়েছে। অনেকের মত এইটাই best. অনেকের মত 'পথনির্দ্দেশ', অনেকের 'রামের সুমতি'। ভাবি equally intelligent লোকদের মধ্যে এ রকম মতভেদ হয় কেন? এমন সংবাদও পেয়েছি যে 'পথনির্দ্দেশ'টা immoral !!. ভাদ্রের 'যমুনা'য় দ্বিজুদার সম্বন্ধে একটি কবিতা বেরিয়েছে—ভারি সুন্দর! ভাদ্রের 'ভারতবর্ষ' পাই নি। বোধ করি

তাঁরা পাঠাতে ভুলেছেন, কিম্বা হয়ত officeএর ঠিকানায় পাঠিয়েছেন, কেউ মেরে দিয়েছে। যাই হোক সে কথা কাউকে জানাবার আবশ্যক নেই—তোমার কপিটা পাঠিয়ে দিয়ো, একবার প'ড়ে ফেরত পাঠাব।

দিদির সম্বাদ এখনও পেলাম না, সেজন্য ভেবে ভেবে আরো যেন শরীর খারাপ হয়ে উঠেছে। সেখানে telegraph যায় না—চিঠির জবাবও পাচ্ছি না। সমাজপতির সম্বন্ধে যা লিখেছ ঠিক সেই জবাবই পেয়েছি। আমিও বুঝেছি ব্যাপারটা কি! হ্যাণ্ডবিলও একখানা ফণি পাঠিয়েছিল—বাস্তবিক মিথ্যে কথা এমন নির্লজ্জভাবে বলছেন যে, যে পড়ে তারও লজ্জা করতে থাকে। আমি তাঁকে কিছুতেই 'লেখা' পাঠাব না, কারণ তিনি তোমাদের শত্রু তার উপর সুবিধার লোক নন।

তোমার শরৎ

30. 9. 13

প্রমথ—আজ তোমার চিঠি পেলাম। তোমার বাড়ীর খবর শুনে বড় চিন্তিত হয়ে থাকলাম, অতি শীঘ্র ভাল সম্বাদ দিয়ো। আপাততঃ একটু ভাল ক'রে ঘরের দিকে মন দাও, পরের কাজ দু-দিন পরে করলেও চল্‌বে। বৌঠানের আবার কি হ'ল? বাহিরেই বা যাবে কেন? কলকাতায় থাকতে পেলেই ত লোক বেঁচে যায়—তুমি ছেড়ে যেতে চাও কেন? না, আমি পূজার সময় যাব না। যেতাম শরীর ভাল থাক্‌লে। অসুস্থ থাকা পর্য্যন্ত কারু কাছে কিছুতেই যাব না। ও আমার ভারী লজ্জা করে। সারলেই পালাব নিশ্চয়।

গল্পটা খানিক লিখেছিলাম—কিন্তু তোমার এম্‌নি নামের মহিমা যে সেটা একেবারেই কদাকার হয়ে উঠেছিল; শেষ না হ'লে কোনমতেই বলা চলে না ছাপার উপযুক্ত কি না! যদি দেখি ভাল হয় নি, তোমার

নামে ছাপতে হবে। অঘ্রাণে ছাপা হ'লেই ভাল হয়—আমিও দু-দিন বিশ্রাম করি। অর্থাৎ পড়া লেখা যেমন বন্ধ করে আছি, তেমনিই থাকি! তবু তোমাদের কিছু সত্যিই আর আটকায় না, কিন্তু যে বেচারার সত্যিই আটকাচ্ছে তার জন্যেই বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। লিখি নে বটে, কিন্তু ভাবতেও ছাড়ি নে। সেটা ভাল ভাবনা নয় নিতান্তই দুর্ভাবনা। আমি ছাড়া সে বেচারার আর প্রায় কোন সম্বলই নেই। তবে বুড়িকে[১] এক রকম পরওয়ানা জারি ক'রে দিয়েছি যে, 'যমুনা'কে বিশেষ সাহায্য করতেই হবে। সে আমার হুকুম কোন কারণেই অমান্য করতে পারে না, সেই ভরসা। তা হ'লে কি হয়, সে বেচারাও প্রায় শয্যাগত। আমার নারীর মূল্যও শেষ হ'ল; বিস্তর সুখ্যাতি ক'রে অনেক পরিচিত অপরিচিত লোকেরই এ সম্বন্ধে চিঠি পেলাম—কিন্তু ভাব্‌ছি লোকে আমার নাম জান্‌লে কি ক'রে? হয় ফণির দ্বারা, না হয় তোমার দ্বারা এই অনিষ্ট ঘটেছে। এবার কি সুরু করি বল ত? দশটা মূল্যের, বেশ্যার মূল্য আর নেশার মূল্য যা বোধ করি সবচেয়ে interesting হ'ত, তাইতেই বন্ধু বান্ধবের ভীষণ আপত্তি। তারা কিছুতেই রাজী নয় যে আমি এ দুটো দিদির নাম দিয়ে লিখি। মনে করেছি Evolution of idea of God কিম্বা Evolution of idea of Soul সুরু করব। অবশ্য ঠিক নারীর মূল্যের ধরণেই। তুমি যা বল, তাই করব। আমি তোমাকে অনেক অপদস্থ করেছি, আমার সব মনে আছে—একটু ভাল হই, তার পর দেখা যাবে যদি শোধ করতে পারি। আমার ব্যবহারে তুমি যত ক্ষুণ্ণই হয়ে থাক না কেন, এক দিন এটা যাতে ভুলতে পার, সে কথা আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলি না। চিঠির জবাব একটু তাড়াতাড়ি দিয়ো। বড় ভাল নই।—তোমার শরৎ

১। নিরুপমা দেবী।

পুনঃ—চন্দ্রনাথ তোমার ভাল লাগবে তাতে আশ্চর্য্যের বিষয় নাই, কেন না ওটা আমার ভাল লাগে নি। ৮একে ত ছেলেবেলার লেখায় স্বভাবতই অপূর্ণতা বেশী, তাতে মাঝে মাঝে উচ্ছ্বাস র'য়ে গেছে। এই উচ্ছ্বাস বস্তুটিতে আমার ভীষণ ভয়। যাই হোক পাঁচ জনের ভাল লাগলেই ভাল। তবে ভাষাটা খুবই সরল—বোধ করি আশ্চর্য্য সরল এবং direct এটা অস্বীকার করা যায় না।

14, Lower Pozoungdoung Street.
Rangoon, 22. 10. 13

প্রমথ—তোমার চিঠি পেয়ে বিশেষ চিন্তিত হলাম। এখন অন্য সব আলোচনা আমার সত্যই ভাল লাগে না। তোমার বাড়ীর খবর একটু একটু ক'রে জানাবে। বৌঠান কেমন আছেন, এবং কি রকম ব্যবস্থা করছ শীঘ্র লিখে চিন্তা দূর করবে। তোমার পিসীমা যখন ভাল হবেন, এবং অন্য খবর সব মঙ্গল ব'লে লিখতে পারবে তখন আমিও আমার সম্বন্ধে আলোচনা করব, এখন নয়। হাওয়া বদলাবার ব্যবস্থা করতে বিলম্ব ক'রো না।

যা হোক দুটো কথা জানাবার আছে। 'যমুনা' সম্বন্ধে তুমি যা বলেছ—noted.

দ্বিতীয়, তোমার জন্যে যেটা লিখতে লিখতে ছেড়ে দিয়েছিলাম, সেটা শেষ হ'ল। নিতান্ত মন্দ হয়নিই ব'লে মনে হচ্ছে কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ মস্ত বড় হয়ে গেল—দুয়ের বার হয়ে গেছে। 'বিন্দুর ছেলে'র দেড়া বড় হয়েছে, কি উপায় করি? আবার তাড়াতাড়ি আর একটা লিখতে সুরু ক'রে দিয়েছি। তুমি যদি বল তোমার উত্তর পাওয়া মাত্র

ঐ বড়টা registry ক'রে পাঠাতে পারি। তোমাকেই পাঠাব কেন না তোমার জন্যে লেখা—যা খুশী করতে পার।

'মূল্য' 'টুল্য' সুরু করেছি বটে, এগোচ্ছে না। কারণ শরীর সারলেও বেশী চাপ দিতে সাহস হয় না। না, ওগুলো ফাঁকিতে সারা যায় না।

তোমাদের 'ভারতবর্ষ' যে রকম উন্নতি করেছে বাস্তবিক বড় সুখের বিষয়। কিন্তু, আমি ত সত্যই ভেবে পাই না এত উন্নতির হেতু কি ? ইন্দ্রজাল তোমরা জানো বলতে পারি না। এক একবার ভাবি দ্বিজুদা বেঁচে থাকলে না জানি কি রকম হ'ত!

তোমার নিজের যা লেখা আছে ছাপাও না কেন? আমি না প'ড়েই বলতে পারি, তা তোমাদের কাগজে শীর্ষস্থানে স্থান পেতে পারবে।

বিভূতির[১] নভেলটা তোমরা ছাপালে ত খুব ভাল হয়। এমন grand বই আমি অনেক দিন পড়ি নি—তাই বা কেন, কোন দিন পড়ি নি। কিন্তু দোষও আছে—সেটা হচ্ছে এই যে arrangementএ গোলমাল আছে ব'লে মনে হচ্ছে—অর্থাৎ chapter আর ঘটনাগুলা একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে বসাতে হবে। বস্তু আর ভাব যা আছে তা যথার্থই অতি সুন্দর, যে-কোন কাগজের গৌরবের জিনিস হবে কিন্তু আমার ভয় হয়, arrangementএর এই গোল থাকাতে অনেকেরই প্রথমটা প'ড়েই বিস্বাদ লাগবে। আর এগোতে চাইবে না—শেষ পর্য্যন্ত পড়বে না। আমি পুঁটুর (বিভূতির) চিঠি পেলে তোমাকে অন্য কথা জানাব।—শ.

১। বিভূতিভূষণ ভট্ট।

আমার রামের, সুমতি প্রভৃতির কাপিটাপি পরে হবে। তাড়াতাড়ি কি? সমস্তই আমার ঠিক করা আছে, পাঠালেই হয়।

31. 10. 13

প্রমথ—তোমার পত্রের আশায় আশায় থাকিয়া বিলম্ব হইয়া গেল। আজ এই মাত্র তোমার চিঠি পাইয়াছি। যেমন সময়ে পাইলাম, তখন আর registry করিবার সময় ছিল না, এবং unregistered পাঠাইতেও সাহস হইল না বলিয়া আগামী মেলে পাঠাইতে হইবে। এ মেলে হইল না। তোমার চিঠির জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম এই ভাবিয়া যে, এত বড়টা তোমাদের কাযে লাগিবে কি না। এখন দেখিতেছি 'বিন্দুর ছেলে'র ডবল হইয়া গিয়াছে। ✓আমার গল্পের একটা natur সমাপ্তি আছে, plot হিসাবে সেটা সম্পূর্ণ আপনা আপনি হয়, আমি গরজ বুঝিয়া তাহাকে ছোট কিম্বা বড় করিতে পারি না। এখানে আমার গুটিকতক সমজদার সাহিত্যিক বন্ধু আছেন, তাঁদের মতে, আমার অপরাপর গল্পের চেয়ে—art প্রভৃতি হিসাবে, এবং লেখার হিসাবেও far more excellent—তবে আমি নিজে ঠিক সে কথা বলিতে পারিব না, আমার নিজের লেখার সম্বন্ধে নিজে ঠিক judge নই। তোমরা ভাল বলিলেই এখন সার্থক হয়। একটু মন দিয়া বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়ো—তবে এটা অবশ্য বলিতে পারি, "তোমাদের কাগজে এ পর্য্যন্ত যাহা বাহির হইয়াছে, তাহার চেয়ে কোনমতেই নিকৃষ্ট হইবে না। এখন তোমাদের রুচি। একে তুমি যেমন ইচ্ছা তেম্নি করিয়া প্রকাশ করিতে পার অর্থাৎ যা ভাল বুঝিবে তাই করিয়ো। আমার শুধু এই অনুরোধ যে ছবি দিতে পারিবে না। তাহাতে অনর্থক পয়সার শ্রাদ্ধ অথচ আমার মতে

আবশ্যকীয় নয়। অন্ততঃ আমার গল্পে নয়। আশা করি আমার এই অনুরোধটা একবার রাখিবে। তাহাতে আমারও আহ্লাদ হইবে। তোমাদেরও পয়সা বাঁচিবে এবং গ্রাহকও খুশীই হইবে, অন্ততঃ দুঃখিত হইবে না।—শরৎ

আগামী মেলে registered তোমার ঘরের ঠিকানায় পাইবে।

'বিরাজ বৌ'

প্রমথনাথ—আমার গত পত্রে আশা করি সব কথা জানিয়াছ। গল্পটা পাঠাইতে বিলম্ব হইয়া গেল, তাহারও সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ৎ দিয়াছি। একে ত এত বড়, তোমাদের ভাল লাগিবে কি না, ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তার পর তোমার অভয় পাইয়া পাঠাইলাম। গল্পটা একটু মন দিয়া পড়িয়ো এবং immoral ইত্যাদি ছুতা করিয়া reject করিও না। তাও যদি কর, কাহাকেও reject করার কারণ দর্শাইয়ো না। আমার "চরিত্রহীন" তোমাদের বদনামের গুণে সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বসিয়াছে। অর্থাৎ কাল ফণী telegraph করিয়াছে "Charitrahin creating alarming sensation." আমি জিজ্ঞাসা করি কি আছে ওতে? একজন ভদ্রঘরের মেয়ে যে-কোন কারণেই হৌক, বাসার ঝি-বৃত্তি করিতেছে—(character unquestionable নয়) আর একজন ভদ্র যুবা তারই প্রেমে পড়িতেছে—অথচ শেষ পর্য্যন্ত এমন কোথাও প্রশ্রয় পাইতেছে না। অথচ রবিবাবুর 'চোখের বালি' ভদ্রঘরের বিধবা নিজের ঘরের মধ্যে এমন কি আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে নষ্ট হইতেছে—কেহ কথাটি বলে নাই! (কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীকে মনে পড়ে?) 'মানসী'তে প্রভাতবাবু, এক ভদ্র যুবার

মুখে আর এক ভদ্র বিধবার সতীত্ব হরণের মতলব আঁটিতেছেন! সোনার হরিণ কত কি কীর্ত্তিই সুরু করিয়া দিয়াছে। (অবশ্য এটা বটতলার উপযুক্ত! Detective story ছাড়া তিনি কিছুই প্রায় লিখিতে পারেন না। 'ডাকাতে ঠানদি'-গোছের বই। যেমন নবীন সন্ন্যাসীর 'গদাই পাল' আর সেই মাগীটা তেমনি এও)। কোন দোষ নাই কেন না নাম 'রত্নদীপ!' (এবং লেখক প্রভাতবাবু) আর আমার 'চরিত্রহীন' যত অপরাধে অপরাধী? যারা ইংরাজি, ফ্রেঞ্চ কিম্বা জার্ম্মাণ নভেল পড়িয়াছে তাহারা অবশ্য বুঝিবে ইহা সত্যই immoral কি না। কিন্তু তোমরাও ভুল বুঝিয়াছ বলিয়াই আমার যত দুঃখ। তোমাদের 'সুরজ কওর' সম্বন্ধে কেহ কথাটি বলিল না! টলষ্টয়ের Resurrection বেষ্ট বই! যাই হোক আমি এখনও স্বীকার করি না এবং বুঝি না বলিয়াই করি না যে 'চরিত্রহীনে' এক বর্ণও immorality আছে। কুরুচি থাকিতে পারে, কিন্তু যা পাঁচ জনে বলিতেছে তা নাই। তবুও নাম দিয়াছি 'চরিত্রহীন,' এর মধ্যে "কুল-কুণ্ডলিনী" জাগাইয়া তুলিব অবশ্য এ আশা করিতেই পারি না। যাহার ইচ্ছা হয় পড়িবে, যাহার নামটা দেখিয়া ভয় হইবে, সে পড়িবে না। 'রত্নদীপ' নাম দিয়া—বাড়ীর কেচ্ছা সুরু করি নাই। যাই হোক, তোমাকে আমি একটু ভয় করি বলিয়াই 'বিরাজ বৌ' সম্বন্ধে এইটুকু আবেদন করিলাম। এবং তোমার চিঠি না পাওয়া পর্য্যন্ত আমার ভয় ঘুচিবে না, এ গল্পটা তোমাদের কাছে immoral বলিয়া মনে হইয়াছে কি না। যদি হয়, আর কাহাকেও না দেখাইয়া চুপি চুপি registered ফিরিয়া পাঠাইবে। কাহাকেও জানিতে দিবে না, তোমাকে কোন কিছু পাঠাইয়াছিলাম কি না। এ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত।

তোমার বাড়ীর অনেকটা ভাল খবর পাইয়া খুব সুখী হইলাম।

হা changeএ পাঠাও। আমার যাওয়ার সম্বন্ধে—শরীর বেশ করিয়া না সারিলে এক পা নড়িব না। যেমন আছি, তেমনি থাকিলে X'mas নাগাদ দেখা যাইবে।

মূল্য স্থরু করিয়াছি। 'ভগবানের মূল্য' 'বিধবার মূল্য' পূর্ণ তেজে অগ্রসর হইতেছে। ভাল কথা, তোমার সেই কাণাকড়ির মূল্যের কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম—আজ তাহাকে হঠাৎ পাইয়াছি। দুই চারি দিনে তাহাকেও ঠিক ঠাক করিব।

আমার 'রামের স্থমতি' প্রভৃতির কাপি শীঘ্রই পাঠাইব। একটু ভালো করিয়া ছাপাইলে ভাল হয়—অবশ্য যা বুঝিবে তাই করিবে।

এইবার কাযে মন দিই।—শরৎ

Rangoon
13. 3. 14

প্রমথ—পরশু সন্ধ্যায় ফিরিয়াছি। রক্ত আমাশা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। বেশ রোগটি, না? তোমার কেমন? শুনিলাম, আমি নাই, এই মর্ম্মে হরিদাস বাবুকে জানাইবার জন্য টেলিগ্রাফ করা হইয়াছিল। বুদ্ধির কাজ করা হইয়াছিল। কিন্তু, তুমি বুদ্ধিমান্ হরিদাস বাবুকে সে সম্বাদটা দাও নি কেন? তা হ'লে তিনি ত আমার চিঠি না পাওয়ার দরুন, লেখা না পাওয়ার দরুন দুঃখ করতেন না! আজ ২০০৲ পেলাম। ভাল। ছোটগুলাও পাঠাচ্ছি। লোভে পড়ছি না কি, তাও আবার ভাবছি। শুনি সাহিত্যিকের মৃত্যু ইহাতেই ঘটে। হরিদাস বাবুকে বলিয়ো তিনটা ছোট গল্প যেন না ছাপান। এইবারের ছোট গল্পটা (সম্ভব ভালই হবে) এক ক'রে চারটা গল্প চতুষ্পদ নাম দিয়ে ছাপালে বেশ হবে, কি বল? বিরাজ বৌ লিখে অনেকটা জ্ঞান জন্মেছে।

ভায়া, এবারে আর ফাঁদে পা শীগ্‌গীর দিচ্ছি না। এমন ক'রে এবার থেকে আট-ঘাট বেঁধে লিখব যেন, প্রভাতবাবুও দোষ খুঁজে না পান। রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে—ঐগুলোর ত আর দোষ বার করা যায় না। 'হরিনাম' যেই করুক, লজ্জার খাতিরেও ভাল বলতে হবে। আমি 'হরিনাম' গাইব। দেখি এতে কি হয়। বৈশাখের জন্য হরিদাস বাবুকে নিশ্চিন্ত হ'তে ব'লো। আমি কথা দিচ্ছি। একটা বড় উপন্যাস 'গৃহ-দাহ' নাম দিয়ে খানিকটা লিখেছি—এতেও ঐ শিক্ষা কাযে লাগাব। ফাঁদে পা দেব না। 'বিরাজ বৌ' নিয়ে যেমন মানুষ ঐটুকু খুঁত পেয়েই হৈ চৈ ক'রে নিন্দে করবার সুযোগ পেলে—ও সুযোগ আর সাধ্যমত দিচ্ছি না।

কেমন আছ? ছেলে মেয়ে কেমন? গৃ—কেমন? ভায়া, পিসিমা—সব ভাল ত? সম্ভব 20th April start ক'রব।—তোমার শরৎ

কি খাটুনি বাপ রে! রক্ত আমাশা হয়ে শাপে বর হয়েছে—আর যাচ্ছি না।

Rangoon
28. 3. 14

প্রমথ—নানা কারণে তোমার চিঠির জবাব দিতে দেরি করিয়াছি। Inject করিতে আমার ভরসা হয় না—ওসব আমি পারিব না। জান বোধ হয় আমি ভয়ানক opium-eater—তাহার রক্ত আমাশা! ব্যাপার এই। যা হোক এদেশে ম্যাংগোষ্টিন ফলে এ রোগ খুব সারে, আমি তাই খাই—প্রায় সেরে এসেছে। ভয় নেই। না হ'লে, এ মুল্লুকের রক্ত আমাশায় লোক ২৪ ঘণ্টায় পর্য্যন্ত মরে। তবে ভাবনা এই ছিল যে আমার অত সুকৃতি নাই। আমার এই, তার পর এদিকের

হঠাৎ neuralgic pain পিঠের নীচে হইয়াছে, গত বৃহস্পতিবার থেকে আজ শনি—২০।২৫ টাকা বোধ করি ঔষধ শুধু লাগ্‌ল—কিছুতেই সারছে না। রাঁধাবাড়া, অফিসের কাজ করা, ডাক্তার ঔষধ মালিশ করা—সমস্তই দরকার—গোদের ওপর বিষফোড়া চাকর পালিয়েছে। মন কি রকম বোঝা বোধ করি শক্ত নয়। তার ওপর ফণির যমুনায়—থাক সে কথা। একটা গল্পের অর্দ্ধেক লিখে আজ পাঠাব মনে করেছিলাম কিন্তু রেজেষ্ট্রির সময় নেই—সেইটা তোমার ঠিকানায় আগামী মেলে পাঠাব যদি সময় থাকে, আর আমার ওপর ভরসা করতে পার তা হ'লে অর্দ্ধেকটা ছাপিয়ো—১০।১২ দিন পরে শেষটা শেষ ক'রে দেব। খানিকটা পড়লেই বুঝতে পারবে। তবে ছাপাবার তখন সময় থাকবে কি না জানি না। এবারের 'ভারতবর্ষ' পেয়েছি। প্রবন্ধগুলি সবই প্রায় ভাল। হরিদাস বাবুকে চিঠি লিখতে লজ্জা বোধ হচ্ছে।—শরৎ

54. 36th Street, Rangoon.
[ডাকমোহর ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৫]

প্রমথ—তোমার পত্র পাইয়া জানিলাম তাহারা সবাই ভাল আছে। তোমার আবার জ্বর হইতেছে শুনিয়া বড় উদ্বিগ্ন হইলাম। ব্যাপার কি, ম্যালেরিয়া না কি? বোধ হয় তাই। তা' যদি হয় বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। খাট দুটা ভাল হয় নাই, তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম—নেহাৎ জাবাড়ে-গোছের হইয়াছে—মিস্ত্রীর অসুখ না হইলে আর একটু চলনসই হইলেও পারিত। যা হোক কতক কাজে লাগাইতে পারিয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম। মাপ দিতে ভুল

করিয়াছিলে, তাই আবার বেঙ্কি করিয়া গচ্ছা লাগিল—সেটা নেহাৎ তোমারই দোষ।

খাটের দাম ২৩৲+১৲ পেতলের স্ক্রু। আর বাঁধবার দড়ি, কিছু কুলীর খরচ। সেটা contingent expense.

এই ২৪৲ টাকার বাকী ২০৲ টাকা দেবার জন্য তোমার যেন আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে। প্রতি পত্রেই সেই কথা। এটা জানিয়া রাখ বিশ টাকা না পাইলেও আমার দুঃখ অসহ্য হইয়া উঠিবে না, পাইলেও বিশেষ দুঃখ দূর হইবে না। আমার অভাব উহাতে বাড়েও না কমেও না। দিলে ভাল হয় দাও, না দিলে ভাল হয় দিও না। আমি আর বকাবকি করিতে পারি না। কি একটা তুচ্ছ কথা কত বার উল্লেখ করিবে? তুমি ত আমাকে ঢের জিনিস দিয়াছ, আমি ত অম্লান মুখে লইয়াছি—কখনও টাকা দিবার জন্য মনের মধ্যে সঙ্কোচ বোধ করি নাই। যেমন করিয়া দিলে তোমার ভাল বোধ হয় তাই দিয়ো। চোরবাগানেই[১] দিয়ো।

এঁকে[২] ত এবার পাঠানই চাই। আমারও চলে না—তাঁর ত প্রায় আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে। এই চিঠি পাইবা মাত্র একখানা টিকিট রিজার্ভ করিবার জন্য B. I. S. N.কে intimation দিয়ো। তাহারাই বলিয়া দিবে কোন্ জাহাজে berth পাওয়া যাইবে।

১। শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে জুনমাসে শরৎচন্দ্র অফিসে কয়েকমাসের ছুটি নিয়ে সস্ত্রীক কলকাতায় এসেছিলেন। কলকাতায় এসে তিনি চোরবাগানে ছিলেন। ডিসেম্বর মাসে শরৎচন্দ্রকে হঠাৎ তাড়াতাড়ি রেঙ্গুনে ফিরে যেতে হওয়ায়, যাওয়ার সময় তিনি তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন নি। তাঁকে চোরবাগানে রেখে গিয়েছিলেন।

২। শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবীকে

তার পর যেদিন হোক্ টাকা লইয়া টিকিট লইয়া আসিয়ো। তাঁর 45-0-0+ভেলুর[১] 4/-=49/-.

তোমার শরীর অসুস্থ, তোমাকে কোন উপরোধ করিতেই লজ্জা করিতেছে। কিন্তু আমার একটি বন্ধুর ৪।৫ মার্চ্চ নাগাদ ফিরিবার কথা আছে। খুব সম্ভব তিনি ছেলে মেয়ে পরিবার লইয়া আসিবার পথে চোরবাগানের সন্ধান লইয়া আসিবেন—সে হইলে অনেক আসান, না হইলে হয়ত তোমাকেই বড় কষ্ট পাইতে হইবে। জিনিসপত্র গুছাইয়া বাঁধিয়া জাহাজে তুলিয়া দিতে হইবে। যে সব জিনিসের আবশ্যক নাই (কারণ আমি ১ বৎসরের মধ্যেই আবার ফিরিয়া যাইব) তাহা তোমার ওখানে থাকিলেই সুবিধা। তবে বইগুলা কোনমতে প্যাক করিয়া নষ্ট না হয় এরূপে আনা চাই। রঙের বাক্স, আরও একটা ছোট বইয়ের বাক্স আনিবার আবশ্যক নাই। বড় সিন্দুকটাও দরকার নাই।

কি কি আনা চাই তা' সেই ভাল জানে।

আর একটা কথা। ৪।৫ জোড়া গায়ে গাঁথা বঁড়শি—বড় সাইজের ২।৩ জোড়া, মাঝারি সাইজের ২।৩ জোড়া এবং কিছু ছিপ-বাঁধা কড়া ও হাতে ভাঙ্গা মুগার সুতা—ভাই, নিশ্চয় দিয়ো। ওঁর কাছে টাকা চাহিয়া লইয়ো। আর সেই ঘড়িটা যদি চলে তবে, না হ'লে নয়। অচল ঘড়ি আমার বইয়ের আলমারিতেও একটা আছে। মাঝে মাঝে চলে, মাঝে মাঝে থামে। তাতে আবশ্যক নাই।

যাহোক first available টিকিট রিজার্ভ করিবার চেষ্টা করিবে।

১। শরৎচন্দ্রের কুকুরের নাম ছিল ভেলু। শরৎচন্দ্র কলকাতায় আসার সময় তাঁর পোষাকুকুর ভেলুকেও রেঙ্গুন থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।

আর এ বিষয়ে কিছু লিখিতে চাই না—তুমি আমার চেয়ে কম বোঝো না।

হরিদাস ভায়াকে বলিবে আমি একটা গল্প লিখিয়াও শেষ করিতে পারিতেছি না। এইবার শেষ করিয়া পাঠাইব। এ মাসে যাবে না বোধ করি, কারণ সময় নেই।

এরা না এলে লিখতেই পারি না। মেসে হয় না—সব লোকেই দেখ্‌তে চায়, উঁকি মারে—এই সব উৎপাত। আমি যে অবস্থায় অনেক লিখেছিলাম—ঠিক সেই অবস্থায় না পড়লে আর কিছুই হয়ে উঠছে না—দেখছি!

হরি ভায়ার পিতাঠাকুর মশায় আছেন কেমন? বোধ করি এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন।...হরিদাসের কথা আমি প্রায়ই মনে করি। সত্যই a good man যথার্থ এই উপাধিটা আজকাল কেন সব কালেই পাওয়া শক্ত। আমার মনের বিশ্বাস He deserves respect & affection—না? তোমার কথাই সত্য।...শরৎ

ভাল কথা, আজকাল 'ভারতবর্ষ' আগের চেয়ে ঢের ভাল হচ্ছে, না? আমার মতও এই, আজকাল অনেক বন্ধুবান্ধবেরও মত দেখছি এই। যারা মোটেই সুখ্যাতি করত না বরং নিন্দা করত তারাও এখন বলে—'মন্দ না'—আমাদের দেশের তুলনায় এই এর চেয়ে আর ভাল হয় না। বুঝেছ? এইবার আর 'ভারতবর্ষে'র মার নাই—টিকিয়া গেল।

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়[1]কে লেখা]

10. 1. 13
D. A. G's Office. Rn.

প্রিয় উপীন—তোমার পত্র পেয়ে দুর্ভাবনা গেল। দু'দিন পূর্ব্বে ফণীন্দ্রের পত্র ও চরিত্রহীন পেয়েছি। তোমাদের ওপরে বেশি দিন রাগ ক'রে থাকা সম্ভব নয়, তাই এখন আর রাগ নেই, কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বে সত্যই অনেকটা রাগ ও দুঃখ হয়েছিল। আমি কেবলি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতাম এরা করে কি? একখানা চিঠিও যখন দেয় না, তখন নিশ্চয়ই এদের মতিগতি বদলে গেছে। তোমাকে একটা কথা ব'লে রাখি উপীন, আমার এই একটা ভারী বদ্ স্বভাব আছে যে একটুতেই মনে করি লোকে যা করে তা ইচ্ছে ক'রেই করে। ইচ্ছা না ক'রেও যে কেউ কেউ অভ্যাসের দোষে আর এক রকম করে, আমার নিজের সম্বন্ধে সে কথা মনে থাকে না। Sensitive ব'লে একটা কথা যে আছে আমার সেটা অপর্য্যাপ্ত রকম বেশি। সুরেন[2]কে আজ হপ্তা দুই একখানা চিঠি দিয়েছিলাম আজ পর্য্যন্ত তার জবাব পেলাম না। এরা কেনই বা লেখে, কেনই বা লেখা বন্ধ করে। তুমি 'কাশীনাথ' সমাজ-পতিকে দিয়ে[3] ভাল কর নি। ওটা 'বোঝা'র[4] জুড়ি, ছেলেবেলার

১। ইনি শরৎচন্দ্রের মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথের পুত্র।

২। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ইনি শরৎচন্দ্রের মাতামহের অন্যতম ভ্রাতা অঘোরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র।

৩। ৯ পৃষ্ঠায় ২ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য। "সাহিত্যে"র ১৩১৯ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় কাশীনাথ প্রকাশিত হয়।

৪। "যমুনা"র ১৩১৯ সালের কার্ত্তিক-পৌষ সংখ্যায় "বোঝা" প্রকাশিত হয়েছিল।

হাত-পাকানর গল্প। ছাপান ত দূরের কথা, লোককে দেখানও উচিত নয়। আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা, যেন না ছাপা হয়। আর আমার নামটা মাটি কোরো না, একা 'বোঝা'ই যথেষ্ট হয়েছে।

আমি যমুনার প্রতি স্নেহহীন নই। সাধ্যমত সাহায্য করব, তবে ছোট গল্প লিখতে আর ইচ্ছে হয় না—ওটা তোমরা পাঁচ জনেই কর। প্রবন্ধ লিখব—এবং পাঠাবও। চরিত্রহীন কবে সম্পূর্ণ হবে বলতে পারি না। প্রায় অর্দ্ধেকটা হয়েছে মাত্র। হ'লেও যে সমাজপতির কাছেই পাঠিয়ে দেব তাও বলা ঠিক হয় না। এক তুমি যদি কলিকাতায় থাকিতে, তোমার কাছে পাঠাতাম। ইতিমধ্যে তুমি সমাজপতিকে লিখে দিয়ো 'কাশীনাথ' যেন প্রকাশ না করে। যদি করে ত আমি লজ্জায় বাঁচব না। তুমি দু'একটা গল্প লিখতে বলেচ এবং পাঠাতেও লিখেচ, যদি লিখিই কাকে পাঠাব? তোমাকে না ফণিকে?... গিরীন[১] তখন ছোটো ছিল, যখন আমি সংসারের বাইরে চ'লে আসি। এত বৎসরের পরে আমাকে বোধ করি তার মনেও নেই। উপীন, আর একটা কথা বলি তোমাকে—এক দিন তার একখানা বই[২] কিনতে চাই—তুমি নিষেধ ক'রে বলো যে শুনলে সে দুঃখ করবে। আজ পর্য্যন্ত আমি সেই কথা মনে করেই কিনি নি। একখানা স্পষ্ট ক'রে চেয়েও ছিলাম—অথচ, সে পাঠালে না। ছেলেবেলায় তার অনেক চেষ্টা সংশোধন ক'রে দিয়েচি—আমি লিখতাম ব'লেই তারাও লিখতে

যমুনা-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল উপেনবাবুর কাছ থেকে শরৎচন্দ্রের এই গল্পটি নিয়ে যমুনায় ছাপিয়েছিলেন।

১। ইনি সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

২। একখানা ছোট গল্পের বই।

সুরু করে। ও বাড়ীর মধ্যে আমিই বোধ করি প্রথমে ওদিকে নজর দিই। তার পরে ওরা চাঁচল[১] থেকে হাতে লিখে মাসিক পত্র বার করত। আজ সে আমাকে একখানা পড়তেও দিলে না! সে হয়ত মনে করে, আমার মত নির্ব্বোধ মূর্খ লোকে তার লেখা বুঝতেও পারে না। যাক্, এজন্য দুঃখ করা নিষ্ফল। সংসারের গতিই বোধ করি এই। আমার শরীর আজকাল ভাল। আমাশা সেরেচে। আজকাল পড়াটা প্রায় বন্ধ করেচি। আমার অসমাপ্ত মহাশ্বেতা (*oil painting*)[২] আবার সমাপ্ত হবার দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্চে। তোমার সেই বড় উপন্যাস লেখার মতলব এখনো আছে ত? যদি না থাকে ত ভারী খারাপ। ওকালতিও করা চাই এটাকেও ছাড়া চাই না।

আমার কলিকাতা যাওয়া—(এদেশ ছেড়ে) বোধ করি হয়ে উঠবে না। শরীরও টিকবে না বুঝচি কিন্তু না টিকাও বরং ভাল, কিন্তু ওখানে যাওয়া ঠিক নয় এই রকমই মনে হচ্চে। আমার ফাউনটেন পেন্ তোমার হাতে অক্ষয় হোক্—ও কলমটা অনেক জিনিসই লিখেচে—খাটিয়ে নিলে আরও লিখবে।

আজ এই পর্য্যন্ত। যদি 'চন্দ্রনাথ' পাঠান সম্ভব হয় এবং সুরেনের যদি অমত না থাকে, তা হ'লে যা সাধ্য সংশোধন ক'রে ফণিকে পাঠাব। চিঠির জবাব দিয়ো।—শরৎ

১। চাঁচল মালদহ জেলার অন্তর্গত। গিরিনবাবুর পিতা অঘোরনাথ গঙ্গোপাধ্যায় চাঁচল রাজ-ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। গিরিনবাবু ও তাঁর দাদা সুরেনবাবু ছেলেবেলায় চাঁচলে থেকে লেখাপড়া করতেন এবং উভয়েই চাঁচল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে এনট্রান্স পাস করেছিলেন।

২। ৭ পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

14. Lower Pozoungdoung Street
Rangoon, 26. 4. 13

শ্রীচরণেষু—তোমার চিঠি পাইয়া যতটা আশ্চর্য্য হইয়াছি তাহার শতগুণ ব্যথিত হইয়াছি। তুমি আমাকে দ্বেষ করিবে, এই কথাটা যদি আমি নিজেও বলি, তাহা হইলেও কি তুমি বিশ্বাস করিবে? আমার কলকাতার স্মৃতি এখনও মনের মধ্যে জাজ্বল্যমান আছে—আমি অনেক কথাই ভুলি বটে, কিন্তু এসব কথা এত শীঘ্র ত নয়ই, বোধ করি কোন দিনই ভুলি না। যাই হোক, এ লইয়া আমি জবাবদিহি করিব না। আমি বেশ জানি একবার যদি তুমি নিভৃতে আমার মুখ এবং আমার কথা মনে করিয়া দেখ, তখনই বুঝিতে পারিবে—আমাকে তুমি বিদ্বেষ করিবে এ কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইবে-না। এ কথা আমি ত উপীন, কল্পনা করিতেও পারি না। তবে, এই বলি তোমার যা ইচ্ছা আমার সম্বন্ধে মনে করিতে পার, আমি তোমাকে আমার তেমনি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুহৃৎ আত্মীয় এবং সম্পর্কে মান্য ব্যক্তি বলিয়া মনে করিব এবং ইহা চিরদিনই করিয়াছি। তোমাদের আপোষের মধ্যে কলহ বিবাদ হইতে পারে, তাই বলিয়া আমি কি তার মধ্যে যাইব? তুমি বিশ্বাস করিয়াছ আমি বলিয়াছি তুমি আমাকে দ্বেষ কর। কি করিয়া আমার সম্বন্ধে তুমি ইহা বিশ্বাস করিলে? আমার অনেক রকম দোষ আছে। তাই বলিয়াই আজ তুমি এই কথা বিশ্বাস করিলে এবং আমাকে তাহা লিখিতে সাহস করিলে। আমি মন্দ বলিয়া কি এত অধম? আমি মনে জ্ঞানে এমন কথা কল্পনা করিতে পারি এই আজ নূতন শুনিলাম। আমাকে তুমি গভীর আঘাত করিয়াছ। যদি বেশী দিন আর না বাঁচি, এটা তোমার মনেও একটা দুঃখের কারণ হইয়া থাকিবে যে

আমাকে তুমি নিরর্থক দুঃখ দিয়াছ। তোমার চিঠি পাইয়া অবধি কেবলি ভাবিয়াছি তুমি আমাকে না জানি কত নীচই না মনে কর। আমি বোধ করি মূর্খ এবং নীচ বলিয়াই তুমি আমার সম্বন্ধে (সম্প্রতি কলিকাতায় এত ঘনিষ্ঠতা এত কথাবার্ত্তা হইয়া যাইবার পরেও) এই কথা বিশ্বাস করিতে পারিয়াছ। না হইলে মনে করিতে না এমন হইতেই পারে না। আমার শপথ রহিল উপীন, আমাকে পত্র পাইবামাত্রই লিখিবে তুমি আর এ কথা বিশ্বাস কর না। আমি সুরেনকে কিছু দিন পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম আমার মনে হয়, আমাকে বিদ্বেষ করিয়াই যেন এসব ছাপা হইতেছে। তার কারণ, আমিও সমাজপতিকে লিখি ওগুলো আর ছাপাইবেন না—তথাপি আমাকে কোন উত্তর না দিয়াই ছাপা হইতে লাগিল। যাই হোক এখন ভিতরকার কথাটাও জানিতে পারিলাম। তুমি যে ওই কথা সমাজপতিকে বলিয়াছিলে তাহা এখন আরো জানিয়া সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিলাম। তুমি যে আমার কত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাও যদি না বুঝিতাম উপীন, এমন করিয়া আজ গল্প লিখিতেও পারিতাম না। আমি মানুষের হৃদয় বুঝি। তুমি যেমন তোমার অন্তর্যামী'র কাছে নির্ভয়ে অসঙ্কোচে বলিতে পার "আমি শরতকে সত্যই ভালবাসি।" আমিও ঠিক তেমনি জানি এবং তেমনি বিশ্বাস করি।

থাক্ এ কথা। শুধু একটা চন্দ্রনাথ লইয়াই এত হাঙ্গামা। অথচ, সেটা যে কি রকম ভাবে ফণী পালের কাগজে বার হবে ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

তোমরা সব দিক্ না বুঝিয়া, সব দিক্ না সামলাইয়া হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপন দিয়া অনেকটা নির্ব্বোধের কায করিয়াছ। এবং তাহারি ফল ভুগিতেছ। দোষ তোমাদেরি—আর বড় কারু নয়। ফণী পালের

জন্য তুমি কতকটা যে false position-এ পড়িয়াছ তাহা প্রতি পদে দেখিতে পাইতেছি।

আমি আরো বিপদে পড়িয়াছি। একে আমার একেবারে ইচ্ছা নয় 'চন্দ্রনাথ' যেমন আছে তেমনি ভাবে ছাপা হয়,[১] অথচ, সেটা খানিকটা ছাপা হয়েও গেছে, আবার বাকিটাও হাতে পাই নাই। সুরেনের বড় ভয়, পাছে ও জিনিসটা হারিয়ে যায়। ওরা আমার লেখাকে হৃদয় দিয়া ভালবাসে—বোধ করি তাই তাদের এত সতর্কতা।

আর একটা কথা উপীন। 'ভারতবর্ষ' কাগজের জন্য প্রমথ চরিত্রহীন বরাবরই চাহিতেছিল। শেষে এমনি পীড়াপীড়ি করিতেছে যে কি আর বলিব। সে আমার বহুদিনের পুরাতন বন্ধু এবং বন্ধু বলিলে সত্য যাহা বুঝায় তাহাই। সে জাঁক করিয়া সকলের কাছে বলিয়াছে চরিত্রহীন দিবই এবং এই আশায় জ—প্রভৃতির লেখা চার পাঁচটা উপন্যাস অহঙ্কার করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে। সে-ই হইতেছে 'ভারতবর্ষে'র মোড়ল। এখন, দ্বিজুবাবু প্রভৃতি (হরিদাস, গুরুদাসের পুত্র) তাঁহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। এদিকে 'যমুনা'তেও বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে ঐ কাগজে চরিত্রহীন ছাপা হবে। সমাজপতিও registry চিঠি ক্রমাগত লিখচেন, কোন্ দিকে কি করি একেবারে ভেবে পাইতেছি না। এইমাত্র আবার প্রমথনাথের দীর্ঘ কান্নাকাটি চিঠি পাইলাম—সে বলে, এটা সে না পেলে আর তাহার মুখ দেখাইবার যো থাকিবে না। এমন কি পুরাতন বন্ধু বান্ধব club প্রভৃতি ছাড়িতে হইবে। কি করি? একটু ভাবিয়া জবাব দিবে।

১। ১৩২০ সালের বৈশাখ-আশ্বিন সংখ্যা যমুনায় চন্দ্রনাথ প্রকাশিত হয়েছিল।

তোমার জবাব চাই, কেন না, একা তুমিই এর সুরু থেকে history জান।[১]

বড় ভাল নই, ৭।৮ দিন প্রায় জ্বর জ্বর কচ্চে—অথচ স্পষ্ট জ্বরও হচ্চে না। যদি আবশ্যক বিবেচনা কর এই পত্র সুরেনকে দেখাইয়ো। তোমরা আপোষে যত পার ঝগড়া করিয়া মর, কিন্তু আমি যে তোমাদের এক সময়ে শিক্ষক ছিলাম—বয়সের সম্মানটাও অন্ততঃ দিয়ো।

সেবক শরৎ

14, Lower Pozoungdoung Street
Rangoon 10. 5. 1913

প্রিয় উপেন—আজ তোমারও চিঠি পাইলাম, প্রমথরও চিঠি পাইলাম। তুমি যে আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছ, ইহাতে যে কত তৃপ্তি অনুভব করিয়াছি তাহা লিখিয়া জানাইতে যাওয়া পাগলামি। তুমি যে আর মনে ক্লেশ পাইতেছ না কিম্বা দুঃখ করিতেছ না, ইহা ইহাতেই বুঝিলাম যে অতি সহজভাবে আমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছি। আমি নিজেকে মূর্খ বলিয়াছিলাম—সেটা কি মিছে কথা? তোমাদের কাছে আমি কি পণ্ডিত বলিয়া নিজেকে মনে করিব, আমি কি এত বড় আহম্মক? না হয়, বানাইয়া গল্প লিখিতে পারি—এতে পাণ্ডিত্য কোথায়? যাক্। B. A. M. A. B. L., এ টাইটেল-গুলোকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি তাহাই জানাইলাম। প্রমথ লিখিতেছে, গল্পগুলো তাদের Evening Clubএ অত্যন্ত সম্মান পাইয়াছে। D. L. Roy এত প্রশংসা করিয়াছেন যে তাহা বিশ্বাস হইতে চায় না।

১। ১৩ ও ১৪ পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

দিদির নারীর মূল্য নাকি "অমূল্য" হইয়াছে। দ্বিজুবাবু বলেন, এ রকম গল্প রবিবাবুরও বোধ করি নাই। [এমন] প্রবন্ধ বাঙলা ভাষায় আর কখন পড়েন নাই। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন। ফণীর কাগজখানা ছোট বটে, কিন্তু তার মত ভাল কাগজ বোধ করি আজকাল আর একটাও বাহির হয় না। ঈশ্বর করুন, ফণী এই ভাবে পরিশ্রম করিয়া তাহার কাগজ সম্পাদন করুক—দুদিন পরে হোক দশ দিন পরে হোক শ্রীবৃদ্ধি অনিবার্য্য। তবে চেষ্টা করা চাই—পরিশ্রম করা চাই। আর আমার কথা! আমি তাকে ছোট ভায়ের মতই দেখি। তার কাগজ থেকে যদি কিছু বাঁচে, তবে অন্য কাগজে। তবে, আজকাল এত বেশী অনুরোধ হইতেছে যে, আমার দশটা হাত থাকিলেও ত পারিয়া উঠিতাম বলিয়া মনে হয় না। 'চরিত্রহীন' তার কাগজে বার হবে না এ কথা কে বলিয়াছে? আমি প্রমথকে পড়িতে দিয়াছি। তবে, সে যদি ধরিয়া বসিত যে সে-ই প্রকাশ করিবে তাহা হইলে আমাকে হয়ত মত দিতে হইত, কিন্তু, তাহারা সে দাবী করে না। বোধ করি manuscript পড়িয়া কিছু ভয় পাইয়াছে। তাহারা সাবিত্রীকে "মেসের ঝি" বলিয়াই দেখিয়াছে। যদি চোখ থাকিত, এবং কি গল্প কি চরিত্র কোথায় কি ভাবে শেষ হয়, কোন্ কয়লার খনি থে'ক কি অমূল্য হীরা মাণিক ওঠে তা যদি বুঝিত, তাহা হইলে অত সহজে ওখানা ছাড়িতে চাহিত না। শেষে হয়ত এক দিন আপশোষ করিবে কি রত্নই হাতে পাইয়াও ত্যাগ করিয়াছে! আমার কাছে সে উপসংহার কি হইবে জানিতে চাহিয়াছে। আমার উপরে যাহার ভরসা নাই—অবশ্য সে ও-রকম প্রথম নভেল প্রথম কাগজে বাহির করিতে দ্বিধা করিবে আশ্চর্য্যের কথা নয়, কিন্তু, নিজেই তাহারা বলিতেছে চরিত্রহীনের শেষ দিকটা। (অর্থাৎ তোমরা যত দূর পড়িয়াছ

তার পরে আর ততটা) রবি বাবুর চেয়েও ভাল হইয়াছে (style এবং চরিত্র-বিশ্লেষণে) তবুও তাদের ভয় পাছে শেষটা বিগড়াইয়া ফেলি। তারা এটা ভাবে নাই যে-লোক ইচ্ছা করিয়া একটা "মেসের ঝি"কে আরম্ভেই টানিয়া আনিয়া লোকের সুমুখে হাজির করিতে সাহস করে, সে তার ক্ষমতা জানিয়াই করে। তাও যদি না জানিব তবে মিথ্যাই এতটা বয়স তোমাদের গুরুগিরি করিলাম। আর এক কথা—প্রমথ বলিতেছে, ভারতবর্ষকে আমি যেন নিজের কাগজ বলিয়া মনে করি—এবং সেইরূপ করি। আমি প্রমথকে কথা দিয়াছি আমার সাধ্যমত করিব, কিন্তু সাধ্য কতটুকু তাহা বলি নাই। আরো এক কথা—তাহারা দাম দিয়া লেখা ক্রয় করিবে—তখন তাহাদের অভাব হইবে না, কিন্তু দাম দিলেই যে সকলের লেখাই পাওয়া যায় না, এইটা তাহারা আমার সম্বন্ধে এইবার বোধ করি বুঝিয়াছে। যাই হৌক—চরিত্রহীন আমার হাতে আসিয়া পড়িলেই ফণীকে পাঠাইয়া দিব। আমার হাতে আর রাখিব না। তবে প্রমথ ফণীর হাতে সেটা দিবে না, কেন না, ফণীর উপর তাহারা কিছু রাগিয়া গিয়াছে। তা হয়। কারণ, মাসিক পত্রের পরিচালকেরা পরস্পরকে দেখিতে পারে না। আর কিছু নয়। তবে, প্রমথ লোকটি শুধু যে আমার বাল্যবন্ধু তা নয়, আমার পরম বন্ধু এবং অতি সৎ লোক। সত্যই ভদ্রলোক। তাকে আমি বড় ভালবাসি। সেই জন্যই ভয় করিয়াছিলাম তাহার জোর-জবরদস্তিকে আমি পারিয়া উঠিব না। এ বিষয়ে সঠিক সম্বাদ পরে দিব।

তুমি লিখিতেছ আমরা যমুনাকে বড় করিব। আমরাটা কে? তুমি যে যমুনার পরম বন্ধু, এবং নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব করিতে গিয়াই লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছ, তাহা আমি বিশেষ জানি বলিয়াই তোমার সম্বন্ধে

যত কিছু শুনিয়াছি একটাতেও বিন্দুমাত্রও কান দিই নাই। হইতে পারে কিছু diplomatic চাল চলিয়াছ—তা বেশ করিয়াছ। যাকে ভালবাসিবে, তাকে এমনি করিয়াই সাহায্য করিবে। ফণীকে তুমিই ভালবাস, কিন্তু তা ছাড়া "আমরা" কথাটার অর্থ ঠিক বুঝিলাম না। এবারে বুঝাইয়া বলিবে। 'পথ নির্দ্দেশ' এবং 'রামের সুমতি' সম্বন্ধে আমার অভিমত 'পথ নির্দ্দেশ'টাই ভাল। তবে এ গল্পটা একটু শক্ত। সবাই ভাল বুঝিবে না। আমিও অনেকের অনেক রকম মত শুনিয়াছি। যাহারা নিজে গল্প লেখে তাহারা ঠিক জানে, রামের সুমতি যদিও বা লেখা যায়, পথ নির্দ্দেশ লিখিতে কিছু বেশী বেগ পাইতে হইবে। হয়ত সবাই পারিবে না। ও-রকম গোলযোগ circumstanceএর ভেতরে খেই হারাইয়া একটা হ-জ-ব-র-ল করিয়া তুলিবে। হয়ত ধৈর্য্যের অভাবে শেষ হবার পূর্ব্বেই শেষ করিয়া ফেলিবে। আর নিজের সমালোচনা নিজে কি করিয়াই বা করিব? তবে কলিকাতা এবং এদেশের লোকের মত দুটো গল্পই superlative degreeতে excellent! দ্বিজুবাবু বলেন গল্পের আদর্শ! ফণীর কাগজে প্রতি মাসেই যাতে এই রকম একটা কিছু বার হয়, তার চেষ্টা সবিশেষ করা উচিত। তবে, আমি আর বড় ছোট গল্প লিখিতে ইচ্ছা করি না। একটু বড় হয়েই যায়। তোমাদের মত বেশ ছোট ক'রে যেন লিখতেই পারি না। তা ছাড়া আর একটা কথা এইখানে আমার বলবার আছে। আমি ত চন্দ্রনাথকে একেবারে নূতন ছাঁচে ঢালবার চেষ্টায় আছি, অবশ্য গল্প (plot) ঠিক তাই থাকবে। তারপরে হয় চরিত্রহীন, না হয় ওর চেয়েও একটা ভাল কিছু যমুনায় বার করা চাই। আর প্রবন্ধ। এটাও খুব প্রয়োজন। ভাল প্রবন্ধের বিশেষ দরকার। তা না হ'লে শুধু

গল্পতেই কাগজ যথার্থ "বড়" ব'লে লোকে স্বীকার করে না। আমাকে যদি তোমরা ছোট গল্প লিখবার পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি দিতে পার ত আমি প্রবন্ধও লিখতে পারি। বোধ করি গল্পের মত সরল এবং সুপাঠ্য ক'রেই। এ বিষয়ে তোমার অভিমত জানাবে। যদি গল্পলেখার কাযটা তোমরা চালিয়ে নিতে পার, আমি শুধু novel ও প্রবন্ধ নিয়েই থাকি। তা না হইলে দেখচি রাত্রেও খাটিতে হয়। আমার শরীর ভাল নয়, রাত্রে লিখিতে পারি না এবং পড়াশুনারও ক্ষতি হয়। সমালোচনা, প্রবন্ধ, নভেল, গল্প, সব লিখলে আবার লোকে হয়ত সব্যসাচী ব'লে ঠাট্টা করবে। আবার অন্য কাগজেও কিছু কিছু দিতে হবে।

'দেবদাস' ও 'পাষাণ' পাঠিয়ে দিয়ো আমি re-write করবার চেষ্টা দেখব। আচ্ছা, ফণী ৩০০০ কপি ছাপিয়ে টাকা নষ্ট করচে কেন? তার গ্রাহক কি কিছু বেড়েচে? আমার বোধ হয় না। তবে খুব ভরসা আছে আসচে বছরে ওর কাগজ একটি শ্রেষ্ঠ কাগজের মধ্যেই দাঁড়াবে।

ফণীর ক্রমাগত আশঙ্কা হয় আমি বুঝি তাকে ছেড়ে আর কোথাও লিখতে সুরু করব। কিন্তু এ আশঙ্কার হেতু কি? সে আমার ছোট ভায়ের মত—এ কথাটা কেন যে সে বিশ্বাস করতে পারে না তা সে-ই জানে। আমি জানি না।

তোমার ক্রয়-বিক্রয় গল্পটা সত্যই ভাল। কিন্তু, আরো একটু বড় করা উচিত ছিল। এবং শেষটা সত্য সত্যই শেষ করা উচিত ছিল। অমন গল্পটি কেন যে তুমি অত তাড়াতাড়ি ক'রে শেষ করলে জানি না। একটা কথা মনে রেখো, গল্প অন্ততঃ ১২।১৩ পাতা হওয়া চাই এবং conclusionটা বেশ স্পষ্ট করা চাই।

সুরেন আমাকে চিঠির জবাব দিলে না কেন? তাকে আমার

হাতের কলম দিয়েছি, কেন না, এর চেয়ে ভাল জিনিস আর আমার দিবার নাই। সে তার কি সদ্ব্যবহার কচ্চে জিজ্ঞাসা ক'রে লিখো। আমার কলমের যেন অসম্মান না হয়। আর চারটে কলম দেওয়ার বাকী আছে। যোগেশ মজুমদার কোথায়? পুঁটু, বুড়ি এবং সৌরীন[১] এদের জন্যও আমার কলম ঠিক ক'রে রেখেছি—এক দিন পাঠিয়ে দেব।

গিরীন কি বাঁকিপুরে ফিরেচে? তাকে জবাব দিতে পারি নি সে কোথায় আছে জানিতে পারি নাই বলিয়া। ফটো ত আমার নাই—কোন দিন ও-কথা মনেও হয় নি। আচ্ছা।

আজ এই পর্য্যন্ত।

হাঁ আর এক কথা। সুধাকৃষ্ণ বাগচি একটা written statement পাঠিয়েছে। সে বলে সমস্ত কথা মিথ্যা। ভালই। আমি জানি কোন্‌টা মিথ্যা। যাই হোক লোকটা যখন deny কচ্চে তখন ঐখানেই শেষ করা উচিত। তা ছাড়া বুড়ো মানুষ!

* * * *

14. Lower Pozoungdoung Street
Rangoon. ২২শে আগষ্ট, '১৩,

প্রিয় উপীন—অনেক দিন পরে তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়াছি। তুমিও অনেকদিন আমাকে কোন সম্বাদই তোমার দাও নাই। নাই দাও, সেজন্য দুঃখ করিতেছি না বা অনুযোগ করিতেছি না। ২।৩ মাস পরে সম্ভবতঃ আবার আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হইবে, তখন সে সব কথা হইতে পারিবে।

১। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। ইনি শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু।

এ মাসের যমুনা পাইয়া তোমার 'লক্ষ্মীলাভ' পড়িলাম। এ সম্বন্ধে আমার মত তুমি বিশ্বাস করিবে কি না, তোমার কথাতেই প্রকাশ করিতেছি "বাপের মুখে ছেলের সুখ্যাতি শুনে কায নাই—[১]।" আমার যথার্থ মত, এমন মধুর গল্প অনেক দিন পড়ি নাই। হয়ত তোমার best এটি। অনাবশ্যক আড়ম্বর নেই, লোকের দোষ দেখানো, সংসারের দুঃখের দিক্‌টা তুলিয়া ধরা ইত্যাদি কিছু নেই—শুধু একটি সুন্দর ফুলের মত নির্ম্মল এবং পবিত্র! মধুর, অতি মধুর! এই আমি চাই। পড়িয়া যদি না আনন্দের আতিশয্যে চোখে জল আসে তবে আর সে গল্প কি? বড় ভালো হয়েচে উপীন, আমি আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছি, যেন মাঝে মাঝে এমনি গল্প পড়তে পাই। অবশ্য আমাকে খুশী করা শক্ত, কিন্তু এমন পেলে আমি আর কিছু চাই না। আমার এত বড় সুখ্যাতিতে হয়ত তুমি একটু সঙ্কুচিত হবে এবং সবাই হয়ত আমার সঙ্গে একমতও হবে না, কিন্তু আমার চেয়ে ভাল সমজদার এখনকার কালে এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ নেই। মনে কোরো না গর্ব্ব করচি—কিন্তু, আমার আত্ম-নির্ভরই বল, আর prideই বল, এই আমার নিজের ধারণা। এমন গল্প অনেকদিন পড়িনি। শুনেচি, তোমার আর একটি বড় এবং ভালো গল্প ভারতবর্ষে বেরিয়েচে। ভারতবর্ষ এখনো এসে পৌঁছে নি, বলিতে পারি না সেটি কেমন, কিন্তু যদি ভাবে মাধুর্য্যে এমনটি হয়ে থাকে তা হ'লে সেও নিশ্চয় খুব ভাল গল্পই হয়েচে।

তা ছাড়া তোমাদের লেখার styleটি বড় সুন্দর। আমি যদি এম্‌নি সুন্দর ভাষা পেতাম, ভাষার ওপর এম্‌নি অধিকার থাকত তা

১। লক্ষ্মীলাভ গল্পটিরই একটি ছত্র।

হ'লে বোধ করি আমার গল্প আরো ভাল হ'ত। অবশ্য আমি নিজের সহিত তোমার তুলনা করচি না, তাতে তুমিও লজ্জা বোধ করবে কিন্তু খুসী হ'লে আমি আর রেখে চেপে বলতে পারি নে।

কেমন আছ আজকাল? আমি বড় ভাল নই—এই বর্ষাকালটা আমার বড় দুঃসময়। ১০।১২ দিন জ্বর হয়েছিল, দুদিন ভাল আছি। আমার ভালবাসা জেনো। ইতি শরৎ

[ফণীন্দ্রনাথ পাল[১]কে লেখা]

D. A. G'.s Office, Rangoon.
[জানুয়ারী ১৯১৩]

ফণীবাবু—আপনাদের সম্বাদ কি? সদাসর্ব্বদা চিঠি দিতে ভুলবেন না। আমার দ্বারা যা সম্ভব আমি করব। উপীন কোথায়? ভবানীপুরে কবে আসবে? আমাকে 'চন্দ্রনাথ' কবে পাঠাবে? আমাকে আপনি যা করতে হবে বলবেন। না বললে আমার দ্বারা বিশেষ কোন কাজ হবে না। এসে পর্য্যন্ত আমি আমাশা ও জ্বরে ভুগচি, না হ'লে এত দিনে হয়ত কিছু লিখতাম। যা হোক একটা চিঠি দেবেন। সৌরীনকে আমার কথা মনে করিয়ে দিবেন।—শরৎ

রেঙ্গুন, [মাঘ] ১৯১৩

প্রিয় ফণীন্দ্রবাবু—'রামের সুমতি' গল্পটার শেষ পাঠালাম, এ সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। গল্পটা কিছু বড় হয়ে পড়েছে, বোধ করি একবারে প্রকাশ হ'তে পারবে না, কিন্তু হ'লে ভাল হয়।[২] একটু ছোট টাইপে ছাপালে এবং দুই একখানা পাতা বেশী দিলে হ'তে পারে। ছোট গল্প খণ্ডশঃ প্রকাশ করায় তেমন সুবিধা হয় না, বিশেষ আপনার কাগজের এখন একটু পসার হওয়া উচিত। যদিও আমার ছোট গল্প লেখার অভ্যাস আজকাল কিছু কমেছে, তবে আশা করি দু-এক মাসের মধ্যেই অভ্যাস ঠিক হয়ে যাবে। আমি প্রতি মাসেই

১। যমুনা-সম্পাদক।

২। এই গল্পটি "যমুনা"র ১৩১৯ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

গল্প ছোট ক'রে (১০।১২ পাতার মধ্যে) এবং প্রবন্ধ পাঠাব। গল্প নিশ্চয়ই, কেন না আজকাল ঐটার আদর কিছু অধিক।...

আগামী বারে গল্প যাতে ছোট হয় সেদিকে চোখ রাখব। আর এক কথা, আপনি সমাজপতির সহিত সদ্ভাব রাখবেন। তাঁর কাগজে যদি আপনার কাগজের একটু আধটু আলোচনা থাকতে পায় সুবিধা হয়। এবারের 'সাহিত্যে' আমার নাম দিয়ে কি একটা ছাইপাঁশ ছাপিয়েছে। ও কি আমার লেখা? আমার ত একটুও মনে পড়ে না। তা ছাড়া যদি তাই হয়, তা হ'লেই বা ছাপান কেন? মানুষ ছেলেবেলা অনেক লেখে, সেগুলো কি প্রকাশ করতে আছে? আপনি 'বোঝা' ছাপিয়ে আমাকে যেমন লজ্জিত করেছেন, সমাজপতিও তেমনি ঐটে ছাপিয়ে আমাকে লজ্জা দিয়েছেন। যদি উপীনকে চিঠি লেখেন এই অনুরোধটা জানাবেন যেন আমার অমতে আর কিছুই না প্রকাশ হয়। আবশ্যক হ'লে গল্প আমি ঢের লিখতে পারি—আপনার কাগজ ত এক ফোঁটা, ও-রকম ৩।৪ গুণ কাগজও একলা ভ'রে দিতে পারি। তা ছাড়া আমার আর একটা সুবিধে আছে। গল্প ছাড়া সমস্ত রকম subject নিয়েই প্রবন্ধ লিখতে পারি, তা যদি আপনার আবশ্যক থাকে লিখবেন। যে কোন subject—তাতেই আমি স্বীকার আছি। 'রামের সুমতি' ক'বারে ছাপাবেন, কিম্বা একেবারে ছাপাবেন, আমাকে লিখে জানাবেন। তা হ'লে চৈত্রের জন্য আর লিখবার আবশ্যক হবে না।

চরিত্রহীন প্রায় সমাধার দিকে পৌঁছেচে। তবে সকালবেলা ছাড়া রাত্রে আমি লিখতে পারি নে। রাত্রে আমি শুয়ে শুয়ে পড়ি।...

আর একটা কথা—আপনি 'যমুনা' ছাপাতে দেবার আগে গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি আমাকে একবার যদি দেখাতে পারেন, বড় ভাল হয়।

এই ধরুন চৈত্রের জন্য যে-সব ঠিক করেছেন সেইগুলো এখন অর্থাৎ মাসখানেক আগে আমাকে পাঠালে—একটু নির্ব্বাচন ক'রে দিতেও পারি। পৌষের 'যমুনা' বড় ভাল হয় নি। শেষের গল্পটা সুবিধের নয়। অবশ্য এতে খরচ আপনার পড়বে (ডাক-টিকিট) কিন্তু কাগজ ভাল হয়ে দাঁড়াবে। আমার এদিক থেকে ফেরত পাঠাবার খরচ আমি দেব, কিন্তু প্রবন্ধগুলি ডাকে পাঠালে আমি একটু দেখে দিই এমনি ইচ্ছে করে। আগেই বলেছি আমি শুধু গল্পই লিখি নে। সব রকমই পারি, শুধু পদ্য পারি নে। আচ্ছা আপনি সৌরীনবাবুকে দিয়ে, কিম্বা উপীন, সুরেন, গিরীনকে দিয়ে 'নিরুপমা দেবী'র রচনা—কবিতা সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেন না কেন? তাঁর বড় ভাই বিভূতিকে বোধ করি আপনিও চেনেন। তাঁকে লিখলে নিরুপমার রচনা (রচনা না হয় কবিতা) বোধ করি পেতেও পারেন। অনেকের চেয়ে তাঁর কবিতা এবং রচনা ভাল।

আমাকে দিয়ে যতটুকু উপকার হ'তে পারে আমি তা নিশ্চয় করব। কথা দিয়েছি, সেই মত কাজও করব। সাহিত্যের মধ্যে যতটা নীচতাই প্রবেশ করুক না, এদিকে এখনও এসে পৌছায় নি। তা ছাড়া এ আমার পেশা নয়; আমি পেশাদার লিখিয়ে নই এবং কোন দিন হ'তেও চাই না।

আমি একটু কাছে থাকিতে পারিলে আপনার সুবিধা হইতে পারিত বটে, কিন্তু এদেশ আমি বোধ করি কোন মতেই ছাড়তে পারব না। আমি বেশ আছি, অনর্থক মুস্কিলের মধ্যে যেতে চাই না এবং যাবও না। আমার কথা এই পর্য্যন্ত—

আগামী বৎসর থেকে আপনি কাগজখানা যদি একটু বড় করতে পারেন, কিছু মূল্য বৃদ্ধি ক'রে, সে চেষ্টা করবেন। প্রতি সংখ্যায়

পড়বার উপযুক্ত জিনিস থাকবে; এ কথা প্রকাশ ক'রে জানাবেন। সেই জন্যেই বলি গল্পগুলো এক সংখ্যাতেই প্রকাশ করা ভাল—একটু ক্ষতি স্বীকার ক'রেও, তাতে অনেকটা advertisementএর মত হবে।

উপেন আমাকে অনেক বার লিখলে সে 'চন্দ্রনাথ' পাঠাচ্ছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত পেলাম না। বোধ করি সে হাতে পাচ্ছে না তাই। তবে আপনি যদি 'চন্দ্রনাথটা' ক্রমশঃ প্রকাশ করতে চান, আমি নূতন ক'রে লিখে দেব। ভবানীপুরে সৌরীনের মুখে জিনিসটা যে কি শুনে নিয়েছি। আমার কতক মনেও পড়েছে—সুতরাং নূতন ক'রে লিখে দেওয়া বোধ করি শক্ত হবে না। আপনি যদি এই রকম নূতন লেখা চান আমাকে জানাবেন।...আঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

রেঙ্গুন, ১২।২।১৩

প্রিয় ফণীবাবু—এইমাত্র আপনার পত্র পাইলাম। ১ম কথা *'বঙ্গবাসী'র ক্রোড়পত্র প্রভৃতি ক'রে অর্থশূন্য বাজে খরচ ভাল হয় নাই। আপনি একেবারে ব্যস্ত হবেন না। আপনার কাগজের মধ্যে যদি ভাল জিনিস থাকে দু-দিনে হোক দশ দিনে হোক সে-কথা আপনি প্রচার* হয়ে যাবে, কেউ আট্‌কে রাখতে পারবে না। আপনার কোন ভয় নেই। ক্যানভাস ক'রে গ্রাহক যোগাড় করা ক্রোড়পত্র দিয়ে টাকা নষ্ট করার চেয়ে ঢের ভাল।

দ্বিতীয় কথা—'রামের সুমতি' ছোট টাইপে ছাপিয়ে একেবারে বার করতে পারলেই বড় ভাল হ'ত—কেন না, এ রকম ছোট ধরণের গল্প "ক্রমশঃ" বড় সুবিধে হয় না। যা হোক যখন হয় নি, তার জন্যে আলোচনা বৃথা। আমি দু-এক দিনের মধ্যে আর একটা গল্প পাঠাব (আপনার জবাব পেলে পাঠাব), এ গল্পটা আমার বিবেচনায় রামের

স্থমতি'র চেয়ে ভাল, তবে দুঃখের বিষয় এই যে প্রায় ঐ রকম বড় হয়ে পড়েচে। এত চেষ্টা ক'রেও ছোট করা গেল না। ভবিষ্যতে চেষ্টা ক'রে দেখি কি হয়।

৩য় কথা—'চন্দ্রনাথ' নিয়ে কি একটা বোধ করি হাঙ্গামা আছে। তাই বলি ওতে আর কাজ নেই। 'চরিত্রহীন' বার করা যাবে। অবশ্য সেজন্য কাগজ কিছু বড় করা চাই—কিন্তু মূল্য কত এবং কবে থেকে বাড়াবেন এটা লিখবেন। দাম না বাড়ালে কিছুতেই কাগজ বড় ক'রে গচ্ছা দেওয়া উচিত নয়।

৪র্থ কথা—সমাজপতির সঙ্গে অসদ্ভাব করবেন না এইটাই বলেচি, তাঁকে খোসামোদ করতে বলি নি। ফণীবাবু, আপনার দোকানের মাল যদি খাঁটি হয়, এক দিন পরে হোক পাঁচ দিন পরে হোক খদ্দের জুটবে। মাল ভাল না হলে হাজার চেষ্টাতে দোকান চলবে না— দু-চার দিনে হোক মাসে হোক ফেল হ'তে হবে।

আমার ছেলেবেলার ছাইপাঁশ ছাপিয়ে আমাকে যে কত লজ্জা দেওয়া হচ্চে এবং আমার প্রতি কত অন্যায় করা হচ্চে তা আমি লিখে জানাতে পারি নে। সমাজপতি সমজদার লোক হয়ে, কেমন ক'রে যে ঐ ছাই ছাপালেন আশ্চর্য্য!

৫ম কথা—সৌরীনবাবুর সঙ্গে আপনার আজকাল মিল কেমন? তিনি আমার দিদির লেখা সমালোচনাটা দেখেছেন কি? বোধ হয় খুব রাগ করেচেন, না? কিন্তু আমার দোষ কি? যিনি লিখেছেন তিনিই দায়ী। তা ছাড়া এ সব লেখা ছোট টাইপে ছেপেছেন ত?

৬ষ্ঠ—আমার নূতন গল্পটা (যেটা দু-এক দিনের মধ্যেই পাঠাব) কোন্ মাসে ছাপাবেন? চৈত্রে 'রামের স্থমতি' শেষ হবে, স্থতরাং সে মাসে আর কাজ নেই, বৈশাখে দেবেন। কিন্তু যাতেই দিন,

ছোট টাইপে ছাপালে কম জায়গা লাগবে, অথচ গ্রাহক অনেকটা জিনিস পড়তে পারে।

৭ম—বৈশাখ থেকে কাগজখানি যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। ছবির পেছুনে মেলাই কতকগুলো টাকা নষ্ট না ক'রে, ঐ টাকা যাতে অন্য কোন রকমে কাগজের পিছনে লাগান যায় তাই ভাল। অবশ্য আমি জানি না, গ্রাহক ছবি চায় কি না, যদি ঐ ফ্যাশান হয় তা হ'লে নিশ্চয় দিতে হবে। আপনি আমাকে প্রবন্ধ গল্প প্রভৃতি selection-এর মধ্যে একটু স্থান দিলে এই ভাল হয় যে, আমিও দেখে শুনে দিতে পারি। খাতিরে প'ড়ে ছাইমাটি দেওয়া কিম্বা 'নাম' দেখে ছাইমাটি দেওয়া দু-ই মন্দ।

৮ম—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী যদি তাঁর লেখা দয়া ক'রে আপনাকে দেন, সে ত নিশ্চয়ই ভাল, তাঁর কবিতা লেখবার ক্ষমতাও খুব বেশী। শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর লেখা বোধ করি পাওয়া দুঃসাধ্য। তিনি 'ভারতী'তে লেখেন, আপনার এতে লিখবেন কি না বলা যায় না। লিখলেও হয়ত অশ্রদ্ধা ক'রে যা-তা লিখবেন। এঁরা সব বড় লেখিকা, এঁদের হয়ত 'যমুনা'র মত ছোট কাগজে লিখতে প্রবৃত্তি হবে না। তবে একটু চেষ্টা ক'রে দেখবেন। পাওয়া যায় ভালই, না যায় সেও ভাল।

আমার তিনটে নাম।

সমালোচনা প্রবন্ধ প্রভৃতি—অনিলা দেবী।

ছোট গল্প—শরৎ চন্দ্র চট্টো।

বড় গল্প—অনুপমা।

সমস্তই এক নামে হ'লে লোকে মনে করবে, এই লোকটি ছাড়া আর বুঝি এদের কেউ নেই।

আমার এখানে এক জন বন্ধু আছেন, তাঁর নাম প্রফুল্ল লাহিড়ী

B. A., তিনি অতি সুন্দর দার্শনিক। প্রবন্ধ লেখেন খুব ভাল, অবশ্য নাম নাই, কেন না কোন মাসিকপত্রের লেখক নন। আমি এঁকে অনুরোধ করেছি—আমাদের 'যমুনা'র জন্য লিখতে। লেখা পেলে আমি পাঠিয়ে দেব।

অসুবিধা এই, 'যমুনা' আকারে ছোট। বেশী প্রয়াস এতে চলে না। দামও কম। হঠাৎ দাম বাড়াবার চেষ্টা কি রকম সফল হবে বলা যায় না। যদি একান্তই সম্ভব না হয়, কিছু দিন পরে, অর্থাৎ আশ্বিন মাস থেকে (গ্রাহকের মত নিয়ে, এবং প্রমাণ ক'রে যে তাঁহারা বেশী দাম দিলেও ঠকবেন না) মূল্য এবং আকারে আরও বড় করলে কি হয় না? আপনি নিজে একটু ঢিলা লোক, কিন্তু সে রকম হ'লে চলবে না। রীতিমত কাজ করা চাই। আপনি যখন আর অন্য কিছু করবেন না মতলব করেচেন, তখন এই জিনিসটাকেই একটু বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখবার চেষ্টা করবেন। এবং যাকে "বিষয়বুদ্ধি" বলে, তাও অবহেলা করবেন না। 'প্রবাসী' প্রভৃতি এক সময়ে কত ছোট কাগজ এখন কত বড় হয়ে গেছে। আপনি আমাকে পুরুষ লেখকদের সমালোচনা লিখতে বলেছেন, কিন্তু আমার বাঙ্গলা বই নাই। মাসিকপত্রও একটাও লই না—আমি কোথায় কি পাব যে সমালোচনা লিখব। লিখলে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিশ্চয় এবং একটা বাদানুবাদ হবার উপক্রম হয়। আমি এটা জানি যদি তাই হয়, তা হ'লেও চিন্তার কথা কিছু নাই—আমার সমালোচনায় ভুল থাকে আর তা যদি প্রমাণ করতে পারেন (পারা শক্ত যদিও) সেও ভাল কথা।

এইখানে আমার আর একটা বলবার জিনিস আছে। আমার পড়াশুনার কিছু ক্ষতি হচ্চে। সমস্ত সকালটা কোন দিন বা আপনার জন্য কোন দিন বা চরিত্রহীনের জন্য নষ্ট হচ্চে। রাত্রিটা অবশ্য

পড়তে পাই, কিন্তু নোট করা প্রভৃতি হয়ে উঠচে না। আর একটা কথা আমি কয়েক দিন ধ'রে ভাবছি—এক একবার ইচ্ছে করে, H. Spencer-এর সমস্ত Synthetic Philo : একটা বাঙ্গালা সমালোচনা—সমালোচনা ঠিক নয়, আলোচনা—এবং ইউরোপের অন্যান্য Philosopher যাঁরা Spencer-এর শত্রু মিত্র তাঁহাদের লেখার উপর একটা বড় রকমের ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখি। আমাদের দেশের পত্রিকায় কেবল নিজেদের সাংখ্য আর বেদান্ত ছাড়া, দ্বৈত আর অদ্বৈত ছাড়া আর কোন রকমের আলোচনাই থাকে না। তাই মাঝে মাঝে এই ইচ্ছাটা হয়—কি করি বলুন ত? যদি আপনার কাগজে স্থান না হয় (হওয়া সম্ভব নয়), অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশ করে এ-রকম জোগাড় ক'রে দিতে পারেন কি?

আপনি আমাকে সর্ব্বদা চিঠি লিখবেন। না লিখলে আমারও যেন আর তেমন চাড় থাকে না। এটাও একটা কাজ ব'লে মনে করবেন। লেখা Registry ক'রেই পাঠাব। খরচ আপনি দেবেন কেন? আমার অত দৈন্য দশা নয় যে এর জন্যে খরচ নিতে হবে। এ সব কথা আর লিখবেন না?

আশীর্ব্বাদ করি আপনার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হোক—সেই আমার পারিতোষিক হবে।

চন্দ্রনাথ আর চাইবেন না। যদি দরকার হয় আমি আবার লিখে দেব। সে লেখা ভাল বই মন্দ হবে না।

আমার তিন রকমের নাম গ্রহণ করা সম্বন্ধে আপনার মত কি? বোধ করি এতে সুবিধে হবে। এক নামে বেশী লেখা ভাল নয়, না?

উপেন কি বলে? সে ত চিঠিপত্র লেখবার লোক নয়। সে

থাকলে ঢের সুবিধে ছিল—না থাকায় বোধ করি বেশ অসুবিধে হচ্চে। সে লোকটার আপনার প্রতি ভারী স্নেহ ছিল—যদি তার নিকট থেকে কাজ আদায় করতে পারেন সে চেষ্টা ছাড়বেন না।

যাই হোক আর যেমনই হোক ব্যস্তও হবেন না, চিন্তিতও হবেন না। আমি আপনাকে ছেড়ে আর কোথাও যে যাব কিম্বা কোন লোভে যাবার চেষ্টা করব, এমন কথা কোন দিন মনেও করবেন না! আমার সমস্তটাই দোষে ভরা নয়।

আপনি পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করবার জন্যে চিঠিতে লিখতেন—অন্য কাগজওয়ালারা আমাকে অনুরোধ করবে। করলেই বা, charity begins at home, সত্যি না? একটু শীঘ্র জবাব দেবেন। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবেন। ইতি শরৎচন্দ্র চট্টো।

[চৈত্র ১৩১৯]

প্রিয় ফণীবাবু,—আপনার প্রবন্ধ ফেরত পাঠাইয়াছি। প্রবন্ধ দুটি মন্দ নয়, দেওয়া চলে, 'চক্ষু' সম্বন্ধে প্রবন্ধটা বেশ।

চন্দ্রনাথ লইয়া ভারী গোলমাল হইতেছে। না জানিয়া হাতে না পাইয়া এই সব বিজ্ঞাপন প্রভৃতি দেওয়া ছেলেমানুষির এক শেষ। তাহারা সমস্ত বই চন্দ্রনাথ দিবে না, এজন্য মিথ্যা চেষ্টা করিবেন না। তবে, নকল করিয়া এ'টু একটু করিয়া পাঠাইবে। আমার একেবারে ইচ্ছা নয় আমার পুরাণ লেখা যেমন আছে তেমনই, প্রকাশ হয়। অনেক ভুলভ্রান্তি আছে, সেগুলি সংশোধন করিতে যদি পাই ত ছাপা হইতে পারে, অন্যথা নিশ্চয় নয়। এক কাশীনাথ লইয়া আমি যথেষ্ট লজ্জিত হইয়াছি—আর যে বন্ধুবান্ধবদের নিকটে এই লইয়া লজ্জা পাই আমার ইচ্ছা নয়। তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার মঙ্গলেচ্ছাই

করিয়াছেন, কিন্তু আমার মত সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। চন্দ্রনাথ বন্ধ থাক্। চরিত্রহীন জ্যৈষ্ঠ থেকে সুরু করুন।[১] আর যদি চন্দ্রনাথ বৈশাখে সুরু হইয়াই গিয়া থাকে (অবশ্য সে অবস্থায় আর উপায় নাই) তাহা হইলেও আমাকে বাকীটা পরিবর্ত্তন পরিবর্জ্জন ইত্যাদি করিতেই হইবে। বৈশাখে কতটুকু বাহির হইয়াছে দেখিতে পাইলে আমি বাকীটা হাতে না পাইলেও খানিকটা খানিকটা করিয়া লিখিয়া দিব। যদি বৈশাখে ছাপা না হইয়া থাকে তাহা হইলে চরিত্রহীন ছাপা হইবে।

আমি চরিত্রহীনের জন্য অনেক চিঠিপত্র পাইতেছি। কেহ টাকার *লোভ, কেহ সম্মানের লোভ, কেহ-বা দুইই, কেহ-বা বন্ধুত্বের অনুরোধও* করিতেছেন। আমি কিছুই চাহি না—আপনাকে বলিয়াছি আপনার মঙ্গল যাতে হয় করিব—তাহা করিবই। আমি কথা বদলাই না।

আপনি দয়া করিয়া এই ঠিকানায় ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ যমুনা পাঠান—B. Promathanath Bhattacharji. 19, Jugal Kisore Das Lane, Calcutta.

এঁরা অর্থাৎ গুরুদাসবাবুর পুত্র তাঁহার নূতন কাগজের জন্য আমার লেখার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, অবশ্য আমার প্রিয়তম বন্ধু প্রমথর খাতিরে, কিন্তু ঐ কথা আমার। যা হোক ফাল্গুন চৈত্র 'যমুনা' তাঁকে দিন—তিনি তাঁর দল আমার কাশীনাথ সম্বন্ধে কিছু গোপন সমালোচনা করিয়াছেন। আরও এই একটা কথা যে আমি নিয়মিত 'যমুনা' ছাড়া আর কোথাও লিখিব না তাহাতেও একটা কাজ হইবে।

১। ১৩২০ সালের কার্তিক সংখ্যা যমুনায় "চরিত্রহীন" প্রথম ছাপা সুরু হয়। ১৩২১ সাল পর্যন্ত চরিত্রহীনের আংশিক মাত্র যমুনায় ছাপা হয়েছিল, তার পর আর ছাপা হয় নি।

আমার লেখা তুচ্ছ করিতে তাঁহারাও সাহস করিবেন না। আমি গণ্ডমূর্খ নই, সে-কথা প্রমথ জানে।

নিরুপমাকে নিজের দলে টানিবার চেষ্টা করিবেন। তিনি সত্যই লেখেন ভাল। এবং বাজারে নাম আছে। অনেক সময়ে এবং বেশীর ভাগ সময়েই আমার চেয়েও তাঁর লেখা ভাল ব'লেই আমার মনে হয়। এর মধ্যে 'মানসী'র শ্রীযুক্ত ফকিরবাবুর সহিত যদি দেখা হয় বলিবেন তাঁর পত্র পাইয়াছি এবং শীঘ্র উত্তর দিব। আমারও জ্বর এই জন্য পত্র দিতে পারিতেছি না—শীঘ্র দিব।

আপনি একটা কথা বলিতে পারেন কি? আমার আরও কত দিন শ্রাদ্ধ 'সাহিত্য' কাগজে হইবে? লোকে হয়ত মনে করিবে আমার লেখার ক্ষমতা 'কাশীনাথে'র অধিক নয়। এটাতে যে নাম খারাপ হয়, উপীন বেচারার বোধ হয় সে কথা মনেও ছিল না। তথাপি সে যে আমার আন্তরিক মঙ্গলেচ্ছাতেই এরূপ করিয়াছে, এই জন্যই কোন মতেই সহ্য করিয়া আছি। আর উপায়ও নাই। তবে জিজ্ঞাসা করি, আরও ঐ রকমের গল্প তাঁদের হাতে আছে নাকি? যদি থাকে তা হ'লেই সারা হব দেখচি। আরও একটা আপনাকে বলি। সেদিন গিরীণের পত্র পাই—তাঁহাদের সহিত উপীনের 'চন্দ্রনাথ' লইয়া কিছু বকাবকির মত হইয়া গিয়াছে। তাঁরা যদিও আপনার প্রতি বিরূপ নন, তত্রাচ এই ঘটনাতে এবং কাশীনাথের 'সাহিত্যে' প্রকাশ হওয়া ব্যাপারে তাঁরা চন্দ্রনাথ দিতে সম্মত নন। তাঁরা আমার লেখাকে বড় ভালবাসেন। পাছে হারিয়ে যায় এই ভয় তাঁদের। এবং পাছে আর কোন কাগজওয়ালারা ওটা হাতে পায় এই জন্য সুরেন নকল করিয়া একটু একটু করিয়া পাঠাইবার মতলব করিয়াছে।[১] 'চন্দ্রনাথ'

১। শরৎচন্দ্র প্রথম যখন রেঙ্গুন যান, তখন তিনি তাঁর ছেলেবেলাকার লেখাগুলো

যদি বৈশাখে ছাপা হইয়া গিয়া থাকে[১] আমাকে চিঠি লিখিয়া কিম্বা তার দিয়া জানান 'yes' or 'no', আমি তারপরে সুরেনকে আর একবার অনুরোধ করিয়া দেখিব। এই বলিয়া অনুরোধ করিব যে আর উপায় নাই দিতেই হইবে। যদি ছাপা না হইয়া থাকে তাহা হইলেই ভাল, কেন না চরিত্রহীন ছাপা হইতে পারিবে।

আমাকে গল্প ও প্রবন্ধ পাঠাবেন। অন্যান্য আপনিই দেখিয়া দিবেন। যা-তা গল্প ছাপা নয়, অন্ততঃ হাত থাকিতে ছাপা না হয় এই আমার অভিপ্রায়।

অত্যন্ত তাড়াতাড়ি চিঠি লিখিতেছি (কাজের মধ্যেই), সেই জন্য সব কথা তলাইয়া ভাবিতে পারিতেছি না, কিন্তু যাহা লিখিয়াছি তাহা ঠিকই জানিবেন।

দ্বিজুবাবুকে সম্পাদক করিয়া grand ভাবে হরিদাসবাবু কাগজ বাহির করিতেছেন। ভালই। তাঁরা টাকা দিবেন কাজেই ভাল লেখাও পাইবেন। তা ছাড়া তেলা মাথায় তেল দিতে সকলেই উদ্যত, এটা সংসারের ধর্ম্ম! এর জন্য চিন্তার প্রয়োজন দেখি না।

জ্যৈষ্ঠের জন্য যাহা পাঠাইব তাহা বৈশাখের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই পাঠাইব। শুধু 'চন্দ্রনাথ' সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইয়া রহিলাম। ওটা কেমন গল্প কি রকম লেখার প্রণালী না জেনে প্রকাশ করা উচিত নয় ব'লে ভয় হচ্চে। যা হোক অতি শীঘ্র এ-বিষয়ে সংবাদ পাবার আশায় রইলাম।

তাঁর মাতুলদের কাছে রেখে গিয়েছিলেন। এই হিসাবে শরৎচন্দ্র মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে "চন্দ্রনাথ" বইখানা রেখে যান।

১। চন্দ্রনাথ ১৩২০ সালের বৈশাখ—আশ্বিন সংখ্যা যমুনায় প্রকাশিত হয়।

ভাল নই—জরোভাব কাল রাত্র থেকেই হয়ে আছে। না বাড়লেই ভাল। আপনার দেহ কেমন? জ্বর সারুল? ইতি—আপনাদের স্নেহের শরৎ?

রেঙ্গুন, ২৮শে মার্চ ১৯১৩

প্রিয় ফণীবাবু—এই মাত্র আপনার রেজেষ্ট্রী প্যাকেট পাইলাম। যদি Registry করেন, তবে বাড়ীতে পাঠান কেন? আফিসের ঠিকানাই ভাল—কেন না বাড়ীতে যখন পিয়ন যায়, তখন আমি আফিসে থাকি। যদি Unregistered পাঠান তবে বাড়ীর ঠিকানায় দেবেন। প্রবন্ধ দুটি দেখিয়া শুনিয়া শীঘ্রই পাঠাব। বৈশাখের জন্য দেখি বড়ই গোলযোগ। যা হোক এ মাসটা এই রকমে চালান—(১) পথনির্দ্দেশ, (২) নারীর মূল্য এবং অন্যান্য প্রবন্ধ প্রভৃতি। চন্দ্রনাথ ছাপাবেন না, কারণ যদি ছাপানই মত হয় ত একটু নতুন ক'রে দিতে হবে। জ্যৈষ্ঠ থেকে হয় চরিত্রহীন না হয় চন্দ্রনাথ আরও বড় এবং ভাল ক'রে ক্রমশঃ। দেখি সুরেন গিরীন কি জবাব দেয়। বৈশাখে আর বিশেষ কোন উপায় হয় না দেখিতেছি। অবশ্য আপনার claim যে আমার উপর first তাহাতে আর সন্দেহ কি! আমি যে-কটা দিন বাঁচিয়া আছি—আপনাকে বেশী কষ্ট পাইতে হইবে না। তবে ভাই, আমার শরীর ত ভাল নয়—তা ছাড়া গল্পটল্প বড় লিখিতেও প্রবৃত্তি হয় না। এ যেন আমার অনেকটা দায়ে প'ড়ে গল্প লেখা। যা হোক লিখব—অন্ততঃ আপনার জন্যেও। সত্যই এর মধ্যে গল্প লিখে পাঠাবার অনেকগুলি নিমন্ত্রণপত্র আসিয়াছে, কিন্তু আমি বোধ করি প্রায় নিরুপায়। অত গল্প লিখতে গেলে আমার পড়াশুনা বন্ধ

হয়ে যাবে। আমি প্রতি দিন ২ ঘণ্টার বেশি কিছুতে লিখি না—১০।১২ ঘণ্টা পড়ি—এ ক্ষতি আমার নিজের আমি কিছুতে করিব না। যা হোক আপনার বৈশাখটা গোলেমালে এক রকম বার হয়ে যাক, তার পরের মাস থেকে দেখা যাবে। দেখুন প্রথমে আপনার গ্রাহকেরা কি বলে। তার পরে বুঝে কাজ করা। আমার পরম ভাগ্য যে আপনার মাতৃদেবীও আমার খোঁজ নেন। তাঁকে বলবেন আমি ভাল আছি। আশা করি অপরাপর মঙ্গল। বৈশাখেরটা তত ভাল যদি না হয়, একটু না হয় কাগজে সে বিষয়ে উল্লেখ ক'রে দেবেন—যে আমার একটা গল্প প্রায় মাসেই থাকবে।

(আমার ঠিকানাটা আপনি যাকে তাকে দেন কেন?) আমাকে অনেকেই বলেন, বড় কাগজে লিখতে। কেন না, তাতে বেশি নাম হবে। আপনার ছোট কাগজ—ক'টা লোকেই বা পড়ে। অবশ্য এ কথা আমিও স্বীকার করি। লাভ লোকসানের বিচার করতে গেলে তাদের কথাই সত্য এবং সচরাচর সকলেই সেইরূপ করে। কিন্তু আমার একটু আত্মসম্ভ্রমও আছে এবং একটু আত্মনির্ভরও আছে। তাই সকলে যে পথটাকে সুবিধা মনে করেন, আমিও সেটাকে সুবিধা মনে করিলেও আমার সমস্ত আশ্রয়ই তা নয়। আমি ছোট কাগজকে যদি চেষ্টা করিয়া বড় করিতে পারি—সেইটাকেই বেশি লাভ মনে করি। তা ছাড়া আপনাকে অনেকটা ভরসা দিয়েচি। এখন ইতরের মত অন্য রকম করিব না। আমার অনেক দোষ আছে বটে, কিন্তু, সমস্তটাই দোষে ভরা নয়। আমি অনেক সময়েই নিজের কথা বজায় রাখবার চেষ্টা করি। আপনি চিন্তিত হবেন না। আমার এই চিঠিটা কাহাকেও পড়িতে দিবেন না। যদি বৈশাখে বোঝা যায় গ্রাহক কমিতেছে না, বরং বাড়িতেছে, তাহা হইলে আশা হইবে যে পরে আরও বাড়িবে।

'পথনির্দ্দেশটা'[১] সমস্তটা একেবারেই ছাপিবেন। ক্রমশঃ ছাপিবেন না। আর এক কথা 'নারীর লেখায়'[২] বিস্তর ছাপার ভুল হইয়াছে, এক যায়গায় 'অনুরূপা'র বদলে 'আমোদিনী'র নাম হইয়া গিয়াছে। "ভুমার সঙ্গে ভূমির" ইত্যাদি এটা অনুরূপার—আমোদিনীর নয়। নিরুপমাকে সন্তুষ্ট রাখিয়া যদি তাহার লেখা বেশি পাইতে পারেন চেষ্টা করিবেন। সে বাস্তবিকই ভাল লেখে। সে আমার ছোট বোনও বটে, ছাত্রীও বটে।—শরৎ

[এপ্রিল ১৯১৩]

প্রিয় ফণীবাবু—আমার হইয়া একটা কাজ আপনাকে করিতে হইবে। আমি প্রচলিত মাসিক কাগজগুলার সম্বন্ধে প্রায়ই কিছুই জানিতে পারি না বলিয়া সমালোচনা লিখিতে পারি না। আমি নেহাৎ মন্দ সমালোচক নই—সুতরাং এই দিক্‌টায় একটু চেষ্টা করিব,—অবশ্য যমুনার জন্যই। সেই জন্য আপনাকে অনুরোধ করি, আমার হইয়া দুই তিনটি ভাল মাসিক কাগজ V. P. .P. ডাকে যাহাতে এখানে আসে করিয়া দিবেন। আমি দাম দিয়া delivery লইব। 'প্রবাসী', 'সাহিত্য', 'মানসী', 'ভারতী'। লেখা দিয়া কাগজগুলি বিনা পয়সায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না—অত লেখাই বা পাই কোথায়? অবশ্য দুই একটা এখন খাতিরে পাইতেছি, কিন্তু ও খাতিরে আমার আবশ্যক নাই। বরং লজ্জা পাইতেছি যে তাঁহারা কাগজ পাঠাইতেছেন, কিন্তু বিনিময়ে আমি কিছুই দিতে পারিতেছি না।

১। "পথনির্দ্দেশ" ১৩২০ সালের বৈশাখ সংখ্যা যমুনায় প্রকাশিত হয়।

২। "নারীর লেখা" শ্রীঅনিলা দেবীর ছদ্মনামে ১৩১৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যা যমুনায় প্রকাশিত হয়।

মুখ ফুটিয়া এ কথা জানাইতেও লজ্জা করিতেছে। এই সব মনে করিয়াই এই অনুরোধ আপনাকে করি—ঠিকানা 14, Lower Pozoungdoung Street. বৈশাখ থেকে যদি আসে বড় ভাল হয়। আমাদের ক্লাবে কাগজ আসে বটে, কিন্তু সে বড় অসুবিধা। আপনাকে অনেক রকম অনুরোধ করিয়া মাঝে মাঝে ব্যস্ত করিবই। আমার স্বভাবটাই এইরূপ। কিছু মনে করিবেন না—আপনি আমার চেয়ে বয়সে ঢের ছোট। ছোট ভাইয়ের মতন মনে করি বলিয়াই এইরূপ ব্যাগার খাটিতে বলি। অন্য মেলে চিঠি ও লেখা প্রভৃতি পাঠাইব। ইতি—শরৎ

14, Lower Pozoungdoung Street,
Rangoon. 3. 5. 13.

প্রিয় ফণীবাবু—আপনার পত্র পাইয়াছি এবং প্রেরিত কাগজগুলো অর্থাৎ প্রবাসী, মানসী, ভারতী, সাহিত্য ইত্যাদি সবগুলাই পাইয়াছি। চন্দ্রনাথের যাহা পরিবর্ত্তন উচিত মনে করিয়াছি, তাহাই করিয়াছি এবং ভবিষ্যতে এইরূপ করিয়াই দিব। চন্দ্রনাথ গল্প হিসাবে অতি সুমিষ্ট গল্প, কিন্তু আতিশয্যে পূর্ণ হইয়া আছে। ছেলেবেলা অন্ততঃ প্রথম যৌবনে ঐরূপ লেখাই স্বাভাবিক বলিয়াই সম্ভব ঐরূপ হইয়াছে। যাহা হউক, এখন যখন হাতে পাইয়াছি তখন এটাকে ভাল উপন্যাসেই দাঁড় করান উচিত। অন্ততঃ দ্বিগুণ বাড়িয়া যাওয়াই সম্ভব। প্রতি মাসে ২০ পাতা করিয়া দিলেও আশ্বিনের পূর্ব্বে শেষ হইবে কি না সন্দেহ। এই গল্পটির বিশেষত্ব এই যে, কোনরূপ—immoralityর সংস্রব নাই। সকলেই পড়িতে পারিবে। "চরিত্রহীন" artএর হিসাবে এবং চরিত্র গঠনের হিসাবে নিশ্চয়ই ভাল, কিন্তু এ রকম ধরণের নয়।

চরিত্রহীনের জন্ত প্রমথ ক্রমাগত তাগিদ দিতে ছিল, কিন্তু শেষের তাগিদ এরূপ ভাবে দাঁড়াইয়াছিল যে বুঝি বা আজন্মের বন্ধুত্ব যায়। সেই ভয়ে তাকে আমি চরিত্রহীন পড়িতে পাঠাইয়াছি। অবশ্য কি তাহার মনের ভাব ঠিক বুঝি না, কিন্তু আমার মনের ভাব তাহাকে বেশ সুস্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিয়াছি। এখন তাহার নিকট হইতে জবাব পাই নাই। পাইলে লিখিব। আমার এবং আপনার মধ্যে একটা স্নেহের সম্বন্ধ অতি প্রগাঢ়।* আমার বয়স হইয়াছে—এই বয়সে যাহা হয় তাহাকে ইচ্ছামত নষ্ট করি না। কেন আপনি আমার সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্বিগ্ন হন। 'যমুনা'র উন্নতি আমার সকলের চেয়ে বেশি লক্ষ্য, তার পরে আর কিছু। চরিত্রহীন সেই অর্দ্ধেক লেখা হইয়াই আছে—কি হবে তাও জানি না, কবে শেষ হবে তাও বলতে পারি না। চন্দ্রনাথটা যাতে এ বৎসরে ভাল হয়ে বার হয় তার চেষ্টা করতেই হবে—কারণ সেটা already প্রকাশ করা হয়েছে। এ বৎসর যাতে 'যমুনা' অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারে, তারই চেষ্টা সব চেয়ে দরকার। তার পরে অর্থাৎ পর-বৎসর আকারটা আরো বৃদ্ধি ক'রে দেওয়া। এ বৎসর গ্রাহক কত? গত বৎসরের চেয়ে কম না বেশি? এটা লিখবেন। আমি যদি অন্য কাগজে লিখে নামটা আরো প্রচার করতে পারতাম তা হ'লে 'যমুনা'র সম্বন্ধে উপকার ছাড়া অপকার হ'ত না, কিন্তু অসুখের জন্ত লিখতেই পারি না এবং তাহা হবেও না। তাড়াতাড়ি করলে হবে না ফণীবাবু, স্থির হয়ে বিশ্বাস রেখে অগ্রসর হ'তে হবে। আমি বরাবরই আপনার কাজে লেগে থাকব—কিন্তু, আমার ক্ষমতা বড়ই কম হয়ে গেছে। খাটতে পারি নে। আর একটা সমালোচনা লিখচি—দু-তিন দিনেই শেষ হবে। ঋতেন্দ্র ঠাকুরের বিরুদ্ধে। (বোধ করি একটু অতিরিক্ত তীব্র হয়ে গেছে) ফাল্গুনের সাহিত্যে তিনি উড়িষ্যার খোন্দ জাতি সম্বন্ধে

একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেটা আগাগোড়াই ভুল। প্রত্নতত্ত্ব যা-তা লেখা না হয় (নাম বাজাবার জন্য), এইটাই আমার সমালোচনার উদ্দেশ্য, ঠিক জানি না ঋতেন্দ্র ঠাকুরের সহিত 'যমুনা'র কিরূপ সম্বন্ধ— যদি উচিত বিবেচনা করেন, ছাপাবেন, না হয় 'সাহিত্যে' দেবেন[১]। না, সে গল্প আজও পাই নি। নিরুপমা দেবীর কোন লেখা পেলেন কি? তাঁকে একটা কিছু ভার দিতে যদি পারেন তা হ'লে খুব ভাল হয়। অবশ্য সৌরীনবাবু যদি আমার অবর্ত্তমানে আমার ভার নেন তা হ'লে তো ভালই হয়, কিন্তু আমার বোধ হয় নিরুপমাও অনেকটা ভার নিতে পারে। সুরেন, গিরীন, উপীনও। তবে প্রবন্ধ লিখতে এরা পারবে কি না জানি না। প্রবন্ধ লিখতে একটু পড়াশুনা থাকলে ভাল হয়— কেন না তাতে মনে জোর থাকে। গল্পটল্প এঁরা যদি লেখেন আমি তা হ'লে শুধু প্রবন্ধ নিয়েই থাকতে পারি। গল্প লেখা তেমন আসেও না, বড় ভালও লাগেও না। বয়স হয়েচে, এখন একটু চিন্তাপূর্ণ কিছু লিখতেই সাধ হয়। আমার গল্প লেখা অনেকটা জোর ক'রে লেখা। জোরজবরদস্তির কাজ তেমন মোলায়েম হয় না। প্রমথর শেষ চিঠিটা এই সঙ্গে পাঠালাম। আমার নাম যে 'অনিলা দেবী' কেউ যেন না জানে। প্রমথ নাকি 'আমি' আন্দাজ ক'রে D. L. Royকে বলেচে। তাকে কড়া চিঠি লিখব।

আপনার কাগজ আমি নিজের কাগজ মনে করি। এর ক্ষতি ক'রে কোন কাজ করব না। শুধু প্রমথকে নিয়েই একটু গোলে পড়েচি। সেও—acquaintance নয়, পরম বন্ধু। চিরদিনের অতি স্নেহের পাত্র।

১। সমালোচনাটি "কানকাটা" নামে শ্রীমতী অনিলা দেবীর ছদ্মনামে ১৩২০ সালের আষাঢ় সংখ্যা যমুনাতেই প্রকাশিত হয়েছিল।

তাহাতেই একটু ভাবিত হই, না হ'লে আর কি। প্রমথর চিঠি থেকে অনেক কথাই টের পাবেন। এখন জ্বর ১০২.৫°। জ্বর রেঙ্গুনে হয় না—কিন্তু আমার জ্বর হয় অন্য কারণে। বোধ করি হার্ট সংক্রান্ত, general health এ দেশের ভালই, তবে আমার সহ্য হচ্চে না। ইতি—আঃ শরৎ।

14. Lower Pozoungdoung street
Rangoon 10. 5. 1913.

ফণীন্দ্রবাবু—আপনার তার পাইয়া জবাব দিই নাই। কারণ জবাব দিবার ঠিক জিনিষটা আমার হাতছাড়া। তবে আশা করি শীঘ্র হাতে আসিবে।

আগামী মেলে সমালোচনা, নারীর মূল্য পাঠাইব। পরের মেলে চন্দ্রনাথ ও একটা যা হয় কিছু। চরিত্রহীন যাতে যমুনায় বার হয় তাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাই হবে। নিশ্চিন্ত হোন্। তবে শুনিতেছি, ওটাতে 'মেসের ঝি' থাকাতে রুচি নিয়ে হয়ত একটু খিটিমিটি বাধিবে। তা বাধুক। লোকে যতই কেন নিন্দা করুক না, যারা যত নিন্দা করিবে তারা তত বেশী পড়িবে। ওটা ভাল হোক মন্দ হোক একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে পড়িতেই হইবে। যারা বোঝে না, যারা art-এর ধার ধারে না তারা হয়ত নিন্দা করবে। কিন্তু, নিন্দা করলেও কায হবে। তবে ওটা Psychology এবং analysis সম্বন্ধে যে খুব ভাল তাতে সন্দেহই নেই ৷ এবং এটা একটা সম্পূর্ণ Scientific Ethical Novel! এখন টের পাওয়া যাচ্ছে না। আঃ শরৎ—

14, Lo… Pozoungdoung Street,
Rangoon. [বৈশাখ ১৩২০]

প্রিয় ফণীবাবু—গত মেলে চন্দ্রনাথের কতকটা পাঠাইয়াছি। আগামী মেলে আরও কতকটা পাঠাইব। অত্যন্ত পীড়িত। জ্যৈষ্ঠের 'যমুনা'র জন্য বিশেষ চিন্তিত রহিলাম। মাথার যন্ত্রণা এত অধিক যে কোন কাজ করিতে পারিতেছি না। অক্ষরের দিকে তাকাইবা মাত্রই কষ্ট হয়। বাধ্য হইয়া কাজকর্ম্ম পড়াশুনা সবই স্থগিত রাখিয়াছি। সৌরীন্দ্রবাবুকে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ দিয়া বলিবেন—এই ত ব্যাপার। যা হয় এ মাসটা এক রকমে চালান—ভাল হ'লে আষাঢ়ের জন্য আর চিন্তা থাকিবে না। আমি সৌরীনকে চিঠি লিখিতে পারিলাম না—তিনি আমাকে যাহা লিখিয়াছেন পড়িয়া সত্যই ভারী খুসী হইয়াছি। আমাকে কাছে ডাকিয়াছেন—দেখি। এমন সব বন্ধু যার তার বড় সৌভাগ্য। "চরিত্রহীন" অর্দ্ধলিখিত অবস্থাতেই প্রমথকে পড়িবার জন্য পাঠাইয়াছি। পুনঃ পুনঃ পীড়াপীড়ি করাতেই—আমি কিছুতেই তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। ফিরিয়া পাইলে বাকিটা লিখিব। গল্প এ মাসে আর পারিব না—কেন না সময় নাই। একটা সমালোচনা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, শেষ করিতে পারিলাম না। যদি শেষ হয় আপনার হাতে আসিতে ২৬ তারিখ হইয়া যাইবে—সুতরাং এ মাসে কাজে আসিবে না। বাস্তবিক বড় ভাবিত থাকিলাম—অনেক চেষ্টা করিয়াও লিখিতে পারিতেছি না। কেহ যদি লিখিয়া লইবার থাকিত তাহা হইলে বলিয়া যাইতে পারিতাম। তাও কাহাকে পাই না। বৈশাখের 'যমুনা' সত্যই ভাল হইয়াছে। সৌরীনের গল্পটি বেশ। প্রবন্ধটিও ভাল।—শরৎ

রেঙ্গুন, ১৪-৯-১৩

প্রিয়বরেষু—…আমার সংবাদ যে আপনার মাতৃদেবী গ্রহণ করেন, আমার এ বহু সৌভাগ্যের কথা, আমি বেশ সুস্থ হইয়াছি তাঁহাকে জানাইবেন। আমার সংবাদ লইবার লোক সংসারে প্রায় নাই, সেই জন্য কেহ আমার ভাল মন্দ জানিতে চাহেন শুনিলে কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠি। আমার মত হতভাগ্য সংসারে খুবই কম।…উপকার করিতেছি, যশ মান স্বার্থ ত্যাগ করিতেছি ইত্যাদি বড় বড় ভাব আমার কোনও দিনই নাই। কোনো দিন ছিল না আজও নাই, এটা আর বেশি কথা কি? যশের কাঙ্গাল হইলে সেই রকম হয়ত ইতিপূর্ব্বেই চেষ্টা করিতাম, এতদিন এমত চুপ করিয়া থাকিতাম না।…… আরো একটা কথা এই যে, শতদ্বারী চণ্ডীপাঠক হইতে আমার লজ্জাও করে। একটা কাগজে নিয়মিত লিখি এই যথেষ্ট। যে আমার লেখা পড়িতে ভালোবাসে সে এই কাগজই পড়িবে এই আমার ধারণা। তা ছাড়া হোমিওপ্যাথী ডোজে এতে একটু ওতে একটু, অশ্রদ্ধা ক'রে, যা-তা ক'রে, তর্জ্জমা ক'রে, পরের ভাব চুরি ক'রে—এ সব ক্ষুদ্রতা আমার ছেলেবেলা থেকেই নেই। আর এত লিখিতে গেলে পড়াশুনা বন্ধ করিতে হয়, সেটা আমার মৃত্যু না হইলে আর পারিব না।…… আমার ছোট গল্পগুলা কেমন যেন বড় হইয়া পড়ে এটা ভারী অসুবিধার কথা। আরো এই যে আমি একটা উদ্দেশ্য লইয়াই গল্প লিখি, সেটা পরিস্ফুট না হওয়া পর্য্যন্ত ছাড়িতে পারি না। "বিন্দুর ছেলে" [১] আমি ভাবিয়াছিলাম আপনার পছন্দ হইবে না, হয়ত প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করিবেন। তাই পাছে আমার খাতিরে অর্থাৎ চক্ষুলজ্জারই খাতিরে

১। ১৩২০ সালের শ্রাবণ সংখ্যা যমুনায় "বিন্দুর ছেলে" প্রকাশিত হয়।

নিজে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও প্রকাশ করেন, এই আশঙ্কায় আপনাকে পূর্ব্বেই সতর্ক করিয়া দিতেছিলাম। অর্থাৎ sincere হওয়া চাই—যদি সত্যই আপনার ভাল লাগিয়া থাকে, ছাপাইয়া ভালই করিয়াছেন—তাতে পাঠক যাই বলুক। "নারীর মূল্য" আগামী বারে শেষ করিয়া আর একটা সুরু করিব। নারীর মূল্যের বহু সুখ্যাতি হইয়াছে। আমি মনে করিয়াছি ১৪টা মূল্য ঐ রকমের লিখিব। এবারে হয় প্রেমের মূল্য, না হয় ভগবানের মূল্য লিখিব। তার পরে ক্রমশঃ ধর্ম্মের মূল্য, সমাজের মূল্য, আত্মার মূল্য, সত্যের মূল্য, মিথ্যার মূল্য, নেশার মূল্য, সাংখ্যের মূল্য ও বেদান্তের মূল্য লিখিব।…চরিত্রহীন মাত্র ১৪.১৫ চ্যাপটার লেখা আছে, বাকিটা অন্যান্য খাতায় বা ছেঁড়া কাগজে লেখা আছে, কপি করিতে হইবে। ইহার শেষ কয়েক চ্যাপটার যথার্থই grand করিব। লোকে প্রথমটা যা ইচ্ছা বলুক, কিন্তু শেষে তাহাদের মত পরিবর্ত্তিত হইবেই। আমি মিথ্যা বড়াই করা ভালোবাসি না এবং নিজের ঠিক ওজন না বুঝিয়াও কথা বলি না, তাই বলিতেছি, শেষটা সত্যই ভালো হইবে বলিয়াই মনে করি। আর moral হোক immoral হোক, লোকে যেন বলে, "হ্যাঁ একটা লেখা বটে।" আর এতে আপনার বদ্‌নামের ভয় কি? বদ্‌নাম হয় ত আমার। তা ছাড়া কে বলিতেছে আমি গীতার টীকা করিতেছি? "চরিত্রহীন" এর নাম!—তখন পাঠককে ত পূর্ব্বাহ্ণেই আভাস দিয়াছি—এটা সুনীতিসঞ্চারিণী সভার জন্যও নয়, স্কুলপাঠ্যও নয়! টলষ্টয়ের 'রিসরেক্‌শন্' তাহারা একবার যদি পড়ে তাহা হইলে চরিত্রহীন সম্বন্ধে কিছুই বলিবার থাকিবে না। তা ছাড়া ভাল বই, যাহা art হিসাবে—Psychology হিসাবে বড় বই, তাহাতে দুশ্চরিত্রের অবতারণা থাকিবেই থাকিবে। কৃষ্ণকান্তের উইলে নাই?…টাকাই সব নয়, দেশের কাজ করা দরকার; পাঁচ জনকে

যদি বাস্তবিক শিখাইতে পারা যায়, গোঁড়ামির অত্যাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে কথা বলা যায়, তার চেয়ে আনন্দের বস্তু আর কি আছে? আজ লোকে আমাদের মত ক্ষুদ্র লোকের কথা না শুনিতে পারে, কিন্তু এক দিন শুনিবেই।...এক দিন এই সঙ্কল্প করিয়াই আমি সাহিত্যসভা গড়িয়াছিলাম, আজ আমার সে সভাও নাই, সে জোরও নাই!

রেঙ্গুন, ১০-১০-১৩

প্রিয়বরেষু—তোমার প্রেরিত 'বড়দিদি'[১] পাইয়াছিলাম, মন্দ হয় নাই। তবে, ওটা বাল্যকালের রচনা, ছাপানো না হইলেই বোধ করি ভাল হইত।

আজকাল মাসিক পত্রে যে সমস্ত ছোট গল্প বাহির হয় তাহার পনেরো আনা সম্বন্ধে সমালোচনাই হয় না। সে সব গল্পও নয়, সাহিত্যও নয়—নিছক কালিকলমের অপব্যবহার এবং পাঠকের উপর অত্যাচার। এবার...র এতগুলো গল্প বাহির হইয়াছে অথচ একটাও ভাল নয়। অধিকাংশই অপাঠ্য। কোনটার মধ্যে বস্তু নাই, ভাব নাই, আছে শুধু কথার আড়ম্বর, ঘটনার সৃষ্টি আর জোরজবরদস্তির pathos; বুড়ো বেশ্যাকে সাজগোজ করিয়া যুবতী সাজিয়া লোক ভুলাইবার চেষ্টা করা দেখিলে মনের মধ্যে যেমন একটা বিতৃষ্ণা, লজ্জা অথবা করুণা জাগে, এই সব লেখকদের এই সব গল্প লেখার চেষ্টা দেখিলে সত্যই আমার মনে এমনিধারা একটি ভাবের উদ্রেক হয়, তাহা আর যাই

১। ১৩২০ সালে কান্তিচন্দ্র পাল শরৎচন্দ্রের "বড়দিদি" প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এইটিই শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। বড়দিদি ইতিপূর্বে ১৩১৪ সালের বৈশাখ—আষাঢ় সংখ্যা "ভারতী" পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম দুই সংখ্যার লেখায় লেখকের কোন নাম ছিল না।

হোক, মোটেই healthy নয়। ছোট গল্পের কি দুরবস্থা আজকাল।...

দুই একটা কথা "চরিত্রহীন" সম্বন্ধে বলি। এ সম্বন্ধে লোকে কে কি বলে শুনিলেই আমাকে জানাইবে। এই বইখানার বিষয়ে এত লোকের এত রকম অভিপ্রায় যে ঐ সম্বন্ধে একটা কিছু ঠিক ধারণা করাও শক্ত। immoral ত লোকে বলিতেছেই—কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যে যা-কিছু বাস্তবিক ভাল, তাতে এর চেয়ে ঢের বেশি immoral ঘটনার সাহায্য লওয়া হইয়াছে। যাই হোক, সাহিত্যিকদের মতামত আমাকে জানাইয়া দিবে।...

পরম কল্যাণীয়,......মাঝে মাঝে মনে করিতেছি কিছু ছুটি লইয়া বর্ম্মাতেই কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া থাকি, আর কলিকাতায় ফিরিব না। যা হয় পরে লিখিব। আপাততঃ ভাল আছি, কিন্তু লেখাপড়া সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। তোমরা আমাকে কলিকাতায় গিয়া থাকিতে বলিতেছ সত্য, কিন্তু আমার ওটা পছন্দ হয় না। চাকরি বাকরি ছাড়িয়া দিয়া ভবঘুরে হইয়া বেড়াইতে এই অসুস্থ শরীরে মোটেই পছন্দ করি না। আর, কাহারো কাছে গিয়া থাকা—সে ত একেবারেই অসম্ভব। আমি বরং হাসপাতালে মরিব, কিন্তু কিছুতেই কাহারো ঘরে এই পীড়িত দেহ লইয়া গিয়া শেষ রাখা রাখিব না। ওটা আমি ঘৃণা করি। আমার অনেক আত্মীয় বন্ধু আছে তাহা জানি, গেলে কিছু দিন যত্ন যে না হয় তা মনে করি না, কিন্তু আমি আর কাহাকেও অনর্থক ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করি না। যদি যাই, আমার বড় ভগিনীর ওখানে গিয়াই থাকিব, কেন না সেইটাই এক রকম আমার বাড়ীঘর দোর। তাঁর অবস্থাও খুব ভালো—ক্রমাগত যাইবার জন্যও পীড়াপীড়ি করিতেছেন, কিন্তু অসুস্থ শরীরে আমি কোথাও যাইতে চাহি না। আমার কেবলি ভয় পাছে হঠাৎ মরিয়া গিয়া তাঁদের বিব্রত করি।

তবে আর বোধ হয় কোন আশঙ্কার হেতু নাই। বর্ষাকালটাই আমার বড় শক্ত কাল, বর্ষা ত শেষ হইল, এইবার ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিব বলিয়া ভরসা করিতেছি। আমার অসময়ে এই 'চরিত্রহীন' যদি শেষ না করিতেই পারি আর কে করিতে পারিবে তাহা গত বারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহার একটা জবাব দিয়া নিশ্চিন্ত করিবে।

আর একটা কথা জানিতে ইচ্ছা করি। "নারীর মূল্য" শেষ হইয়া গেল, ইহার যে এত বড় সুখ্যাতি হইবে তাহা মনেও করি নাই, কিন্তু এখন পরিচিত অপরিচিত লোকের নিকট হইতে ইহার বহু আলোচনা ও চিঠি পত্র পাইয়া মনে হইতেছে, লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ থাকিলে যেমন প্রথমে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম বোধ করি ঠিক তাহাই হইতে পারিত।...

তবে এও একটা কথা, যাঁহারাই কোন প্রতিবাদ করুন না, নিতান্ত স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া অবহেলা না করেন যেন। ভাল কথা, এটা যে আমার লেখা তাহা মণিলাল[১] জানিল কিরূপে? মানসী, প্রবাসী, সাহিত্য, এঁরাই বা জানিলেন কেমন করিয়া? তুমি ত প্রচার করিয়া দাও নাই? অবশ্য, যাহারা আমার লেখার সহিত ঘনিষ্টভাবে জড়িত তাহারা বুঝিতে পারিবে, কিন্তু সাধারণের ত বুঝিবার কথা নয়।...

১। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

[শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়[১]কে লেখা]

67/9 Lewis Street, Rangoon

3-1-15

প্রিয়বরেষু,

আসিবার সময় আপনার সহিত সাক্ষাৎ ঘটে নাই। সেদিন আপনার পিতাঠাকুর মহাশয়ের অসুখ হওয়ায় আপনি দোকানে আসিতে পারেন নাই। আমিও আর যাইতে পারি নাই। তলপেটে একটা প্রবল ব্যথা হওয়ায় ৪ ৫ দিন নড়িতে চড়িতে পারি নাই। পথে ভারি কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। উপর্য্যুপরি দুই মেল টিকিট না পাওয়ায়, আর অপেক্ষা করিতে না পারায় অবশেষে ডেকের টিকিট লইয়াই রওনা হই। অসম্ভব বেশি ভীড় প্রভৃতির জন্য এখানে আসিয়াই জ্বর হয়। ৬।৭ দিন পরে ভাল হই।

প্রমথ[২] একজোড়া প্রকাণ্ড খাট তৈরি করিবার ফরমাস দিয়াছিল। তাহা তৈরি হইয়া গিয়াছে এবং খুব সম্ভব ৪।৫ দিনের মধ্যে আমার একটি বন্ধুর সঙ্গে কলিকাতায় পাঠাইতে পারিব। কিন্তু সে ত ছত্রপুরে[৩] গিয়াছে। তাই মনে করিতেছি, আপনাকে টেলিগ্রাফ করিলে যদি লোক পাঠাইয়া wharf হইতে খাট দুটা লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন ত বড় ভাল হয়।

১। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ পুস্তকেরই প্রকাশক "গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স" নামক প্রতিষ্ঠানের এবং "ভারতবর্ষের" অন্যতম স্বত্বাধিকারী।

২। প্রমথনাথ ভট্টাচার্য।

৩। প্রমথবাবু কলেজ ছেড়ে কিছুদিন পাথুরেঘাটার রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ করেছিলেন। তারপর তিনি পোর্ট হেল্থ অফিসে চাকরী নেন। চাকরী করার সময় তিনি শারীরিক খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায় চাকরী থেকে অবসর

আমি আসিবার সময় তাড়াতাড়িতে একটি বইও আনিতে পারি নাই। একখানি ভারতবর্ষ আমার সঙ্গে নাই। ঐ দুটো গল্প যে দুই সংখ্যার ভারতবর্ষে আছে দয়া করিয়া যদি পাঠাইয়া দেন আমি একটু দেখিয়া শুনিয়া দিই।

আপনার কাছে আমি বহু বিষয়ে ঋণী। যদিও বলা বাহুল্য তথাপি না বলিয়াও ত থাকিতে পারি না। এ সকল ঋণ পরিশোধ করা আমার মত স্বভাবের লোকের পক্ষে কঠিন। নিজেদের কর্ত্তব্যও আমরা সব সময়ে করি না। এটাও আমাদের বোধ করি অন্তর্নিহিত স্বভাব। অথচ বাহিরের সংসারে সমস্তই ন্যায্যমত না করিলে সংসারই অচল হইয়া পড়ে।

যাই হোক্ কলিকাতার হাঙ্গামা হইতে দূরে আসিতে পারিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছি। দেখি যদি নূতন কিছু করিতে পারি।

আপনার বাড়ীর সম্বাদ জানাইবেন। বিশেষ করিয়া আপনার পিতাঠাকুর মহাশয় কেমন আছেন ইহাই শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছি।

আমি নিজে ভাল আছি। আমার ভালবাসা জানিবেন। ইতি—

আপনার—শরৎ

67/9 Lewis Street. Rangoon.

27 I. 15.

প্রিয়বরেষু—আপনার পত্র এবং ভারতবর্ষগুলা যথা সময়ে পাইয়াছি। শীঘ্রই ফেরৎ পাঠাইব।

টাকার কথা যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে শতকরা ৯৯ জন লোকই

গ্রহণ করেন। চাকরী ছেড়ে প্রমথবাবু স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য প্রথমে মধ্যভারতের ছত্রপুর রাজ্যে গিয়েছিলেন।

খুসী হয় এবং আশীর্ব্বাদ করে। অবশ্য আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি না, তবে, আন্তরিক শুভাকাঙ্খা করিতেছি।

আপনার পিতা ঠাকুর মহাশয় যদি কিছুও improve করিয়া থাকেন, যখন চিঠি লিখিবেন তাহা জানাইবেন। কারণ, উনি বাঁচিয়া থাকা পর্য্যন্ত আপনার কোন অমঙ্গল হইবে না।

উপীনবাবুর[১] চিঠি ত পাই নাই। বোধ করি শেষকালে মত বদ্‌লাইয়াছেন।

আমি বেশ ভাল আছি এবং যা পারি নির্ব্বিবাদে লিখিবার অবকাশ পাইতেছি। মেল Close করিবার সময় হইয়া আসিল। ইতি—

আপনার—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

54, 36th Street Rangoon.
22. 9. 15.

প্রিয়বরেষু—'পল্লিসমাজের'[২] এইরূপ শেষ করিয়া পাঠাইলাম। সেদিন যেমন করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া পাঠাইতে ছিলাম সেটা ভাল বোধ না হওয়ায় Conclusionটা অন্যরূপ হইল। ইতিমধ্যে আপনার চিঠি পাইলাম এ মাসে সমস্ত ছাপিবার, সেইজন্য ধীরে সুস্থে পাঠাইতেছি।

অবশ্য আমি নিজেই জানি 'সরস' বলিতে যা বুঝায় এ গল্প

১। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতবর্ষের অন্যতম সম্পাদক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ "ভারতবর্ষের" যুগ্ম-সম্পাদকের পদ ত্যাগ করলে উপেনবাবু জলধর সেনের সঙ্গে কিছুদিন ভারতবর্ষের যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন।

২। পল্লী-সমাজ প্রথমে ১৩২২ সালের আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়। পরে ঐ বছরই মাঘ মাসে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

তার ধার দিয়াও যায় না—নিতান্তই কটমটে পদার্থই খাড়া হয়েছে—তা হোক্ দুই একটা interesting গল্পও ভাল। প্রবন্ধও ত অনেকে পড়ে।

আপনার দেওয়া ৫০ টাকা পাইয়া সত্যই অতিশয় বিস্মিত হইলাম। যাই হোক্ বহু ধন্যবাদ।

সেই তিনটা গল্প[১] এক করে একটা বই করার permission বহুকাল পূর্ব্বেই দেওয়া আছে। আপনি ছাপিতে দেবেন। পল্লিসমাজ বই করা যদি আবশ্যক মনে করেন, ভারতবর্ষে শেষ হইয়া গেলেই সেটা ছাপিতে দিতে পারেন। অর্থাৎ আমার permission রহিলই। যদি আপনি ভাল মনে করেন (বই করিয়া প্রকাশ করিলে আপনার ক্ষতি না হয়) তা হইলে সেও আর একটা বই হইতে পারে।···

আমার ডান হাতটায় এত ব্যথা যে লেখা ভারি শক্ত। কিছুতেই আরাম হইতেছে না, ডম্বল ভাঁজিতে গিয়া এ এক কাণ্ড ঘটিল!

প্রমথর Tank Angling[২] বেশ হইয়াছে। সে ভারি খুসি, বাস্তবিক হবার কথাই ত।

এবারের ভারতবর্ষ আজও পেলাম না। আপনাদের আফিস হইতেই ভুল হইল কিম্বা এখানেই চুরি গেল। আজ পোষ্ট আফিসে একবার খোঁজ করিয়া দেখিব। কারণ ও আফিসের ভুল হওয়া সম্ভব নয়—এখানে চুরি যাওয়াই সম্ভব।

অপরাপর সম্বাদ অম্‌নি একরকম। আপনাদের কুশল মাঝে মাঝে লিখিবেন। আপনাদের—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১। বিন্দুর-ছেলে, রামের সুমতি ও পথ-নির্দেশ।

২। প্রমথনাথ ভট্টাচার্য রচিত একটি গ্রন্থ।

54, 36th Street
5. 10. 15.

প্রিয়বরেষু—আপনার পত্র পাইলাম। এই গল্পটা বেশ হওয়ার কোন আশা আমার ছিল না। কারণ প্রথম হইতেই ঠিক করিয়া বসিয়াছিলাম এ সকল বস্তু প্রবন্ধ হইলেও হইতে পারিত। আসলে এ ধরণের লেখাকে ঠিক গল্প বলাও হয়ত সকলের মত না হইতে পারে। যাক্, যদি দু'একজনেরও ভাল বোধ হয় সেও আমি আহ্লাদের কথা মনে করিব।

আপনি যেমন ইচ্ছা তেমন করিয়া ছাপিবেন। আপনার নিজের জিনিস হইলে যা করিতেন ঠিক তাই। এতে ভাল না হয় সেও আমার কপাল, ভাল হয় সেও আমার কপাল।…

হাতটা কিছুতেই ভাল হইতেছে না। মধ্যে ডান পাটাও আগাগোড়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া জয় ঢাক হইয়া উঠিয়াছিল, সেটা এখন কমিয়াছে এই যা। প্রতিমাসেই কিছু না কিছু একটা ছোট হোক্ বড় হোক্ প্রবন্ধ হোক্ ছাপিবার চেষ্টা করিব। অর্থাৎ বিশেষ চেষ্টাই করিব। যদি না পারি সেটা আমার অনিচ্ছার জন্য নয়, অক্ষমতার জন্যই হইবে না।

অন্যান্য বিষয়ে ভাল আছি। আপনাদের—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

'ভারতবর্ষ' পেলাম। প্রথমটা কে যে চুরি করিল তা বলিতে পারিনা।

আফিং ছাড়িবার চেষ্টা করিয়াই এত দুঃখ বোধকরি পাইলাম। আর ছাড়িবার নামটিও কখনো মুখে আনিব না, বেশ করিয়া পুনরায় ধরিয়া তবে পা ভাল হইল। এইবার আর একটু বেশ করিয়া ধরিলে হাতটাও ভাল হইবে আশা হয়।

আফিং কম করিয়া মাথাটা একেবারে খালি হইবার মত হইয়াছিল। আবার ধীরে ধীরে বেশ ভরিয়া আসিতেছে। কি জিনিস! আপনাদেরও খরা বোধ করি ভাল। আমি ত মনে করি সমস্ত ভদ্রলোকেরই এটা সেবন করা কর্ত্তব্য।

54, 36th Street, Rangoon 15-11-15

প্রিয়বরেষু,

আপনার পত্র যথা সময়ে পাইয়াছিলাম। জ্বর হইয়াছিল বলিয়া জবাব দিই নাই। এখন ভাল হইয়াছি। আমার বিজয়ার আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষা জানিবেন।

'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী' ১ যে সত্যই ভারতবর্ষে ছাপিবার যোগ্য আমি তাহা মনে করি নাই—এখনও করি না। তবে যদি কোথাও কেহ ছাপে এই মনে করিয়াছিলাম। বিশেষ তাহাতে গোড়াতেই যে সকল শ্লেষ ছিল সে সকল যে, কোন মতেই আপনার কাগজে স্থান পাইতে পারে না সে ত জানা কথা। তবে, অপর কোন কাগজের হয়ত সে আপত্তি না থাকিতেও পারে, এই ভরসা করিয়াছিলাম। সেই জন্যই আপনার মারফতে পাঠানো।

যদি বলেন ত আরও লিখি—আরও অনেক কথা বলিবার রহিয়াছে। তবে ব্যক্তিগত শ্লেষ বিদ্রূপ ঐ পর্য্যন্তই। তবে শেষ পর্য্যন্ত সব কথাই সত্য বলা হইবে।

১। "শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী" ১৩২২ সালে ভারতবর্ষের মাঘ সংখ্যা থেকে ছাপা শুরু হয় এবং পর বৎসর মাঘ সংখ্যা পর্যন্ত ছাপা হয়। ঐ বছর মাঘ মাসেই এই লেখাগুলি "শ্রীকান্ত" (১ম পর্ব) নাম দিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

আমার নামটা যেন কোন মতেই প্রকাশ না পায়।[১] এমন কি আপনি ছাড়া উপেনবাবু ছাড়া (তাঁর ত মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না—তা ভালই হোক মন্দই হোক্) আর কেহ না জানে ত বেশ হয়। ওটা কি? অবশ্য শ্রীকান্তর আত্মকাহিনীর সঙ্গে কতকটা সম্বন্ধ ত থাকিবেই তাছাড়া ওটা ভ্রমণই বটে। তবে 'আমি' 'আমি' নেই। অমুকের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করিয়াছি, অমুকের গা ঘেঁসিয়া বসিয়াছি—এসব নেই। বাস্তবিক 'তিনমাস' যে ত্রিশ বচ্ছরের ধাক্কা লইবার উপক্রম করিল।[২] অথচ কি নীরস! কি কটু! আপনি দুঃখিত হবেন না—এইটা শুধু আমার নয় অনেকেরই মত। মহারাজের[৩] ওটায় ত এর শতভাগের একভাগও আত্মম্ভরিতা নেই। তাতে 'আমি'ও যেমন আছে, 'তুমি'ও তেমনি আছে—'ওরা' 'তারা'ও বাদ যায় নাই। রবিবাবু নিজের আত্মকাহিনী লিখিয়াছেন, কিন্তু নিজেকে কেমন করিয়াই না সকলের পিছনে ফেলিবার সফল চেষ্টা করিয়াছেন। যাহারা লিখিতে জানে না, অর্থাৎ যাহাদের লেখার পরখ হয় নাই, অ তাহারা যত বড় লোকই হোক, না জানিয়া তাহাদের দীর্ঘ লেখা ছাপিবার অনেক দুঃখ। ইহারা মনে করে সব কথাই বুঝি বলা চাইই। যা দেখে, যা শোনে, যা হয়, মনে করে সমস্তই লোককে দেখানো শোনানো দরকার। যারা ছবি আঁকিতে জানে না, তারা

১। শরৎচন্দ্র ভারতবর্ষে 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী' প্রথমে ছদ্মনামে প্রকাশ করেছিলেন।

২। দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী লিখিত "য়ুরোপে তিন মাস।" তিন মাসের কাহিনী বহু মাস ধরে প্রকাশিত হচ্ছিল বলে শরৎচন্দ্র এই কথা বলেছিলেন।

৩। বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চন্দ্ মহাতাবও এই সময় ভারতবর্ষে "আমার য়ুরোপ ভ্রমণ" লিখছিলেন।

যেমন তুলি হাতে করিয়া মনে করে যা চোখের সামনে দেখি সবই আঁকিয়া ফেলি। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সে-ই শেষে টের পায়, না তা নয়। অনেক বড় জিনিষ বাদ দিতে হয়, অনেক বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে হয়—তবে ছবি হয়। বলা বা আঁকার চেয়ে না বলা, না আঁকা ঢের শক্ত। অনেক আত্মসংযম অনেক লোভ দমন করিতে হয়, তবেই সত্যিকারের বলা এবং আঁকা হয়।

বাঃ এ যে আপনাকেই লেকচার দিচ্ছি! মাপ করবেন—এ সব আমার চেয়ে আপনি নিজেই ঢের বেশি জানেন—সে আমি খুব জানি। যাই হোক্ শ্রীকান্ত পড়ে লোকে কি রকম ছি ছি করে দয়া করে আমাকে জানাবেন। ততদিন শ্রীকান্ত একটি ছত্রও আর লিখ্‌বে না।

আমি আবার একটা গল্প লিখচি। অর্থাৎ শেষ করব বলে লিখচি। ভালই হবে। Comedy হবে Tragedy নয়। কত শীঘ্র শেষ হয়।

এ গল্পটা গোরার পরেশবাবুর ভাব নেওয়া। অর্থাৎ নিজেদের কাছে বলতে অনুকরণ। তবে ধরবার জো নেই। সামাজিক পারিবারিক গল্প। আমার ত মনে মনে বড় উৎসাহ হয়েচে যে চমৎকার হবে। তবে কি থেকে যে কি হয়ে যাবে বলবার যো নেই।

প্রমথ চলে গেছে কি? আমি অনেকদিন তার চিঠি পাই নি। সে যে ভাল হচ্চে, এই আমাদের ভাগ্য।[১] বাস্তবিক, সত্য কথা বলতে

১। প্রমথবাবু ছত্রপুরে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য গিয়ে প্রথমদিকে কিছুদিন একটু সুস্থ থাকলেও ক্রমে তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তিনি ছত্রপুর ছেড়ে যুক্তপ্রদেশের ভাওয়ালী সেনিটোরিয়ামে যান। এখানে এসে স্বাস্থ্যের উন্নতি ত দূরের কথা, বরং তাঁর স্বাস্থ্য দিন দিন খারাপের দিকেই যেতে থাকে এবং এখানে আসার মাত্র চার মাস পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে প্রমথবাবুর আর্থিক দুরবস্থার কথা জানতে পেরে শরৎচন্দ্র তাঁর "কাশীনাথ" বইখানির গ্রন্থস্বত্ব বাল্যবন্ধু প্রমথনাথকে দান করেছিলেন।

অমন বন্ধু আর হয় না। বন্ধু বলতে ত এই! ও যদি না বাঁচে আমার ত মনে হয় আমার 'বন্ধু'র দিকটা যথার্থই খালি পড়ে যাবে।

আপনার পিসীঠাকুরের খবর কি? কেমন আছেন আজকাল? আচ্ছা 'যমুনা' আজকাল কি চলে? ফণী নাকি বই ছাপিয়েচে? সে বলুক আপনার এক একটা গল্প আমি ৩০।৪০ বার পড়ে মুখস্থ করে ফেলি। আপনার লেখাই আমার আদর্শ। অথচ এমনি গুরুভক্তি যে একখানা বইও পাঠালে না। আমি তার সব লেখাই পড়েচি এবং সে সব লেখা যে কি সে ত আমার চেয়ে আর কেউ বেশি জানে না।

অবশ্য নানা কারণে আমিও তার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখি নাই।[১] যাক্ পর চর্চ্চায় কাজ নেই।

হরিদাসবাবু শরৎচন্দ্রের এই দানের কথা প্রমথবাবুকে জানালে, প্রমথবাবু তখন হরিদাসবাবুকে লিখেছিলেন—"প্রিয়বরেষু—হরিভাই, কাল সন্ধ্যায় তোমার পত্র পাইয়া অবধি আমি কি পর্য্যন্ত যে আত্মহারা হইয়া আছি, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা সম্ভব নহে।... জীবনে এরূপ সহানুভূতি ও সাহায্য পাইতে কখনও অভ্যস্ত নহি, আর আমাকে কিসের জন্য কি যোগ্যতার জন্যই বা লোকে দিবে। এখন দেখিতেছি অযোগ্যতাও একটা বিশেষ গুণ। শরতের সব কার্যই বিচিত্র—যেদিন হইতে তাহার সহিত আলাপ হইয়াছে, সেইদিন হইতে ইহাই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। তাহার কার্য তাহাকেই সাজে—তাহার তুলনা নেই। এ অপ্রত্যাশিত অনন্যভূত সহানুভূতি পাইবার আমি ত ভাই কোনো হিসেবেই যোগ্য নই।...শরতের কাণ্ড! পৃথিবীটা আমার কাছে নূতন করিয়া তুলিয়াছে। শরৎকে আর কি বলিব, সে দেবতা।...আমি আজন্ম পরিশ্রম করিয়া আমার পরিবারবর্গের ভবিষ্যতের জন্য যাহা করিতে পারি নাই আজ তোমরা তাহা করিলে।...তোমাদের কোটী কোটী নমস্কার—তোমরা এখন আমার অনেক উচ্চে, তোমরা—দাতা আমি গৃহিতা।"

১। শরৎচন্দ্র যমুনায় নিয়মিত লিখতে থাকলেও এবং যমুনার প্রতি সতিকার দরদী হলেও, তিনি 'ভারতবর্ষে'ও লিখতেন বলে, ফণিবাবু সব সময়েই ভাবতেন শরৎচন্দ্র

গতমাসের 'ভারতবর্ষ' তেমন ভাল হয় নাই। সমস্তই মেয়েদের লেখা—নতুন কাণ্ড বটে কিন্তু worth হিসাবে অন্যান্য বারের চেয়ে নীচে। সে ত হবারই কথা। কিন্তু একটা কাজ হয়েচে—file অনেকটা clear হয়েচে, না?

আপনি আমাকে 'চৈতন্য চরিতামৃত' পড়িতে দিয়াছিলেন—সেগুলি আমি ফিরাইয়া দিই নাই—আসিবার সময় মনেই হয় নাই—তারপরে সেগুলি এখানে চলিয়া আসিয়াছে। পুলিশে ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া তাহাদের (আমার সব বইগুলিরই) এমন অবস্থা করিয়া দিয়াছে যে বিক্রী হওয়া শক্ত। মলাটে কিসের দাগ লাগিয়াছে—এগুলির অনেক দাম এবং পরের বই—আমি অতিশয় লজ্জিত হইয়া আছি কিন্তু কোন রকম উপায়ও দেখি না। এ ছাড়া আরও অনেকগুলি বৈষ্ণবগ্রন্থ পড়িতে দিয়াছিলেন। সমস্ত বইগুলি যে কতবার পড়িয়াছি (এমন কি রোজই প্রায় পড়ি) তা বলিতে পারি না। এগুলিও ফিরাইয়া দিবার কথা ছিল। আপনাকে অনেক রকমেই ত ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছি, তাই হঠাৎ এগুলির দাম বলিয়া দিতেও ইচ্ছা হয় না। বইগুলি বরং আমাকে

হয়ত বা তাঁর ছোট কাগজে আর লিখবেন না। তাই তিনি যমুনার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সম্পর্ক আরও দৃঢ় করবার জন্য ১৩২১ সালে এক সময় যমুনার অন্যতর সম্পাদক হিসাবে শরৎচন্দ্রের নামও ছেপেছিলেন। শরৎচন্দ্র এই সময় যমুনার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম দরদ আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে—ফণিবাবুকে এই আশ্বাস বার বার দেওয়া সত্ত্বেও, ফণিবাবুর এই সন্দিগ্ধ স্বভাবের জন্যই শরৎচন্দ্র তাঁর উপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি এতখানি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, যমুনায় তখন তাঁর চরিত্রহীন ছাপা হতে থাকলেও, যমুনায় চরিত্রহীন অসমাপ্ত রেখেই যমুনার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছিলেন এবং শরৎচন্দ্র এর পর থেকে তাঁর সকল রচনাই কেবল ভারতবর্ষেই ছাপাতে শুরু করেছিলেন।

দান করুন। আমি অনেক আশীর্ব্বাদ করিব। এবং ভবিষ্যতেও প্রত্যহ এই কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া লজ্জা পাইব না।

উপেনবাবু জলধরদাকে আমার কথাটা স্মরণ করাইয়া দিবেন। বহুকাল পূর্ব্বে জলধরদার একখানি চিঠি পাইয়াছিলাম কিন্তু তাহার জবাব দিয়াছিলাম কিনা মনে হয় না। যাই হোক্ সেজন্য তিনি পথ চাহিয়াও নাই তাও জনি।

আপনাদেরই

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

54, 36th Street. Rangoon 7-12-15

প্রিয়বরেষু,

আপনার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। বৈষ্ণব বইগুলি সম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়াছেন সে আপনার উদারতা। আমি ত সম্মত হইবই।

নূতন গল্পটা আশা করি ঠিক সময়েই পাঠাইতে পারিব। তা যদি না পারি একটা ছোট গল্প পাঠাইয়া দিব। কারণ, অসম্পূর্ণ গল্প আপনাকে আমিও পাঠাইতে চাহি না এবং তাহা সম্পূর্ণ হইবার ভরসায় ছাপাইতে বলিতেও আমি পারি না। তবে চন্দরকান্তের কাহিনী স্বতন্ত্র। এ সম্বন্ধে একটা কথা যদি নির্ভয় দেন ত বলি। এই কাহিনীটাকে সম্পাদক মহাশয়রা দয়া করিয়া যেন নেহাৎ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করেন। আমার বড় আশা আছে—ইহা অন্ততঃ যে সকল লেখা ছাপা হয় এবং হইয়াছেও তাহাদের নিতান্ত নীচের আসনের যোগ্যও নয়। অনেক সামাজিক ইতিহাস ইহার ভবিষ্যৎ জঠরে প্রচ্ছন্ন আছে। আমার অনেক চেষ্টা ও যত্নের জিনিস অন্ততঃ বন্ধুবান্ধবদের কাছেও একটু খাতির পাইবার মত হইবেই। প্রথমটা অবশ্য খুবই খারাপ—তা

অনেক সত্যকার ভাল জিনিসেরও প্রথমটা মন্দ—এমন দেখাও যায় ত। এই আমার কৈফিয়ৎ। এবার ছাপা হবে কি? হাতের লেখা ছাপার অক্ষরে দেখার আশাতেই ওটা দেওয়া সে ত ভূমিকাতেই লেখা আছে।

শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ সরকার?[১] স্বাক্ষরিত একটা ভ্রমণ 'সমুদ্রবক্ষে' নাকি অনেক দিন হইতে আপনাদের fileএ পড়ে আছে। আমারও যেন স্মরণ হয় সেটা দেখেচি। তিনি ক্রমাগতই আমার কাছে সেটা চাইচেন। তিনি বলেন আপনাকে চিঠি লিখিয়া কোন জবাব পান নাই। সেটা যদি একটু খোঁজ করিয়ে পাঠিয়ে দেন ত ভাল হয়। তাঁর বিশ্বাস সেটা খুব ভাল (অবশ্য আমি পড়িনি) তাই সেটা ফিরিয়ে নিয়ে আর কোন কাগজে পাঠালে হয়ত ছাপা হতেও পারে। এই জন্যই না কি তাঁর লেখাটিতে এত প্রয়োজন।

আর একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। একটু চিন্তা করে যদি এই প্রশ্নটির জবাব দেন বড় উপকার করা হয়। এবার যখন পত্র লিখিবেন তখন এই কথাটির অতি অবশ্য জবাব দিবেন অনুরোধ করিতেছি। আমার বই যে কিরূপ বাজারে চলে এবং বিক্রী হয় আজও পর্য্যন্ত আমি তার কিছুই জানি না। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, আমার ৬ খানা বই (নভেল) ধরুন গড়ে দাম ১।০, যদি ছাপা হয়ে বিক্রী হবার জন্য প্রস্তুত থাকে তাহাতে অন্য সব

১। রেঙ্গুনে থাকার সময় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন ছেড়ে চলে এলে, ইনি পরে রেঙ্গুন থেকে কলকাতার "বাঁশরী" নামক মাসিক পত্রিকায় ১৩৩৩ ও ৩৪ সালে "ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র" নামে ধারাবাহিকভাবে কয়েকমাস লিখেছিলেন।

খরচ বাদে আমাকে দোকানদার যদি ২০৲ টাকা মাসে দেন—সেটা কি তাঁর খুব দুঃসাহস? এতে ভবিষ্যতে তাঁর কি খুব লোকসান হবার সম্ভাবনা?

অপরাপর কথা পরে লিখিব। Mailএর আর দেরি নাই।

আপনার—শরৎ

54, 36th Street. Rangoon

25. 12. 15.

করকমলেষু,

এবারকার ভারতবর্ষ চমৎকার হইয়াছে। আমি নিজে ত পড়িবার জিনিস অনেক পাইলাম। আচ্ছা, একটা কথা—'জড় জগৎ'[১] সম্বন্ধে যদি কেউ কিছু প্রতিবাদ করে, ধরুন আমার দিদিকে দিয়া যদি কিছু লিখাইয়া লই; আপনারা সে প্রতিবাদ কি ছাপিবেন। অবশ্য আপনারা নিশ্চয়ই তাহার সঙ্গতি অসঙ্গতি বিবেচনা করার পর। [Symbol অর্থাৎ কল্পনা প্রতিমা খাড়া করিয়াই কাজ চলিতেছে (একটা উদাহরণের মত উল্লেখ করিলাম) জর্ম্মাণির সকল পণ্ডিতই ত তা মানে নাই। তাদের মতামতটারও ত একটু মূল্য আছে। তাছাড়া হেল্‌ম্ হোজ কি শুধু Standard সম্বন্ধে ঐ বলিয়াই শেষ করিয়াছেন? তখন সবাই মানিয়া লইয়াছিল কি? আপনিই বলুন না? আর এটা ত শুধু পদার্থ বিদ্যার—Philosophy of Science.]

পল্লি কাহিনী না সমাজ? কি এটা। এবার ছাপার বোধ করি বেশি ভুল আছে। শেষটা পাঠাচ্ছি। গত মাসে তেমন ভুল ছিল না। এক জায়গায় মনে আছে "আরক্ত" না হয়ে রক্তাক্ত ছাপা আছে।

বড় তাড়াতাড়ি মেল close হয় হয়।—শরৎ

১। ঐ সময়কার ভারতবর্ষে প্রকাশিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর একটি প্রবন্ধ

54, 36th Street, Rangoon

করকমলেষু,

ভায়া, আমি যে চিঠি লিখেছিলাম, তা কি হাতে পড়ে নি? মায়ের[১] বিবাহ সময়ে ত উপস্থিত হইবার ত সৌভাগ্য ছিল না, যাই কি করে? আচ্ছা প্রমথর খবর কি? সে আমার চিঠির কোন জবাব দেয় না, আপনাদের মুখেও তার খবর পাই না।

আমি এক রকম বড় পীড়ায় শয্যাগত। হাঁটুর নীচে থেকে (ডান পা) পায়ের নখ পর্য্যন্ত ফুলে পড়েচে। এখানকার ডাক্তারেরা ঠিক বলতে পারে না কেন? তবে আজ কাল ঢের কমেচে, অথচ জ্বালা যন্ত্রণা নেই—খাই দাই লিখি পড়ি ঘুমাই—শুধু উঠ্‌তে হাঁটুতেই পারিনে। কি জানি এ সারবে কি আবার কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য যেতে হবে। তবে আজ দুদিন থেকে যে রকম কম্‌চে মনে হচ্ছে হয়ত আর আফিস যেতে বেশি দেরি হবে না। দেখি কি হয়?

আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি মায়ের বিবাহ যেখানে গত বৎসরের আগে থেকে স্থির হয়ে ছিল সেই ঘরেই ত! তা যদি হয় সাংসারিক যা কিছু দেখে বাপ-মা দেয় সমস্তই পরিপূর্ণভাবে আছে। এখন শুধু জগদীশ্বরের কৃপায়—মা আমার বুড়া বয়স পর্য্যন্ত সিঁদুর ও নোয়া নিয়ে পুত্র পৌত্র নিয়ে থাকুন এই আমার হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ।

পল্লীসমাজের সম্বন্ধে কোন কথাই আমার বলবার নেই। নির্ভুলও হয়েচে বাহ্যব্যাপারও সকলেরই মনোমত হয়েচে। ইহাতে লাভ লোকসান আপনার অদৃষ্টে যাই ঘটুক—আমার মনের ইচ্ছা লোকে

১। হরিদাসবাবুর কন্যা শ্রীলাবণ্য দেবী।

(পাড়া গাঁয়ের কথায়) মানে যেন। এই বইখানিতে একটা মূল কথাই (বিবাহের কথাটাই) বলা হয় নি। ইচ্ছা করি এই কথাটি আর একখানা বইএ বলি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এখানে পল্লীসমাজ সম্বন্ধে লোকে নিন্দা অখ্যাতি করে নাই—সেই আমার লাভ—কলিকাতায় লোকে এ বইখানিকে কিভাবে নিলে সেটা আমি জানি না। বিরুদ্ধ মত কেউ বলে কি? অবশ্য ত্রুটির কথা আমি বলিনে—সে ঢের আছে—শুধু মোটামুটির কথা।

একটা প্রার্থনা আছে। একখণ্ড 'মনু' একটু ভাল edition (অর্থাৎ note টোট্ আছে) যদি পাঠিয়ে দেন আমার এই 'সমাজের মূল্য' [১] লিখতে একটু সুবিধে হয়। বইখানা আমার নেই। অবশ্য আরও কত কি ref. চাই কিন্তু এ পোড়া দেশে ত মেলবার যো নেই। মনে যা আছে তার উপরেই বারো আনা নির্ভর। আবার স্মরণ শক্তিও আমার ভারি ভারি কম।

এখান থেকে যা হবার হবে—কলিকাতায় গিয়ে এর দ্বিতীয় part লিখব।

আর না। আমার কোটী কোটী আশীর্ব্বাদ জানিবেন—এইবার সত্যই বুড়া হইলাম ভাই—চল্লিশের উদিকে যে পা দিলাম তা বেশ টের পাচ্ছি। এখন আমরা বুড়ার দল যেন আমার মত মনের সঙ্গে আপনাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করতে পারি—আমি নিজের ও পরের সম্বন্ধে ভগবানের কাছে এই ভিক্ষা করি।

আঃ শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১। সমাজ-ধর্ম্মের মূল্য। এই লেখাটি ১৩২৩ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছিল।

54, 36th street
Rangoon.

করকমলেষু,

আপনার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। "মেজদিদি"[১] চমৎকার ছাপা হইয়াছে। চমৎকার কাগজ এবং ছাপা। সে ত হইয়াছে কিন্তু এই অভাগীর ছাপা এবং কাগজ বাঁধাই আশ্চর্য্য শস্তা। এখানকার অনেকেই বিশ্বাস করিতে পারে না আপনার লাভ কি থাকিতে পারে। বই যাই হোক্ শুধু শস্তার জন্যও যে ইহা বেশি বিক্রী হইবে তাহা বুঝা যায়। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন—ইহাতে দুপক্ষেরই উপকার, ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও।...

আপনার কাজ আপনার দোকান প্রমথ বোধ করি নিজের বলিয়াই মনে করে। আমিও তাই করিতেছি। আপনার অনেক সুনাম বদনাম দুই শুনিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আপনার বিশেষ শত্রুও কোনদিন বলে নাই, হরিদাসবাবু টাকা কড়ি এবং ব্যবসা সম্বন্ধে "জোচ্চোর"। সেটা সবাই স্বীকার করে লোকটা অতিশয় ধূর্ত্ত বটে, পাকা ব্যবসাদার বটে, কিন্তু পরের জিনিস পরের পয়সা ঠকাইয়া কোন দিন লয় না। অথচ এই দোষ দেওয়াটা যে কত সহজ সে আমি জানি। এ দোষ যখন আপনার কেহই কোন দিন দেয় নাই, শত্রুরাও যখন আপনাকে টাকা কড়ি সম্বন্ধে বিশ্বাস করে এবং বলে

১। "মেজদিদি" ১৩২২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে মেজদিদি, দর্পচূর্ণ ও আঁধারে আলো এই তিনটি গল্প আছে। গল্পগুলি ১৩২১ সালের ভারতবর্ষে যথাক্রমে কার্ত্তিক, মাঘ ও ভাদ্র সংখ্যার প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

হরিদাস কাহারও যথার্থ প্রাপ্য আত্মসাৎ করে না, তখন আমি বন্ধু হইয়া ত অকুণ্ঠিত চিত্তে বিশ্বাস করিবই।

যাই হোক্ আমার সমস্ত ভারই আপনার। যা ইচ্ছা তাই করিবেন। আপনার মত না লইয়া ত কোন দিনই আমি আর কোন কাজ করিব না। আমার বই আপনার নিজের বলিয়া যেমন করিয়া এবং যা করিয়া হোক্ প্রকাশ করিবেন। যদি তাহাতে কখন মন্দও হয়—মনে করিব হরিদাসবাবু পাকা ব্যবসাদার হইয়াও একটা ভুল করিয়া ফেলিয়াছে, calculation ঠিক রাখিতে পারে নাই। এই পর্য্যন্ত। আমি নিশ্চয় জানিয়াছি—আপনি খাঁটি লোক। পুরুষ মানুষের পক্ষে এর চেয়ে সুনাম আর আছে কি না জানি না। আমিও আশীর্ব্বাদ করি—আপনার আর যা কিছু সুনাম দুর্নাম হৌক এ কথাটা যেন চিরদিন সবাই স্বীকার করে লোকটা খাঁটি লোক ছিল। যাই হৌক আমার লেখা বইয়ের সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আর কোনরূপ আলোচনা হইবার আবশ্যক পর্য্যন্ত নাই।

একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবার আছে। এখানে আমার একটি বন্ধু এই লড়াই সম্বন্ধে একখানা প্রসিদ্ধ বইএর ভাব লইয়া একখানা নভেল লিখিয়াছে। আমি দেখিয়াছি, ইহাতে দূষ্য কিছু নাইই। বরঞ্চ আমাদের মহামহিম ব্রিটিশরাজ সম্বন্ধে একজন যথার্থ রাজভক্ত লোক যেমন করিয়া লিখিতে পারে তাহাই করিয়া লিখিয়াছে। দোষ গুণ সমস্ত রাজ শাসনেরই আছে, কিন্তু বাস্তবিক আমাদের রাজা যে পরের বিপদ নিজের মাথায় লইয়া এই যুদ্ধে এতটা স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছেন। শুধু পরকে বাঁচাইবার জন্য ক্ষুদ্র রাজ্যকে অন্যায়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্যই বাধ্য হইয়া এই যুদ্ধে হাত দিয়াছেন সম্বন্ধে বোধ করি কোন মানুষেরই কোন সন্দেহ নাই।—সে সেই কথাই

বেলজিয়মের লড়াই লইয়া লিখিয়াছে। বইখানি ভালই হইয়াছে। এক সম্প্রদায়ের লোক যাহারা এই সব কাহিনী ভালবাসে, তাহাদের বোধ করি বিশেষ রকম ভাল লাগিবারই কথা। অথচ নভেলে যাহা থাকা উচিত এবং যা লইয়া নভেল হয় তাহাও আছে। এই আট আনা সিরিসের করিয়া কি ছাপান যায় না? ইচ্ছা হয় আপনাকে পাঠাইয়া দিই, পড়িয়া যদি সঙ্গত এবং নির্দ্দোষ মনে করেন তাহা হইলে প্রকাশ করিলে তাহার বড় উপকার করাই হয়, কি বলেন? পাঠাব? এ রকমের বই চলবে কি? কথার জবাবটা ব্যবসার দিক দিয়াই দিবেন। আমি অনুরোধ আপনাকে করিতেছি না, এবং ব্যবসা সম্বন্ধে আপনি যে কাহারও অনুরোধ রাখিতে বাধ্য নহেন তাহাও জানি। এবং ইহাও জানি আমার কাছে যাহাতে দোষ নাই, হয়ত তাহাতে সত্যকার দোষ আছে। বিশেষতঃ এ সকল ধরণের বই বিশেষ চিন্তা করিয়াই প্রকাশ করা উচিত।

একটা নিরপেক্ষ উত্তর দিবেন। কারণ দোষ থাকিলে সকল পক্ষেরই ইহাতে অমঙ্গল।

যা ভাল বোঝেন বলিবেন। অপরাপর সম্বাদ পরে জানাইব।

আপনাদের—

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হাঁ, আমার ছবিটা বোধ করি না ছাপালেই হ'ত। কি রকম যেন লজ্জা করে। যে চেহারা!

54, 36th Street. Rangoon.
22-2-16.

করকমলেষু,

অনেক দিন আপনার পত্র পাই নাই। আশা করি সমস্ত ভাল। ভায়া আমি এবার বড়ই পড়িয়াছি। সুদূর হইতে প্রমথ ভায়ার বাতাস লাগিল[১] না কি হইল বুঝিতে পারিতেছি না। এ আবার আরও খারাপ। এ শুনি বর্ম্মা দেশের ব্যারাম—দেশ না ছাড়িলে কোন দিন এও ছাড়ে না। তাই দুয়ের এক বোধ করি অনিবার্য হইয়া উঠিতেছে। কি জানি, ভগবানই জানেন। ভয় হয়, হয়ত বা চির জীবন পঙ্গু হইয়াই বা যাইব। এই সম্ভাবনা মনে করিতেও যেন পারি না। যাহাকে যথার্থই বলে ভয়ে 'পেটের ভাত চাল' হইয়া যাওয়া, আমার তাই হইয়াছে। সুতরাং Dispepsiaও ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। হইবার কথাও বটে। কারণ, খাও দাও, স্নান কর, লেখাপড়া কর কিন্তু চলিয়া বেড়াইবার বিশেষ ক্ষমতা না থাকিলে হজম হওয়াও বন্ধ হইয়া আসে। ডান পায়ের হাঁটুর নীচে হইতে পায়ের আঙ্গুল পর্য্যন্ত সে এক প্রকাণ্ড কাণ্ড! অথচ গোদ নয়—কি যে ডাক্তারেরা তাহাও বলিতে পারে না—কতদিনে সারিবে কিম্বা কোন দিন সারিবে কিনা এ খবরও তাঁরা দিতে পারেন না। দুদিন বা কিছু কমে দুদিন বা ঠিক তেমনি হইয়া দাঁড়ায়। গতবারে যখন লিখি, তখন এইরূপ কমিবার মুখে আসিতেছিল বলিয়া খুব একটা আশা হইয়াছিল, কিন্তু তার পরেই আবার যখন ধীরে ধীরে তেমনি হইয়া উঠিতে লাগিল তখন আশা ভরসা সব গেল। এই মানসিক চঞ্চলতা বশতঃ কিছুই কাজ করিতে ইচ্ছা হয় নাই। এই কথাটি জলধর

১। ১২৫ পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

দাদাকে জানাইয়া এই "সমাজ ধর্ম্মের মূল্য" পড়িতে দিবেন। ইহার fair copy করা এইটুকু মাত্র পারিয়াছিলাম—বাকি লেখাটা fair করিয়া পরে পাঠাইতেছি। তারপর যাহা লিখিব মনে করিয়াছি তাহা শুদ্ধ মাত্র অপরাপর দেশের সামাজিক নিয়ম কানুনের সহিত আমাদের দেশের সমাজের একটা তুলনামূলক সমালোচনা ছাড়া আর কিছু না, সুতরাং সেদিকে কোনরূপ ব্যক্তিগত সমালোচনার ভয় নাই। জানি না এ প্রবন্ধ ভারতবর্ষে ছাপাইবার তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে কি না, কিন্তু যদি না হয়, এটা আপনি ফেরৎ পাঠাইবেন, আমি ধীরে ধীরে সমস্তটা লিখিয়া একটা পুস্তকের মত করিয়া রাখিব। এবং ভবিষ্যতে ইহার ব্যক্তিগত অংশগুলি বাদ দিয়া ছাপাইবার চেষ্টা করিব। বাস্তবিক ভায়া এই Sociology লইয়াই বহুদিন কাটাইয়াছি—অনেক কথা বলিবার জন্য প্রাণটা যেন আনচান্ করে। অথচ, কি করিয়া যে এ সকল বেশ ভদ্র লোকের মত বলা যায় তাও ঠিক করিতে পারি না।

আপনি যদি এইটুকুর শেষ দিকটা একবার পড়িয়া দেখিতে পারেন আর Suggest করিয়া দিতে পারেন যে কি করিয়া কোন অংশ পরিবর্ত্তন করিলে কাহারও গায়ে লাগিবে না, অথচ, সব কথাগুলি বলাও যাইতে পারিবে, আমি সেইরূপ করিবার একটা চেষ্টা করিব। তবে আরও যেটুকু লেখা আছে, সেটুকু পাঠাইবার পরেই মতামত দিবেন। জলধরদাকে অনেক আশা দিয়াছিলাম কিন্তু গল্প লেখা মানসিক সুস্থিরতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যদি অদৃষ্ট আমার চিরকালের মত ভাঙিয়াও থাকে তাহাও যদি ঠিক জানিতে পারি তাহা হইলেও ধীরে ধীরে এই মহা দুঃখ বোধ করি সহিয়া যাইবে। হয়ত বা তখন এই পঙ্গু হওয়াটাকেই ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলিয়া মনেও করিব এবং স্থিরচিত্তে গ্রহণ করিতেও পারিব। আমার এই কাঠির মত শরীরে এইরূপ একটা ব্যামো যে কখনও

সম্ভব হইতে পারিবে তাহাও মনে করি নাই। আর তাই যদি হয়—হয়ত বা শেষে ইহারই আঁমার আবশ্যকতা ছিল! ছেলেবেলায় ভগবানকে বড় ভালবাসিতাম—মাঝে বোধ করি সম্পূর্ণ হারাইয়া ছিলাম, আবার শেষ বয়সে যদি তিনিই দেখা দিতে আসেন—তাই ভাল।

মনের অস্থিরতায় অনেক বাজে কথা লিখিয়া ফেলিলাম। মাপ করিয়া চিঠিখানি পড়িবেন এই ভরসা।

আর একবার প্রমথ ভায়ার খবরটা মনে করিয়া আমাকে জানাইবেন।

আপনাকে আন্তরিক শত সহস্র আশীর্ব্বাদ করিলাম।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জলধরদাকে বলিবেন—যাহা আরম্ভ করিয়াছি অর্থাৎ 'শ্রীকান্ত' শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত হঠাৎ বন্ধ কিছুতেই হইবে না।

54, 36th Street, Rangoon

প্রিয়বরেষু,

আপনার পত্র পাইয়াছি। কিন্তু আজকাল সপ্তাহে মাত্র একখানি করিয়া জাহাজ যায় বলিয়া জবাবে এত দেরি হইল।

আমার অসুখের কথা শুনিয়া আপনি যাহা লিখিয়াছেন, আমি বোধ করি তাহা কল্পনা করিতেও ভরসা করিতাম না। অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘজীবী এবং চিরসুখী হোন। ভগবান আপনাকে কখনো যেন কোন বিশেষ দুঃখ না দেন।

আমি পীড়িত—এখানে সারিবে বলিয়া আর ভরসা করি না। দেহের আর সমস্ত বজায় রাখিয়াও জগদীশ্বর আমাকে যদি পঙ্গু করিয়াই শান্তি দেন—তাই ভাল। মাঝে মাঝে মনে করি, বোধ করি আমার চলিয়া বেড়ানো শেষ হইয়াছে বলিয়াই তিনি পা দুটা বন্ধ করিয়া এবার শুধু

হাত দিয়া কাজ করিতেই বলেন। তবে এর একটা দোষ এই যে হজম করিবার শক্তিও নাশ হইয়া আসিতে থাকে। এইটাই কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিয়া পোষাইয়া লওয়া চাই।

আপনি আমাকে যাহা দান করিতে চাহিয়াছেন,[১] সেই আমার যথেষ্ট। এই এক বৎসরের মধ্যে যদি মরিয়া না যাই, তাহা হইলে হয়ত বা টাকা কড়ির দেনাটা শোধ হইতেও পারে—অবশ্য কৃতজ্ঞতার দেনা ত শোধ হইবার নয়।

আর যদি মরি—আপনাকে write off করিতেই হইবে। আমি এক বৎসরের ছুটি লইয়াই যাইব। যে মেলের টিকিট পাইতে পারিব তাহাতেই চলিয়া যাইবার আন্তরিক বাসনা।

আমার এখানে কত টাকা চাই, আপনি সহস্রবার ভরসা দেওয়া সত্ত্বেও আমার সঙ্কোচ হইতেছে—অথচ আপনি ছাড়া আমার আপনার

১। শরৎচন্দ্রের এই দুঃসময়ে হরিদাসবাবু তাঁকে মাসে ১০০৲ টাকা করে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য শরৎচন্দ্রকে তাড়াতাড়ি ব্রহ্মদেশ ছেড়ে চলে আসবার জন্যও বিশেষভাবে জানিয়েছিলেন। হরিদাসবাবু শরৎচন্দ্রকে মাসে মাসে যে ১০০৲ টাকা করে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন, তার মধ্যে থেকে শরৎচন্দ্রকে ৫০৲ টাকা দিতেন, ভারতবর্ষের লেখক বলে। অবশ্য এই ৫০৲ টাকার জন্য তাঁকে যে প্রতি মাসেই ভারতবর্ষে লেখা দিতে হ'ত তা নয়। যে মাসে তিনি লেখা দিতেন না, সে মাসেও তিনি নিয়মিত টাকা পেতেন। হরিদাসবাবু এই ১০০৲ টাকার আর বাকি ৫০৲ টাকা দিতেন, তাঁদেরই "গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স" নামক পুস্তকালয় হতে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের গ্রন্থসমূহের হিসাব থেকে। এই সময় শরৎচন্দ্রের পুস্তকের সংখ্যা অত্যন্ত কম, আর আয়ও তেমন বেশি না হলেও, হরিদাসবাবু শরৎচন্দ্রকে তাঁর পুস্তকের হিসাবে মাসে মাসে অগ্রিম ৫০৲ টাকা করে দিয়ে যেতেন। পরে শরৎচন্দ্রের পুস্তকের আয় বাড়লে, পুস্তকের হিসাবে অগ্রিম নেওয়া এই টাকা এবং রেঙ্গুন থেকে আসার সময় হরিদাসবাবুর প্রেরিত ৩০০৲ টাকা সমস্তই শোধ হয়ে গিয়েছিল।

কেহও নাই। আপনি আমাকে ৩০০৲ তিনশ' টাকা পাঠাইয়া দিবেন, তাহা হইলেই বেশ যাইতে পারি। যা কিছু নিজের সঞ্চিত ছিল—এই দুই মাসের অসুখে সব ত গিয়াছেই বরং কিছু ওদিকেও হেলিয়াছে। আমি কিছুই আপনার কাছে গোপন করিতে চাইনা বলিয়াই এরূপ লিখিলাম, তবে উচিত অনুচিত বলিয়া একটা কথা আছে। নিজের দরকার এবং গরজে আপনার দয়ার উপরেই জুলুম করিতেছি বলিয়াও মনে হইতেছে। সেইজন্য যদি মনে করেন এত দেওয়া উচিত নয়, যা ভাল বিবেচনা করিবেন পাঠাইবেন। আমি তাহাই কৃতজ্ঞতার সহিত লইব। T. M. O. করিয়া দিবেন। না হইলে অনেক দেরি হইবে।

জলধরদা একটা গল্প অতি অবশ্য চাহিয়াছিলেন। লিখিয়াছিও কিন্তু এত কাটাকুটি হইয়াছে যে হয়ত ছাপা শক্ত। এম্‌নিই পাঠাইতাম যদি আগে মেল থাকিত, কিন্তু এখন এই সঙ্গে পাঠানর কোন মূল্য নাই, তাই যায়গায় যায়গায় (যে গুলা অত্যন্ত কাটাকুটি) শুধরাইয়া পরের মেলেই অপর সব লেখার সঙ্গেই পাঠাইব।

এই হতভাগা স্থানটা পরিত্যাগ করিয়া—আপনার আমার জন্য এই সমস্ত অতিরিক্ত আর্থিক ক্ষতির যদি কতকটা কমাইয়া আনিতে পারি—এই একটা বৎসর সেই চেষ্টাই করিব।

আমি একটু ভাল আছি। ফোলাটা একটু কম। কবিরাজী তেল মালিশ করিয়া দেখিতেছি। এটা ভাল কি মন্দ আগামী পূর্ণিমা নাগাদ টের পাইব। আমার কোটী কোটী আশীর্ব্বাদ জানিবেন। এমন করিয়া আশীর্ব্বাদ বোধ করি আপনাকে কম লোকেই করিয়াছে। ছুটিতে আপিস হইতে কি পাইব জানি না—এখানকার নিয়মকানুন সবই বড়-সাহেবের মর্জ্জি। যাই পাই—আপনি যা আমাকে দিবেন সেই আমার বাস্তবিকই যথেষ্ট। আঃ শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

54, 36th Street, Rangoon

শ্রীমান্ হরিদাস ভায়া—

নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু—

আমার শত কোটী আশীর্ব্বাদ জানিবেন। কাল আপনার দেওয়া তিনশ' টাকা পাইয়াছি। ১১ই এপ্রিলের পূর্ব্বে আর কিছুতেই টিকিট পাওয়া যাইতেছে না। দেখি কি হয়।

কবিরাজী তেল মালিশ করিয়া একটু কমিয়াছে এবং কমিবার মুখে দাঁড়াইতেছে বলিয়াই আশা হইতেছে। ভগবান কি করিবেন তাঁরই মালুম।

শ্রীকান্ত এবং একটা যা-তাই গল্প রেজেষ্ট্রি করিয়া আজই পাঠাইব। অত্যন্ত ভীড় বলিয়া অনেক সময় আগের দিন রেজেষ্ট্রি না করিলে নাকি সময়ে যাইতে পায় না—এই খবর কাল রাত্রে পাইলাম। যদি এই চিঠির পরেই না যায়, পরের মেল পর্য্যন্ত যেন নিশ্চয় অপেক্ষা করা হয়। গল্পটায় কাটাকুটি বড় বেশি, একটু edit করার আবশ্যক। জলধরদা আশা করি ঠিক করিয়া লইবেন।

আপনার দয়ায় আরোগ্য হইয়া যাইব আশা করিতেছি। আর বোধ করি ভয় নাই—কারণ ওদেশে কবিরাজ আছে—এখানে নাই। এ সব রোগ ডাক্তারের চিকিৎসায় সারে না।

সুধীরকে[১] একটা মেজদিদি আর পল্লীসমাজ দেবেন। এইজন্য সে আমাকে আপনাকে অনুরোধ করিতে লিখিয়াছে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১। শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার।

[মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়[1]কে লেখা]

14, Lower Pozoungdoung Street
Rangoon 7. 1. '14

প্রিয় মণিবাবু—অনেক দিন হইয়া গেল আপনার চিঠির জবাব দিই নাই। এই ত্রুটির জন্য নিজেই লজ্জিত হইয়া আছি, ইহার উপর আপনি আর যেন কিছু মনে করিবেন না।

আপনার লেখার সমালোচনা শুনিয়া আপনি যে দুঃখিত হন নাই, একথা আপনার নিজের মুখে শুনিয়া বড় স্বস্তি পাইলাম। মাঝে মাঝে ভাবিতাম, আমার নিজের ত এই বিদ্যা, অপরের দোষ দেখাই, হয়ত বা তিনি কি ভাবিয়াছেন। যাক্—বড় সুখী হইয়াছি।

আমি তার পরেও আপনার বইটা আর একবার আগাগোড়া পড়িয়াছিলাম, সত্যই খুব ভাল লাগিয়াছে—এবার আরও যেন একটু বেশি করিয়া বুঝিয়াছি, কেন, এ লেখা সকলের আমার মত ভাল লাগে না। যথার্থই আপনার লেখার toneটা কবির মত। abstract ভাবের কবিতা যে-সব লোকের ভাল লাগে না, তাদেরই আপনার লেখা ভাল লাগে না একথা নিশ্চয় বলিতে পারি।

যে-সব কবিতায় বা ছোট গল্পে অনেক fact আছে, ঘটনা আছে,

১। মণিলালবাবু "ভারতী" পত্রিকার লেখক ছিলেন। এই "ভারতী"তেই শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের "বড়দিদি" প্রকাশ করেছিলেন। সৌরিনবাবু ছিলেন তখন ভারতীর সহঃ-সম্পাদক। এই সৌরীনবাবুই একদিন ভারতী অফিসে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মণিলালবাবুর পরিচয় ক রয়ে দেন

ভাবটা নিতান্ত সাদাসিদা সাংসারিক, আমি দেখিয়াছি বেশি লোকেরই তা ভাল লাগে, তারা সেটা বোঝে ভাল, কেন না বোঝা সহজ। এইখানে আরো একটা কথা বলি। অনেক দিন পূর্ব্বে বসুমতী কাগজে আপনার 'বিন্দু'র সমালোচনা (?) করিয়া বলে, "হিন্দুর বিধবার রাত্রে আর এক বাড়িতে যাওয়া, কি রুচি, ইত্যাদি ইত্যাদি"। (আমার এক বন্ধু এই সমালোচনার কথাটা আমাকে জানান—আমি নিজে ঠিক কথাগুলা দেখি নাই।) সেইটা শুনিয়া একবার আমার মনে হয় এই লোকটার স্পর্দ্ধার মত আমিও একটা কঠিন প্রতিবাদ করিয়া কোন কাগজে ছাপাইয়া দিই—আমার মনে হইয়াছিল বলিব এবং খুব কড়া করিয়াই বলিব, "লেখকের রুচি খুব ভাল, শুধু তুমি গোঁড়া এবং নির্ব্বোধ তাই ইহাতে দোষ দেখিয়াছ"। বিন্দুর অপরাধটা যে কি আমি তাহা ত কোন মতেই ভাবিয়া পাইলাম না। সে বেচারা আর একটা নিতান্ত নিরুপায় হতভাগা সঙ্গীকে রাত্রিতে লুকাইয়া দেখিতে গিয়াছিল, যদি আবশ্যক হয়, এক ফোঁটা মুখে জল দিবে কিম্বা এম্‌নি একটা কিছু করিবে —এই ত। এইতেই মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া গেল। হয়ত বা মনে মনে একটু স্নেহও করিত—খেলার সঙ্গী—ইহা কি দোষের না রুচিবিগর্হিত ? কারণ, সে বিধবা—অর্থাৎ, হিন্দুর বিধবার সুমুখে কেউ যদি মরে, আর সে যদি একটা আঙ্গুল দিয়া স্পর্শ করিলেও সে বাঁচে, হিন্দু বিধবা তাও যেন না করে—যেহেতু সে বিধবা এবং যে লোকটা মরিতেছে সে পরপুরুষ! এই ইহাদের হিন্দু বিধবার আদর্শ!

মনে হয়, লোকগুলা এতটাই সঙ্কীর্ণ মন লইয়া পরের দোষ দেখাইবার স্পর্দ্ধা করে এবং দেখায়, এবং লোকে সেই সমালোচনা পড়িয়া বলে, "ঠিক ত! ঠিক কথাই বলিয়াছে।"

আমি ঠিক বলিতে পারি না সমালোচনা কিরূপ ছিল, যেমন আমার

বন্ধুর কাছে শুনিয়াছি সেইমত বলিলাম। আপনি নিজে হয়ত এই সমালোচনা দেখিয়াছেন।

আবার কতকগুলো পাঠকে মনে করে, যেখানে সেখানে জপতপ আর সন্ন্যাসী আর হিন্দু ধর্ম্মের বড় বড় কথা না থাকিলে সে গল্প বা উপন্যাস কোন মতেই ভাল হইতে পারে না।

আপনি লিখুন দেখি কোন বিধবার বিবাহ হইয়াছে—আপনার আর রক্ষা থাকিবে না—মার্ মার্ শব্দ করিয়া সব ছুটিয়া আসিবে। আর এই লোকগুলা নিতান্ত বেহায়া গালিগালাজ করিতে বিশেষ পটু, সেইটাই ইহাদের জোর—অর্থাৎ এরা চীৎকার করিয়া এবং গায়ের জোরে জিতিবার চেষ্টা করে এবং জিতিয়াও যায়।

দিন দিন আমাদের সাহিত্য যেন একেবারে একছাঁচে ঢালা গোছ হইয়া উঠিতেছে—প্রতি দিন সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া উঠিতেছে। (তাই এক এক বার আমার মনে হয়, উচ্ছৃঙ্খল লেখা লিখিতে সুরু করিয়া দিব—কেবল রাগের উপরেই যা-তা লিখিয়া ফেলিব।) আমি কিছু দিন পূর্ব্বে আমার দিদির নামে "নারীর মূল্য" বলিয়া একটা প্রবন্ধ লিখি। আমার দিদি ব্যাপারটা আমাকে চিঠিতে লিখিয়া পাঠান আমি সেইটাকে বড় করিয়া লিখি। এজন্য আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা কত যে আমাকে চোখ রাঙাইয়াছেন তাহা লিখিয়া জানান যায় না। কেহ কেহ এমনও বলিয়াছিলেন, আমি ম্লেচ্ছভাবাপন্ন—ঠিক হিন্দু নই। অথচ, হিন্দুধর্ম্মকে আমি এক তিলও কটাক্ষ করি নাই, ইহার গোঁড়ামিকে আক্রমণ করিয়াছিলাম মাত্র। কত লোকে কত সমালোচনা (ভয়ানক প্রতিবাদ) করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন, অথচ, আজ পর্য্যন্ত কেহই কিছু করিলেন না। সেই সময়ে আমার এক মামা চিঠি লিখিলেন আমি মনে মনে ব্রাহ্ম বাহিরে হিন্দু। অথচ,

আমার গলায় তুলসীর মালা আছে, সন্ধ্যা-আহ্নিক না করিয়া জলগ্রহণ করি না, যার তার হাতে জল পর্য্যন্ত খাই না। (কিছু মনে করিবেন না মণিবাবু, আপনার কাছে এ-সব বলা অন্যায়।) আমি যা' তাই শুধু আপনাকে বলিলাম। এ-সব থাকা সত্ত্বেও তাঁরা আমাকে কত যে গালিগালাজ করিলেন এবং আমি ভড়ং করি বলিয়া শাসাইয়া দিলেন তাহা আর কত লিখিব। তার পরেই পীড়িত হইয়া পড়িলাম, না হইলে ইচ্ছা ছিল, ঐ রকম করিয়া "ঠাকুর দেবতার মূল্য" এবং "হিন্দু শাস্ত্রের মূল্য" বলিয়া প্রবন্ধ স্থরু করিব। যাক্ নিজের কথাতেই চিঠি পূর্ণ করিয়া দিলাম—কেমন আছেন? শরীর সারিল কি? নূতন কিছু লিখিলেন? হাঁ ভাল কথা, যা লিখিবেন শেষটায় অস্থির (impatient) হইয়া শেষ করিবেন না—এইখানে বোধ করি আপনার দোষ হয়।—

আপনার শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একটা অনুরোধ, যাহাই এই চিঠিতে লিখিয়া থাকি না কেন দোষ লইবেন না—যদি বা কিছু অন্যায় বলিয়াও থাকি তাহা হইলেও।

পুঃ—আপনার ভাষার দু-একটা তুচ্ছ খুঁত লইয়া প্রায়ই লোক-জনকে হৈ চৈ করিতে দেখি। অবশ্য, আমি নিজে আপনার (ওই খুঁতগুলার) মত লিখি না, কিন্তু দোষও দেখি না। আপনি জানিয়া শুনিয়াই ঐ ভাষা এবং বানান লিখিতেছেন—বেশ করিতেছেন। যাহা ভাল বলিয়া বুঝিয়াছেন—শুধু পরের কথায় ছাড়িবেন না। আর যদি নিজে দেখেন ওগুলা বদলানো আবশ্যক, তখন বদলাইবেন।

[শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়[১]কে লেখা]

14, Lower Pozoungdoung Stre
Rangoon. 20-3-14

প্রিয় হেমেন্দ্রবাবু—মাঝে অনেকদিন রেঙ্গুনে ছিলাম না, দিন কয়ে পূর্ব্বে ফিরে এসে আপনার চিঠি পাই। গত মেলেই সে চিঠি জবাব দেওয়া আমার উচিত ছিল, কিন্তু, দেহটা সে সময় এতই ম ছিল যে, পাছে অসঙ্গত কিছু লিখে বসি, এই আশঙ্কায় জবাব দি নাই। কিছু মনে করিবেন না। শরীরের জন্য আমার সব সম সহজ ভদ্রতাটুকু পর্য্যন্ত রেখে চলা শক্ত হয়ে পড়ে। তবে, ভরসা এ যে আমি বুড়ো মানুষ,[২] আপনাদের কাছে সব সময়েই ক্ষমার্হ।

চরিত্রহীন, বোধ করি আগামী বর্ষের মাঝামাঝি নাগাদ শেষ হবে সে ঠিক কথা,—শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সাধারণ পাঠক কিভাবে ও বস্তুটাবে গ্রহণ করবেন আন্দাজ করা যায় না। আমার লেখার ওপর আপনা অনুগ্রহ দেখে সত্যই বড় সুখী হয়েছি। অনেকেই অনুগ্রহ করেন বটে, কিন্তু, লেখা আমার নিতান্তই মামুলি ধরণের। বিশেষত্ব, আর কি

১। হেমেন্দ্রবাবু যমুনা-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের অনুরোধে চাকরী ছেড়ে যমুনা আসেন। শরৎচন্দ্র তখন যমুনায় নিয়মিত লিখছিলেন। সেই সূত্রেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হেমেন্দ্রবাবুর পরিচয়।

২। এই সময় শরৎচন্দ্রের বয়স মাত্র ৩৮ বছর। এর অনেক আগে থেকেই শরৎচন্দ্র সকলের কাছে নিজেকে "বুড়ো হয়েছি" বলে পরিচয় দিতেন। আর এই সময় থেকেই তাঁর জ্বর, অর্শ, আমাশয়, ফোলা প্রভৃতি একটা না একটা রোগ প্রায় লেগেই থাকত।

আছে? তবে, এটা ঠিক করে রাখি যেন মনের সঙ্গে লেখার সঙ্গে ঐক্য থাকে। যা ভাবি, তাই যেন লিখি। এ কি মনে করবে, ও কি বল্‌বে, সেদিকে প্রায়ই তাকাই নে। বোধ করি এই জন্যেই লোকের মাঝে মাঝে ভালও লাগে—কখন বা লাগেও না, তবুও বড় একটা তুচ্ছতাচ্ছল্য ক'রে লেখককে অপমান করতে চায় না। আপনার লেখার বিশেষত্ব আছে। আমার খুব ভাল লাগে। অনেক দিন পূর্ব্বে ফণিকে ব'লে পাঠাই যেন সে আপনার অনুগ্রহটা বেশী ক'রে আদায় করবার বিশেষ চেষ্টা করে। আমার বাঙ্‌লা ভাষার ওপর মোটেই দখল নেই বল্‌লে চলে—শব্দ সঞ্চয় খুব কম। কাযেই আমার লেখা সরল হয়—আমার পক্ষে শক্ত ক'রে লেখাই অসম্ভব। আমার মূর্খতাই আমার কাজে লেগেচে। আচ্ছা, ভারতবর্ষে, "হরিদ্বার" প্রভৃতি ভ্রমণবৃত্তান্তে 'হেমেন্দ্রনাথ রায়' স্বাক্ষর করা ছিল, সে কি আপনিই? এ কথাটার জবাব দেবেন।

মাঝে মাঝে সময় পেলে সম্বাদ দেবেন। আপনার চিঠিটা যে কোথায় রেখেচি, খুঁজে পেলাম না, তাই ফণির ঠিকানায় পাঠালাম। হয়ত সব কথার জবাব দেওয়া হ'ল না। শরীরটাও বড় দুর্ব্বল ঠেক্‌চে। আজ এই পর্য্যন্ত—পর-পত্রে অপরাপর কথা জানাব। আমার অনেক কথাই বল্‌বার আছে।

ফণিকে এবং 'যমুনা'কে একটু দেখবেন। আপনি যদি সত্যাই দেখেন, আমার তাহ'লে অর্দ্ধেক ভাবনা কমে যায়। এটা আমার আন্তরিক কথা—মন যোগানো কথা নয়। মন যোগানো কথা বড় একটা বলিও নে।—আপনাদের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

[শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার[১]'কে লেখা]

[ডিসেম্বর ১৯১৫]

প্রিয় সুধীর—কাল রাত্রে তোমার পত্র পাইলাম। বিলম্ব যে হইতেছে এবং তাহাতে যে ক্ষতি হইতেছে সে কি জানি না? তবে, প্রায় অধিকাংশই নূতন করিয়া লিখিতে হইতেছে। যদি দু-এক মাস দেরি হয় বরং সে ভাল, কিন্তু পাছে এমন করিয়া সুরু করিয়া খারাপ হইয়া শেষ হয়, সেই আমার বড় ভয়।

তবে, আর ছাপা বন্ধ হইবে না, পরের মেলেই এতটা যাবে। হয়ত বেশী হইবে। আর একটা কথা, rewrite করার জন্য অনেক সময় ভয় হয়, পাছে যাহা একবার পূর্ব্বে বলিয়াছি, হয়ত আবার তাহা বলিতে পারি। যতটা ছাপা হইয়াছে, তাহার অনেক copy আমি পাই নি। যদি registry করিয়া সমস্ত ছাপাটা পাঠাও বোধ করি সিকি পরিশ্রম আমার কমিয়া যায়। অতি অবশ্য সবটুকু গোড়া হইতে পাঠাইয়া দিবে। তাড়াতাড়ি করিয়া ত সবটুকু ১৫ দিনে হয়; কিন্তু সে কি ভাল? তবে আর যত বিলম্বই হোক মাঘ মাসের শেষে বেশি ছাপা শেষ হয়ে যেতে পারবেই। আমার হাতের অবস্থা ঠিক তেমনি, বোধ করি আর ভালই হবে না। ইচ্ছা আছে ফাল্গুন মাসে কলিকাতায় যাব। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

১। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স নামক পুস্তক-প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সত্বাধিকারী। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স শরৎচন্দ্রের পরিণীতা (আগষ্ট ১৯১৪), পণ্ডিত মশাই (সেপ্টেম্বর ১৯১৪), চন্দ্রনাথ (মার্চ ১৯১৬), নিষ্কৃতি (জুলাই ১৯১৭), চরিত্রহীন (নভেম্বর ১৯১৭) ও নারীর মূল্য (মার্চ ১৯২৪) এই ছয়খানি গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ (নারীর মূল্যের দ্বিতীয় সংস্করণও) প্রকাশ করেছিলেন।

৫৪, ৩৬ নং ষ্ট্রীট
রেঙ্গুন
১৫, ২, ১৬

পরম কল্যাণবরেষু—

সুধীর, আমার বড় অসুখ। ডান পা'টা হাঁটুর নীচে থেকে পায়ের নখ পর্য্যন্ত ফুলে উঠেছে। কি ব্যায়রাম জানা যায় না। কি হবে তাও ডাক্তার বলতে পারে না। হয়ত অতি সত্বর কলিকাতাতেই চিকিৎসার জন্য যাইতে হইবে। শুধু উঠতে হাঁটতে পারি না। এ ছাড়া আর কোন রোগের যন্ত্রণাও নেই। কিন্তু ভয়ে মন আমার কণ্টকিত হয়ে উঠছে। কেবলই ভাবি যদি না সারে। এমনি পঙ্গু হয়েই চিরদিন যদি কাটাতে হয়, এই বেলা চরিত্রহীনের Mssটা লিখিয়ে নিতেই হবে। ভবিষ্যতে কি হবে কে জানে। তবে আজকাল নিজেই বেশ লিখছি—কারণ আর সব কাজই বেশ করতে পারি।

পরের মেলে Mss পাঠাব। চন্দ্রনাথ কি ছাপা হয়ে গেছে? ৮০০ কপি বেশী ছাপানো মন্দ কি? বেশ তাই কোরো।

আঃ শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
[১৪ মার্চ ১৯১৬]

পরম কল্যাণবরেষু শ্রীমান সুধীরচন্দ্র সরকার

নিরাপদ দীর্ঘজীবনেষু—

কাল তোমার টেলিগ্রাম এবং তাহার আগের দিন পত্র পাইয়াছি।··· শুনিয়াছ বোধ হয়, আমি প্রায় পঙ্গু হইয়া গিয়াছি। হাঁটিতে

পারি না বলিলেই চলে। তবে লেখাপড়ার কাজ পূর্ব্বের মতই করিতে পারি। কিন্তু মন এত বিমর্ষ যে, কোন কাজে হাত দিতে ইচ্ছা করে না—করিলেও তাহা ভাল হয় না। শুধু যেগুলা আগে লেখা ছিল—অর্থাৎ অর্দ্ধেক, বারো আনা, চার আনা, এমন অনেক লেখাই আমার আছে—সেইগুলাই কোনমতে জোড়া-তাড়া দিয়া দিই। চরিত্রহীন সম্বন্ধে ওটা করিতে চাই নাই বলিয়াই এত দিন ২ অধ্যায় করিয়া পাঠাইতে ছিলাম। এবার তুমি আমার কাছে বসিয়া না হয় সবটা ঠিক করিয়া লইয়ো। আমি কবিরাজী চিকিৎসার জন্য কলিকাতা যাইতেছি। এক বৎসর থাকিব। ১১ই এপ্রিল রওনা হইব। কারণ, তার আগে আর টিকিট পাওয়া কোন মতেই গেল না। আজকাল সপ্তাহে একটা, কখনও বা দেড় সপ্তাহে একখানা করিয়া জাহাজ ছাড়িতেছে।… আজ দেড় মাসের উপর হইতে আপিস প্রভৃতি সমস্তই বন্ধ। কোন মতে টিকিয়া আছি মাত্র।…

পল্লীসমাজ এই জন্যই ভাল হইতে পারিল না। এই জন্যই এত লোক নিন্দা করিল। শরীর সুস্থ মন সুস্থ থাকিলে শেষটা এরূপ হইতে পারিত না। চরিত্রহীন এরূপ হইয়া যাইলে বড় লাগিবে।

আমার শতকোটী আশীর্ব্বাদ জানিবে।

বেশত আসিতে ইচ্ছা কর এসো। কিন্তু টিকিট পাইবে কি? তাছাড়া এত ভীড় জাহাজে হয় যে লোক মরিয়া মরিয়া আসে।

আর এক কথা। কলিকাতার স্বাস্থ্য এখন কেমন? এখানে অত্যন্ত বসন্তের প্রকোপ, ওখানেও কি তাই? গত বৎসরের মত কি? এই খবরটা আমাকে অতি অবশ্য দিবে।

আঃ শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[শ্রীসুবোধ রায়[১]কে লেখা]

54, 36th Street. Rangoon

10-3-16

পরম কল্যাণবরেষু,

আমি বৃদ্ধ বলিয়া আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আমার সহিত পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও আমাকে পত্র লিখিয়াছেন, ইহাকে পরম সৌভাগ্য জ্ঞান না করিয়া ধৃষ্টতা মনে করিব, এত বড় উঁচু মন আমার নাই।

তবে, আপনার চিঠির জবাব দিতে বিলম্ব হইয়াছে। তাহার প্রথম কারণ, আজকাল ১০।১২ দিনের মধ্যে মেল থাকে না। দ্বিতীয় কারণ, আমি বড় পীড়িত।

অবশ্য আমার এ বয়সে আর অসুখ-বিসুখের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা শোভা পায় না, তবুও প্রাণের মায়াটা ত কাটিতে চায় না—তাই মাঝে মাঝে মনে হয় আর কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া চল্লিশের ও-পারে গিয়া এ-সব ঘটিলেই সব দিকেই দেখিতে ভাল হইত। নিজের মনটাও আর খুঁত খুঁত করিতে পরিত না। কিন্তু সে কথা থাক্।

পল্লীসমাজ আপনার মন্দ লাগে নাই, বরং ভালই লাগিয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি। বাল্য এবং যৌবন কালটার অনেকখানি পাড়া-গাঁয়েই আমার কাটিয়াছে। গ্রামকেই বড় ভালবাসি। তাই দূরে বসিয়াও যে দুই চারিটা কথা মনে পড়িয়াছে তাহা লিখিয়াছি—স্মরণশক্তিও আর বুড়া বয়সে নাই—তবুও যে কতক কতক মিলিয়াছে, এ আমার বাহাদুরী বই কি। তবে কিনা পাড়াগাঁয়ের লোকে যদি

১। চুঁচুড়া-নিবাসী জনৈক সাহিত্যিক।

নিজের মনের সহিত মিলাইয়া লইয়া সত্য কথাগুলাই বলিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে কথাগুলা চলনসই প্রায়ই হয়। অন্ততঃ ভুলচুক তত হয় না, যত কলিকাতা বা সহরের বড়লোকে কল্পনা করিয়া বলিতে গেলে হয়।

তার পরে প্রতিকারের উপায়। উপায় কি, সে পরামর্শ দিবার সাধ্য কি আমার আছে? সে অনেক শক্তি, অনেক অভিজ্ঞতার কাজ। আমার মুখ দিয়া সে-কথা বাহির করা কতকটা ধৃষ্টতা নয় কি? তবুও, মনের ঝোঁকে মাঝে মাঝে বলিয়াও ফেলিয়াছি ত! যেমন, প্রতিকার আছে শুধু জ্ঞান বিস্তারে। আর যারা প্রতিকার করিতে চায়, তাহাদের মানুষ হইতে হইবে গ্রাম ছাড়িয়া দূরে গিয়া,—বিদেশে বাহির হইয়া। কিন্তু কাজ করিতে হইবে গ্রামে বসিয়া এবং গ্রামের ভাল মন্দ সকল প্রকার লোকের সহিত ভাল করিয়া মিল করিয়া লইয়া—তবে। এইটা বড় দরকারী জিনিস। এই ধরণের দু'টা চারটা কথা।

বিশ্বেশ্বরীর কথাগুলা হয়ত আপনার তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই।—যদি আপনার ধৈর্য্য রাখা সম্ভবপর হয়, আর একবার তাঁর কথাগুলায় চোখ বুলাইয়া লইলে যেগুলা প্রথমে নজরে পড়িতে পারে নাই, দ্বিতীয় বারে হয়ত চোখে লাগিতেও পারে। তবে এ কথাও সত্য যে, চোখে পড়িলেও সে-সব কথার এমন কিছু সত্যকার মূল্য নাই, যার জন্য আর একবার পড়িয়া সময় নষ্ট করা যাইতে পারে। সেটা আপনার ইচ্ছা।

একে একে মোটের উপর প্রায় সব কথাই হইল। বাকি রহিল শুধু ঐ শিল্পতত্ত্বের কথাটা।

গুরু হইবার ভারি শক্তি ছিল আমার বয়স যখন ১৮ পার হয় নাই। তখন যাঁদের গুরুগিরি করিয়াছিলাম, এখন তাঁরা আমাকে

ডিঙাইয়া এত উঁচুতে গিয়াছেন যে, তাঁদের নাম যদি করি, আপনার বিস্ময় রাখিবার স্থান থাকিবে না যে, আমি তাঁদেরও এক সময়ে লেখা পড়িয়া কাটিয়া কুটিয়া দিয়াছি, ভালমন্দ মতামত প্রকাশ করিয়াছি এবং পথ দেখাইয়া দিয়াছি !

তারপর যত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, ঐ ক্ষমতাটা ততই হারাইয়াছি। এখন আজকাল একেবারেই আর নাই। আমি শিখাইব আপনাদের এ-কথা আর ত মনে আনিতেই পারি না।

এ পত্র যত দিনে আপনার হাতে পড়িবে, সেই সময় আমিও সম্ভবতঃ তোড়জোড় বাঁধিয়া রেঙ্গুন ছাড়িয়া জাহাজে চড়িব। দেহটা যদি দেশ বদলাইলে একটু সারে এই আশা।

আর একবার বুড়া মানুষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবেন। ইতি—

[শ্রীমুরলীধর বসুকে[১] লেখা]

54, 36th Street, Rangoon

7. 4. 16

পরম কল্যাণবরেষু,

বহু দিন পরে আপনার পত্রের জবাব দিতে বসিয়াছি। বিলম্ব এত বেশি হইয়াছে যে আপনি নিশ্চয়ই এ আশা অনেক দিন পূর্ব্বেই ছাড়িয়া দিয়াছেন।

আমি অত্যন্ত কুড়ে মানুষ। আমার পক্ষে এ রকম অপরাধ প্রায় স্বাভাবিক। তবে, এ ক্ষেত্রে একটা কৈফিয়ৎ এই আছে যে বড় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহা এতই বেশী যে এখানে থাকা আর চলিল না—বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অন্যত্র যাইতে হইতেছে। এ পত্র যখন আপনার হাতে পড়িবে তখন আমি আর এ ঠিকানায় থাকিব না। যদি দয়া করিয়া কখনো এ পত্রের জবাব দেন, তবে যেমন করিয়া আমার বর্ত্তমান ঠিকানা অবগত হইয়াছিলেন, তেম্‌নি করিয়াই জানিতে পারি[illegible] যদিচ, বুঝিতেছি সে আবশ্যক আর হয় ত আপনার হই[illegible]

[illegible] সে কথা যাক্‌। আমার লেখা পড়িয়া আপনার ভাল [illegible]গয়াছে। এই আমার পরিশ্রমের পুরস্কার। আপনি যে এই কথা জানাইয়া আমাকে সুখী করিয়াছেন, সেজন্য আমি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি—আশীর্ব্বাদ করিতেছি আপনিও এম্‌নি সুখী হোন।

ভগবানের কাছে আপনার কুশল প্রার্থনা করিতেছি।

আশীর্ব্বাদক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১। অধুনা-লুপ্ত "কালি-কলম" কাগজের অন্যতম কর্ম্মকর্তা।

শিবপুরের চিঠি

[শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা]

শিবপুর
29. 6. 16.

ভায়া, আমাকে ব্যথাটা কুঁজো করে ফেলেছে। কাল খুবই ভিজে বাড়ল বোধ করি। আসলে ব্যামোই আমার এই বুকটা।

কাল যে বলেছিলাম একটা পরামর্শ করবার আছে। particulars না জানায় কাল সুবিধা ছিল না। চিঠি লিখেও সব কথা বলা যায় না। কিন্তু সময় নেই, যা পারি চিঠিতে বলি। একটা জবাব দিয়ে দেবেন। হয়ত ৩।৪ দিন বা বেশি দেখা হবে না।

জানেন বোধ হয় আমার ভাগ্নীর[১] বিয়ে এই শুক্রবারের পরের শুক্রবার। তাতে আমারই সমস্ত দায়। আবার আমি আপনার দায়। এতদিন কথাটা আপনাকে বলিনি যে দেশে আমি 'একঘরে'[২] আমার কাজ কর্ম্মের বাড়ীতে যাওয়া ঠিক নয়। যাক্ সেজন্যেও ভাবিনি কিন্তু টাকা দেওয়া চাই, অথচ আমি না যাই এই তাঁদের গোপন ইচ্ছা। আমার চারশ টাকার অকুলান। এটা আমার চাই। কিন্তু আপনার

১। শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর কন্যা।

২। শরৎচন্দ্র মেদিনীপুর জেলার কৃষ্ণদাস অধিকারীর কন্যা হিরণ্ময়ী দেবীকে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের সময় শরৎচন্দ্র আত্মীয়স্বজনদের না জানানোয় অনেকেই তাঁর এই বিয়ের কথা আদৌ জানতেন না। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে যখন দেশে ফিরে এলেন, তখন কেউ কেউ হিরণ্ময়ী দেবী কোথাকার কি জাতের মেয়ে এই নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা করত। শরৎচন্দ্রের একটা স্বভাব ছিল যে, তিনি মিথ্যার কখনও প্রতিবাদ করতেন না। বরং কিছু না বলে মজা উপভোগ করতেন। শরৎচন্দ্রের এই স্বভাবের সুযোগ নিয়ে, যারা তাঁর বিবাহিত জীবন নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করত তারা শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রকে একঘরেও করেছিল।

কাছে ধার করার একটা ভাবনা এই যে, আমার শরীরের অব সব রকম সম্ভব। যে দেনা পূর্ব্বে থেকেই আছে, সেটাই যে কত শোধ যাবে জানিনে, তার ওপর এ দেনা শোধ যাওয়া সম্ভবও অসম্ভবও খুব। দেহ ভাল থাকলে ধার করেই চাইতাম। কি র ব্যবস্থা করলে যে ভবিষ্যতে আপনাকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত না হতে হয় আপনিই ঠিক করে দেবেন। আমি তাই করব। আমি ঠিক জানি সব চেয়ে ভালো হবে।

সুরেন[1] আজ যে চিঠি লিখেচে সেটা এই সঙ্গে পাঠালাম। তা একটা জবাব দেবেন। আমি চিঠি লিখে দেব।

আমি উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত যদি কোন রকম ব্যবস্থা হওয়া স না হয় তাহলে লিখে দেবেন, আমি একটা গাড়ী ভাড়া করে যা আর যদি সে প্রয়োজন না বোঝেন খোকাকে টাকা দিতে পারেন সাবধানে নিয়ে আসতে বলে দেবেন। কিন্তু একটা খামের ভিতরে পু

একটা বই বিক্রী করলে চলে হয়ত। কিন্তু আমার ইচ্ছে করে সরকারদের[2] কাছে এ কথা বলি। কি রকম করা সম্ভব জানাবেন।

আপনার
শরৎ

১। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

২। শরৎচন্দ্রের গ্রন্থের অন্যতম প্রকাশক মেসার্স এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স।

5. 1st bye lane—Baje Shibpur.

2. 2. 17

পরমকল্যাণবরেষু,

হরিভায়া, কাল রাত্রে আসার পর নানা কারণ ঘটায় আজ সকালেই আপনাকে পত্র লিখিতেছি। গিয়া বলিলেই হয়ত ভাল হইত কিন্তু সে সময়ও নাই। কোথাও যাইতে ইচ্ছাও করিতেছে না। বাড়ীটা বদলাইতেই হইবে।

১। আপনি আমাকে ২০০৲ টাকা পাঠিয়ে দেবেন। এ টাকাটা বোধ করি ২ মাস পরে ঐ ওদের (Sarkarদের) হিসাব থেকে শোধ হতে পারবে। না পারে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। অন্ততঃ অনেকটা হবে।

২। ডাক্তার প্রভৃতির দাম চুকিয়ে দিয়ে বেশি কিছু যে বাকী থাকবে মনে হয় না।

তা ছাড়া এই ৫।৬ মাস থেকে দেখচি আমার অবস্থার পক্ষে বেশি খরচ হচ্চে। আমার Provident fundএর দরুন টাকাটাও ইতিমধ্যে গেছেই, তা ছাড়াও ধার। বেশি ওষুধ আর বদ্দিতে।

অথচ আপনার কাছে ডেবিটের সংখ্যা ক্রমাগতই বেড়ে চলেচে—শোধ হবার ত কোন আশাই দেখিনে। দেখচি ১২৫এর কমে মাস চলেই না। (তা ত হবেই) আফিংই ত লাগে ১৪।১৫ টাকা। তার ওপর এই মাস থেকে আবার—বাড়ী ভাড়াটাও ৮৲ টাকা বাড়বে।

শনিবার দিন আমার ভাইকে না হয় ইঁদুরকে পাঠিয়ে দেব। একটা খামের মধ্যে মুড়ে দেবেন।

এখন গুছিয়ে লেখা গেল না। যখন দেখা হবে বলব।

আঃ শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আশা করি ত অন্ততঃ এই সব হতে পারলেই অশান্তিগুলো যাবে। আর যাওয়া নিতান্তই আবশ্যক।

শরৎ

বাজে শিবপুর

২রা মাঘ, ১৩২৪

ভায়া, এঁকেত আপনি বেশ চিনেন, তাই পরিচয় দেওয়া বাহুল্য। আপনার অমতে বা যাতে আপনার কিছুমাত্র অসুবিধা ঘটিতে পারে, সে কাজ যে আমি করিব না, সে আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন। যে কারণে আমি এই লোকটির মঙ্গল ইচ্ছা করিতেছি, সেই হেতুটা আমার অনুরোধে এঁর মুখেই শুনুন। আমি নিশ্চয় জানি, reasonable যা কিছু এবং তাতে যদি কারও সত্যকার উপকার হয় তাতে আপনার সহানুভূতি আছেই।

আমি এঁকেত বুঝাইয়া বলিয়াছি যে, হরিদাস আমার publisher নয়, সে আমার ভাইয়ের মত স্নেহের বস্তু এবং হিতৈষী। সে যদি আমার কোন কাজে ক্ষুণ্ণ হয় তা আমাকে দিয়া হইবে না।

সকল কথাই স্পষ্ট বলিয়াছি এবং এই লোকটিও দেখি (অন্ততঃ এখন) স্পষ্ট কাজ করিতেই চায়।

জীবনে মানুষের ত অনেক ভুল ভ্রান্তিই হয়—সে কিছু নূতন করিয়া আপনাকে মনে করিয়া দেওয়া প্রয়োজন নয়।

তাই এর প্রার্থনা যদি সঙ্গত হয়, আর যদিই বা আমাদের একটু কিছু সাহায্য করিলে এর বিশেষ উপকার হয়, তাই আপনাকে বলিতে এবং আপনার সম্মতি লইতেই পাঠাইলাম।

যদি ছেলে-খেলা হয় তাও দয়া করিয়া এঁকে বুঝাইয়া দেবেন।

আপনার experience ও মুখে না হোক মনে মনে স্বীকার করিবেই। কেনই বা এ বেচারার ক্ষোভ থাকে যে হয়ত কিছু একটা ভবিষ্যতে করিতে পারিতাম—শুধু পরের জন্যই হইল না।

আপনার সময় অল্প বটে, তবে, ইচ্ছা করিলে একটু সময় করিতেও পারেন। এই আমার আবেদন ও নিবেদন।

আঃ শ্রীশরৎদা

১লা নভেম্বর। '১৮
বাজেশিবপুর

পরমকল্যাণবরেষু,

আজকাল ভাল আছি বটে, কিন্তু কলকাতায় যেতে ডাক্তার বারণ করেন। অনেক দিন থেকেই দেহটা বোধ করি নিস্তেজ হয়ে আসছিল, তাই ডেঙ্গু, war-fever, ইনফ্লুয়েঞ্জা কোনটাকেই এবছর বাদ দিতে পারলাম না।

মনে করচি, কিছুদিন ভাগলপুর থেকে ঘুরে আসি। বাড়ীর ডাক্তার আছে, বিশেষ ভয় নেই।

আসল কথা কিন্তু "ভারতবর্ষ" নিয়ে। দাদার[১] সঙ্গে কতকটা কথাবার্ত্তা হয়েছিল বটে, কিন্তু তাতে বিশেষ কোন মীমাংসা হোলো না, একেত এবার দারজিলিঙ্ থেকে আসার পরে তাঁর কানের এতটা উন্নতি[২] হয়েছে যে, বলশালী লোকেও দুচারটে কথার পরে হাঁপিয়ে ওঠে। আমিত আজকাল জোরে কথা কইতেও পারি নে, পারাও বারণ।

১। ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধর সেন। জলধরবাবু সাহিত্যিক মহলে "দাদা" নামে পরিচিত ছিলেন।

২। জলধরবাবু কানে খুবই কম শুনতেন। শরৎচন্দ্র এখানে সেই কথারই উল্লেখ করে পরিহাস করেছেন।

আপনার সঙ্গে একবার দেখা হতে পারলে ভালই হোতো, কিন্তু আমার ত নড়বার চড়বার জো নেই। আপনিও যে কাজকর্ম্ম ছেড়ে আসতে পারেন সেও সম্ভব মনে করিনে। তবে রবিবার দিন দুপুর বেলা গাড়ী করে যদি এদিকে একটু বেড়াতে বার হন ত হোতেও পারে।

ভাবছিলাম কিছুকাল যদি লেখা-পড়া বন্ধ করি ত সত্যিকারের কোন প্রকার অপযশ আপনাদের কাগজে পৌছয় কিনা।

আবার এমনও হোতে পারে হয়ত দুপাঁচ দিন ভাগলপুরে বাস করার পরেই লেখার energyটা ফিরে পেতে পারি। সে হলেত ভাল হয়।

আমার নাটকের কতদূর হোলো? বোধ করি শেষ হয়ে গেছে না? একটা উত্তর দেবেন।

আপনাদের

শরৎদা

বাজেশিবপুর

সোমবার—১১. ৮. ১৯.

পরমকল্যাণবরেষু,

সেদিন রাত্রে যে গ্রন্থাবলী করার একটা কল্পনা হয়, সেটা পরিত্যাগ করিলাম। কারণ চিন্তা করিয়া দেখিলাম ইহা অত্যন্ত নীচতা। যাহার জন্য সতীশবাবু[১] এক বৎসর যাবৎ আসা-যাওয়া করিতেছেন সেটা না হয় নাই হইল, কিন্তু অপর কোথাও করা অত্যন্ত ঘৃণিত নীচাশয়তা। যাহাকে নীচতা বলিয়া বুঝিব তাহা করিব না।

অবশ্য এ কল্পনা আমি কাহাকেও বলি নাই এবং বলিবও না। আপনিও কাহাকেও বলিবেন না আশা করি।

সতীশবাবু আজ সকালেও আসিয়াছিলেন। মত দিই নাই, কিন্তু

১। বসুমতীর সত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

তিনি তাঁর পিতার মৃত্যুর পরে এরূপ involved হইয়া পড়িয়াছেন যে শুনিলে ক্লেশ বোধ হয়। আপনার আশ্রয়ে আমার একপ্রকার করিয়া চলিয়া যায় বটে, কিন্তু—আজ এই পর্য্যন্তই ভাবিতে পারিয়াছি।

তিনি বলেন ত, এই তিন বৎসরে ২৫।৩০ হাজার টাকা হয়ত দিতেও পারেন—অসম্ভব নয়, সম্ভবও নয়। অথচ সে হইলে আমার পশ্চিম যাওয়ার একটা উপায় হয়, ইহাও সত্য। ওদিকে যাবার জন্য মনটা চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে।

আগামী বৃহস্পতিবার কিম্বা শুক্রবার যাহোক একটা final করিয়া ফেলিব। এই ক্রমাগত লেখার উপর খাওয়া পরার নির্ভর করাটা ভাল নয়,—আর ইহাও মনে করি—এরা যে টাকা দেবে বলে—সে তো বর্ত্তমান অবস্থায় সারা জীবনেও পাওয়া যায় না।—অবশ্য জীবনটার মেয়াদ যদি আরও ১০ বছর ধরা যায়।

আপনার দোকানের হয়ত কিছু ক্ষতি হইতে পারে—আবার নাও হইতে পারে। কারণ—cheap edition তারাই কেনে যারা কোন কালে বই কেনে না।

চলিতে অক্ষম না হইলে বোধ করি নিজেই একবার যাইতাম। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবেন!

শরৎদা

বাজেশিবপুর
২১শে চৈত্র ১৩২৫

ভায়া,

এখনই বেলগেছেতে যাচ্ছি এবং একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে মণ্টুর[১] জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, পাছে তাকে এতদূরে এসে ফিরে

১। শ্রীদিলীপকুমার রায়।

যেতে হয়। বিশেষতঃ Anderson সাহেবের জন্যে একটা চিঠিও দিতে হবে—যদি তাকে দিয়ে একটু কাজ পাওয়া যায়। নইলে নিজেই দেখা করতাম।

কাল বাড়ী এসে চিঠি পেলাম। অনেকদিন থেকে রূপনারায়ণ নদীর ধারে একটা মাটির বাড়ী করবার চেষ্টা করচি। খবর পেলাম আজই গেলে যা হোক একটা কিছু হয়। জমিটার দাম ১১০০৲ টাকা। এত টাকা ব্যাঙ্ক থেকে বার করতে আমার ভারি মায়া হচ্চে। তাছাড়া বাড়ী করার খরচাটাও বেশি থাকবে না। আপনার কাছে নিবেদন যে সেদিনের টাকা থেকে নিজে ৭০০৲ টাকা দিই, আর আপনি যদি ধার দেন ৪০০৲ তাহলে সুন্দর সুবিধে হয়।

আর যদি ৪০০৲ টাকা দেওয়ার অসুবিধে হয় তাহলে আর করি কি! তাই ইঁদুরের হাতে একখানা Cross cheque for 400/- পাঠালাম। নেন ত নেবেন না হয়। কিন্তু টাকাটা পাঠিয়ে দেবেন। সই ঠিক আছে—ফেরৎ আসবে না।

আশীর্ব্বাদক—শরৎদা

7. 4. 20.
266 Sivalaya
Benaras City

পরমকল্যাণবরেষু,

আপনার পত্র পাইলাম। এখানে ভারি গরম পড়িয়াছে। আর এক মুহূর্ত্ত মন টেঁকে না এমন হইয়াছে। কাল ভৈরব পোষ মানিল না। চৈত্র মাস যাওয়া যায় না—একটা ব্রত উদ্‌যাপন আছে এঁর[১]। শ' দুই টাকা পাঠিয়ে দেবেন।

১। শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীর।

একছত্র লেখা বার হয় না একি বিশ্রী দেশ। গত ৪।৫ দিন ক্রমাগত কলম নিয়ে বসি আর ঘণ্টা দুই চুপ করে থেকে উঠে পড়ি। এমন মনে হচ্ছে বুঝিবা আর কখনো লিখতেই পারব না। যা ছিল হয়ত বা ফুরিয়েই গেছে—কে জানে!

একটা বড় মজার খবর আছে। এখানে ভৃগু সংহিতার এক নামজাদা পণ্ডিতজী আছেন—তিনি ত আমার কুষ্ঠি গুণে নিজেও হাঁ করে রয়ে গেলেন, আমিও হাঁ করে রয়ে গেলুম! আমার অতীত জীবন (যে আজও কেউ জানে না) অক্ষরে অক্ষরে এমন বলতে লাগলেন যে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল! আবার ভবিষ্যত জীবন আরও বিভীষণ! তিনি বারম্বার বলতে লাগলেন, এ কোন্ মহাযোগীর না হয় রাজতুল্য কোন ব্যক্তির কুণ্ডলী! অবশ্য আমি নিজের identity গোপন করেই রেখেছিলাম। লোকটার ভারি পশার, খুব রোজগার—তারা বসেই রইল, পণ্ডিতজী আমাকে নিয়ে পড়লেন—পারিশ্রমিক ত নিলেনই না—বারম্বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—ইনি কে এবং কোথায় আছেন! ধর্ম্মস্থানে বৃহস্পতির এতবড় পরিপূর্ণ সংস্থান তিনি নাকি আর দেখেন নি! আচ্ছা ভায়া, এ যদি সত্য হয় ত আমার মত নাস্তিকের ভাগ্যে এ কি বিড়ম্বনা একি কঠোর পরিহাস বলুন ত? আয়ু কিন্তু ৪৮ কিম্বা বড় জোর ৫২। তিনি সম্ভ্রমের আতিশয্যে মৃত্যু বললেন না—উচ্চারণ করতেই পারলেন না। বলতে লাগলেন—এঁর যদি ৪৮এ মোক্ষ না হয় ত তারপরে সংসার ত্যাগ করে ৫৬তে দেহত্যাগ করবেন!!! তবে রক্ষে এই যে সত্যি হবে না তা বেশ জানি। কিন্তু অতীত কি করে এমন বর্ণে বর্ণে সত্যি বলতে পারলেন, আমি ক্রমাগত তখন থেকে তাই ভাবচি। কি জানি ভাবতে ভাবতে বুড়ো বয়সে আবার না সেই উটের দলে গিয়ে মিশি।—শরৎদা

আমাকে আপনারা এখন থেকে "সমীহ" করে চলবেন। নিশ্চয়ই একটা "কেউ-কেটা" নয়—চাই কি শাপ-মন্যি দিয়ে ভস্ম করেও দিতে পারি। আবার রাজা করেও দিতে পারি।

এখানে আরও একজন নামজাদা গোণকার আছেন—সুধীর ভাদুড়ি। ইনিও গণনা করলেন—আমি যে একটা ভয়ানক ধার্ম্মিক লোক এ সত্য ইনিও আবিষ্কার করেছেন! দেখচি আবার সেই দলে গিয়ে আমাকে ভেড়ালে।

Baje Sibpur

15, 5. 20.

ভায়া,

অনেক চিন্তার পর করিলাম স্থির—আপনি আমার চসমাটা বামাপদর দোকান হইতে আনাইয়া লইয়া—সেই আপনার নিজের লোকটিকে দিবেন। সুধা[1] জানে কি রকম এক কাঁচের চশমা করা চাই। নম্বর (+2·5) দামও শুনি ১৮৲ ২০৲ টাকা। বাস্তবিক জুতায় যদি পরের কথায়—৩২৷৷০ খরচ করিয়া ফেলিতে পারি[2]—আপনাদের কথায় ১৮৲ ২০৲ টাকা খরচ করিব এ আর বিচিত্র কি? আপনি ঠিকই বলিয়াছেন।

যাক্, আপনাদের কথাই রাখি—ঐ এক কাঁচেই (+2·5) চসমা করিয়া দিন। Frame সোনার ত আছেই। [illegible]ভিল—কাঁচগুলাও—ত ফিরিয়া পাওয়া যাইবে।

শরৎদা

১। হরিদাসবাবুর কনিষ্ঠ-ভ্রাতা সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়।

২। শরৎচন্দ্রের এই জুতা কেনার কাহিনীটি গ্রন্থের শেষভাগে পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

বাজে শিবপুর। হাওড়া
২১শে ভাদ্র '২৯

ভায়া, শিশিরবাবুর[১] ঠিকানা জানিনে, আপনি একবার যদি কোন উপায়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন! 'আঁধারে আলো'[২] কতদূর হ'ল জানেন কি? একটা কথা শুনলাম যে গল্পের ঠিক spiritটা নাকি দুএক জায়গায় ক্ষুণ্ণ হয়েছে—হলে আমাদের দু পক্ষেরই ক্ষতি। ভবিষ্যৎ দু দিকেই একটু dark আভায় দেখা দেবে। দেখুন, আমি ত অনেক ভেবে চিন্তেই গল্প লিখি। সুতরাং তাকে বদ্‌লাবার আবশ্যক হলেও একটু ভেবে চিন্তেই করা উচিত। আপনাকে যে লিখলাম তার কারণ আপনি নিজেও একটু মাঝখানে আছেন। তাঁদের plotটা একবার যদি দেখবার সুযোগ হ'ত তাতে কোন পক্ষের ক্ষতির সম্ভাবনা ত নাই-ই, আমিও একটু আধটু suggest কোরতাম। জিনিসটা দর্শকের মনোরঞ্জন করা এই ত? পাঠকের যদি করতে পেরে থাকি (একটু শিখিয়ে নিলে) ত এদেরও পারব—অন্ততঃ ভরসা ত হয়।

আপনাদের
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভাগলপুর
১৫ই কার্ত্তিক ১৩৩২

ভায়া,

অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই, ভরসা করি আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল।

১। শ্রীশিশির কুমার ভাদুড়ী।

২। শিশিরবাবু শরৎচন্দ্রের "আঁধারে আলো"কে সিনেমায় রূপায়িত করেন। শরৎচন্দ্রের লেখা গল্প "আঁধারে আলো"ই প্রথম সিনেমায় রূপায়িত হয়।

৺জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে এখানে[১] এসে আটকে গেছি। আমার ভোলা চাকর কালাজ্বরে শয্যাগত। বহু injection দিয়ে আরাম করে সঙ্গে আনি! এখানে পূজো বাড়ীর নানাবিধ খাদ্য ও অখাদ্য খেয়ে তার জ্বর এবং পিলে এম্‌নি দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে যে সে একেবারে অপ্রত্যাশিত। আর আমার?

৺ ১৫।২০ দিন পূর্ব্বে কানে কাঠি দিয়ে আর শুনতে পাইনে। এখানে এসে এমন সুন্দর হয়েছে যে পিছনে কামান দাগ্‌লেও চম্‌কাইনে। আমার সম্পূর্ণ আশা হয় যে, শ্রীযুক্ত জলধর দাদাকে এবার আপনি বিদায় দিয়ে আমাকে ভারতবর্ষের সম্পাদক নিযুক্ত করলে আপনাদের traditionএর কোন প্রকার অমর্য্যাদা হবে না।[২] এ বিষয়ে আমার যোগ্যতা যেন বিস্মৃত হবেন না। এইত সম্বাদ! আপনার শ্রীঅর্শ কেমন আছে জানতে পারলে সুখি হব। আশা করি সেরে গেছে এরূপ দুঃসম্বাদ দেবেন না।

সুধাকে আমার আশীর্ব্বাদ দেবেন।

শুঃ

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১। ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের মামার বাড়ীতে প্রতি বছরই খুব ধুমধামের সহিত জগদ্ধাত্রী পূজা হয়।

২। ভারতবর্ষ-সম্পাদক রায় বাহাদুর জলধর সেন কানে খুবই কম শুনতেন। এ ছাড়া এক সময় বীরেন্দ্রনাথ বসু নামে এক ব্যক্তি জলধরবাবুর সহকারী ছিলেন, তিনিও কানে খাটো ছিলেন। তাই কালা হওয়াটাকেই ভারতবর্ষের সম্পাদক হওয়ার অন্যতম যোগ্যতা বলে শরৎচন্দ্র এখানে পরিহাস করেছেন।

[প্রমথ চৌধুরীকে লেখা]

6, Nilkamal Kundu's Lne
Baje-Shibpur. ১০।৯।১৬

সবিনয় নিবেদন,—কোন কারণেই যে হঠাৎ আপনার চিঠি পেতে পারি এ আশা আমি কখনো করি নি। আজ শ্রীমান্ মণ্টুরও একখানা চিঠি পেলুম।

প্রায় মাস পাঁচেক হ'তে চল্ল আমি এ দেশে এসেচি। আসা পর্য্যন্তই আপনার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেচি কিন্তু ঘটে ওঠে নি। একে ত কোথা দিয়ে গেলে আপনার বাড়িতে পৌছানো যায় তা জানি নে, তার ওপর এও একটা সঙ্কোচ ছিল, পাছে অসময়ে গিয়ে আপনার সময় নষ্ট করি। এখন আপনি নিজেই যখন ডেকেচেন তখন ত নিশ্চয়ই যাবো। দেখি, কাল বুধবারে যদি আপনার আফিসে গিয়ে হাজির হ'তে পারি। না পারি শনিবারে আপনার বালিগঞ্জের বাড়িতে যাবই।

আমার দেখা করবার একটা বিশেষ হেতু আছে। আপনার লেখার আমিও একজন ভক্ত। অন্ততঃ, একটু বেশি রকম পক্ষপাতী। তাই, বাইরের লোকেরা আপনাকে যখন গালি-গালাজ করে তখন আমারও লাগে। দুই পক্ষের লেখাই আমি মন দিয়ে পড়ি। কিন্তু আমার মুসকিল হয়েচে এই যে, না পারি ঠাওরাতে তাদের ক্রোধের কারণ, না পারি বুঝতে আপনি বা কি বুঝিয়ে বলেন। এ-সব তর্কাতর্কি নিশ্চয়ই খুব উচ্চ অঙ্গের হয় তাতে আমার সংশয় নেই। কিন্তু, ছাপার অক্ষরে একটা অক্ষরও আমার মাথায় ঢোকে না। আমার বুদ্ধিটা মোটা; কোন জিনিস. সেই জন্যে বেশ একটু মোটা ক'রে বুঝতে না পারলে আমার বোঝাই হয় না। দেখা করবার হেতু এই। ভেবেচি মুখোমুখি

জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নেব ব্যাপারটা বাস্তবিক কি। শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর পণ্ডিত মশাইকে একদিন এই প্রশ্নই করেছিলুম। তিনি বুঝিয়েও দিয়েছিলেন। আমাদের মণিলালকেও জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তিনিও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এইবার আপনার পালা।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদবাবু (নাট্যকার) এক দিন আমাকে বলেছিলেন, আমি বাঙলা সাহিত্যের একটি রত্ন। তার কারণ আমি যে ভাষায় লিখি তাই ঠিক। কিন্তু 'সবুজপত্রে'র ওঁরা ভাষাটাকে একেবারে মাটি ক'রে দিচ্চেন। ওঁদের ওটা ভাষাই নয়।

আমি নিজে কিন্তু কিছুতেই আবিষ্কার করতে পারলুম না, আমার ভাষার সঙ্গে 'সবুজপত্রে'র ভাষার পার্থক্যটা কি। এই কথাটাই আপনার কাছে গিয়ে বেশ ভাল ক'রে বুঝে আসব।

আমার কোন লেখা আপনি পড়েছেন কি না জানি নে, যদি প'ড়ে থাকেন তাহ'লে কোন অসুবিধেই হবে না।

পণ্ডিত মশাই সেদিন বলেছিলেন বাঙলা ভাষাটা সংস্কৃত ঘেষা হওয়া চাই এবং তাই নিয়েই বিবাদ। কিন্তু ঘেষাটা যে কতখানি চাই তা তিনিও জানেন না, আপনারাও না। দেখি এই মীমাংসাটা যদি আপনার কাছে গেলে হয়।—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

6, Nilkamal Kundu's Lane
Baje-Shibpur. 21. 9. 16

সবিনয় নিবেদন,

কাল আপনি আমাকে একখানি বই দিয়েছিলেন। এই বই পাওয়াটা আমার এমনি অভ্যাস হয়ে গেছে যে তা থেকে একটা বিশ্রী বদ্ অভ্যাস দাঁড়িয়েচে। সে বই পড়ি আর না পড়ি পাওয়াটা

স্বীকার করা যে অন্ততঃ একটা ভদ্রতা এও আর যেন মনে পড়ে না। কথাটা দম্ভের মত শোনালেও জিনিসটা সত্য। তাই আপনার বইখানা অনেক দিনের পর এই ত্রুটিটা আজ যখন প্রথম দেখিয়ে দিলে তখন আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়ে ত পারি নে। এক দফা ধন্যবাদ এ জন্য আর এক দফা ধন্যবাদ এই চিঠির শেষে পাবেন।

কাল রাত্রেই বইখানি শেষ করি। গল্প প'ড়ে এত আনন্দ বহুকাল পাই নি। এর বিশেষ সুখ্যাতি করতে যাওয়ার নাম এর সমালোচনা করা। এ কাজ অনেকেই করবেন ব'লে আপনাকে যে দিনরাত শাসাচ্চেন সে ইঙ্গিতও কাল আপনার ঘরে ব'সেই শুনে এলুম। সুতরাং এ কাজ আমি করব না। কিন্তু তাঁরাও যে কি করবেন, শিব গড়বেন কি বাঁদর গড়বেন সে তাঁরাই জানেন।৮ তাঁদের ভাল লেগেছে—এ এক কথা, কিন্তু এ লেখার মধ্যে যে কত জোর, কত সূক্ষ্ম কারুকার্য্য আছে, এর নিজস্ব সৌন্দর্য্য কোন্‌খানে, কোথায় এর মধুর কাব্যরস—সবচেয়ে এ লেখা লিখ্‌তে পারা যে কত শক্ত, এ কথা বুঝবে বোধ করি শুধু তারাই যাদের নিজেদের হাতেকলমে লেখার বাতিক আছে। আর সে লেখা পড়বার বাতিকও দেশের পাঁচ জনের আছে। কিন্তু সে যাক্‌। আমার আসল কথাটা এই যে, এক রবিবাবুর লেখা প'ড়ে মনে হয়েচে চেষ্টা করলেও আমি এমন পারি নে, আর কাল আপনার এই গল্পের বইটা প'ড়ে মনে হ'ল চেষ্টা করলে আমি এমন ক'রে কিছুতেই লিখ্‌তে পারি নে। এই কথাটা জানাবার জন্যই এই পত্র।

কাল সন্ধ্যার সময় অর্থাৎ আপনার ওখান থেকে বেরিয়ে 'ভারতবর্ষ' আফিসে আসি এবং সেইখানেই "সোমনাথের গল্পটা" শেষ ক'রে জলধরবাবু প্রভৃতি কয়েক জনের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা ওঠে। আমি আমার মত এই ব'লে দিই যে, এ বই পড়া উচিত তাদেরই বেশি কোরে যারা

নিজেরা বই লেখে। এর নির্মল লিখনভঙ্গী, সোজা সরল কথোপকথন অথচ এমনিই রসে ভরা, মনের ভাবটা বলবার এই অনাবিল, মুক্ত পথ তাঁরা যত শিখ্‌তে পারবেন, যারা বই লেখে না তারা তেমন কোরে শিখ্‌তে পারবে না। তাদের শুধু ভালই লাগবে কিন্তু গ্রন্থকারদের ভালও যেমন লাগবে শিক্ষাও তেমনি হবে। এই আমার মোটের ওপর বক্তব্য। এখানে একটা অনুরোধ আপনাকে কোরব। আপনি দয়া ক'রে এইটে মনে করবেন না যে আমার এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসার ভেতর এতটুকু অত্যুক্তি—ইতর লোকে যাকে বলে 'খোসামোদ' তাই আছে। কারণ আমি জানি ইতিমধ্যে যত লোকের যত প্রশংসা আপনি এই 'চারইয়ারি' উপলক্ষ্যে পেয়েছেন তার মধ্যে উপরোক্ত ওই ইতর কথাটা যে আছে তা নিজেই হয়ত অনুভব করেছেন। অন্ততঃ আমি হ'লে ত তাই করতুম। কারণ এটা আমি নিশ্চয় বুঝতুম এ বই সাধারণ পাঠকের জন্য নয়। তারা বুঝবেই না।* ইংরিজিতে যে একটা কথা আছে 'art to hide art' সেটা তারা না ধরতে পেরে মনে করবে এর চাঁচা-ছোলা সৌন্দর্য্যের

---

* সেদিন এই বইয়ের প্রসঙ্গে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন, আপনি রবিবাবুর সব কবিতার মানে বুঝিয়ে দিতে পারেন?

আমি বলি, না, পারি না। তার কারণ, আপনি বেদান্তে পড় পণ্ডিত হ'লেও কাব্য বোঝবার পণ্ডিত নন। তাছাড়া সব কবিতার মানে সবাইকে যে বুঝতেই হবে এমন কিছু মাথার দিব্যি দেওয়াও নাই। রবিবাবুর 'শ্রেষ্ঠভিক্ষা' প'ড়ে গুরুদাস বাবু বলেছিলেন এমন অশ্লীল বস্তু ইতিপূর্ব্বে তিনি দেখেন নাই। সুতরাং কথাটা স্যার গুরুদাসের মুখ থেকে বার হয়েচে ব'লেই মেনে নিতে হবে এবং না নিলে মারাত্মক অপরাধ হবে তাও ত নয়।—শঃ 2. 10. 16.

মধ্যে সৌন্দর্য্যই নেই। এই ধরুন না যেমন মাড়ওয়ারীরা বাড়ি তৈরি করায় এবং তাতে পয়সা খরচ ক'রে কারুকার্য্য করিয়ে নেয়।

পাঠকের Intelligence এবং Culture একটা বিশেষ সীমায় না পৌছন পর্য্যন্ত তারা এ বইয়ের সমঝদার হ'তেই পারে না। কথাটা আমি বানিয়ে বল্‌চি নে। সেদিন যে আলোচনা হয় তা থেকেই এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলুম। যাক্। আবার যদি কখনো দেখা হয় এ-কথা হবে। আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিয়ে আজ বিদায় নিলুম। এমনও হ'তে পারে আমার ভাল লাগার দাম হয়ত আপনার কাছে খুবই সামান্য।—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

2. 10. 16 শিবপুর

আজ এইমাত্র আপনার পত্র পেলুম। সেদিন আপনাকে যে চিঠিখানি লিখেছিলুম, অথচ পাঠাই নি—পাছে হঠাৎ আপনি কিছু একটা মনে ক'রে বসেন—সেইখানাই আজ পাঠিয়ে দিলুম। এক দিন যেদিন হোক আপনার বালিগঞ্জের বাড়িতে যাব।—শঃ

6, Nilkamal Kundoo's Lane,
Baje-Shibpore, Howrah, 11-10-16.

৺ সবিনয় নিবেদন,—কয়েক দিন হ'ল আপনার চিঠি পেয়ে জবাব দিতে বিলম্ব হওয়ায় লজ্জিত হয়ে আছি। যাওয়াও ঘটে উঠ্‌ল না ব'লে নিজের মনেই এক প্রকার ক্লেশ বোধ করচি। পরশু অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে যদি বাড়ি থাকেন, বিকালবেলায় একবার আপনার ওখানে যাবো। কিন্তু কি একটা আমার স্বভাব বড়লোকের বাড়ি যাবো মনে হ'লেই কেমন সমস্ত মনটা দ্বিধায় সঙ্কোচে অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। তাই যাই-যাই ক'রেও যাওয়া হয় না।

এই সঙ্কোচটা যদি কাটাতে পারি পরশু নিশ্চয়ই গিয়ে হাজির হব আর যদি না যাই ত তার কারণ আপনাকে কিছু বোঝাতে হবে না। সে কথা কিন্তু যাক্।

আপনার এই বইখানার সমালোচনা যাঁরা লিখেছিলেন তাঁরা অতি উচ্ছ্বাসের দোষেই যে কাগজওয়ালাদের মনোরঞ্জন করতে পারেন নি তা বোধ হয় নয়। আপনি ত জানেন আমাদের কাগজে 'নামের ভার' না থাক্‌লে ধারটা কেউ অর্থাৎ কোন সম্পাদক যাচাই ক'রে দেখ্‌তে চান্ না। আমার সমালোচনা নিশ্চয়ই ভালো হবে না, কারণ, এ বিষয়ে শক্তি আমার বড় কম কিন্তু নামটা নীচে লিখে দিলেই যে-কোন কাগজেই তা স্থান পাবে; সুতরাং তাই আমি আগামী মাসে করব কিনা ভাব্‌চি। হয় 'ভারতবর্ষে' না হয় 'প্রবাসী'তে। তবে, কিনা অক্ষমের তুলির আঁচড়ে জিনিসটার চেহারা পাছে আজ-কালকার Indian আর্টের উৎকৃষ্ট নমুনার মত দেখায়, সেই আমার ভয়। আর আপনার নিজের ত তাহলে কথাই নেই—আহ্লাদ রাখবার আর জায়গাই থাক্‌বে না। তবে যদি অভয় দেন ত করি।

আপনার 'বড়বাবুর বড়দিন'—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়িবাবু[১]রা যাকে বলেন 'মুন্সিয়ানা' তার যদিচ কোনো অভাব নেই (না থাক্‌বারই কথা!) আমার কিন্তু ভাল লাগল না। আমি জানি এ সম্বন্ধে আপনার অন্যান্য সমঝদারদের সঙ্গে আমার মতভেদ আপনি স্পষ্টই দেখে পাচ্চেন। তাঁরা হয়ত আপনাকে বলেচেন, একটা চরিত্রকে 'বাঁদর' বানিয়ে তোল্‌বার ক্ষমতা আপনার অসাধারণ। আমিও যে তা বলি নে তা নয়। বিদ্রূপ ব্যঙ্গের খোঁচায় মানুষের বিশেষ কোন একটা বাঁদরামি প্রবৃত্তিকে পাঠকের

১। "নায়ক" পত্রিকার সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাছে রিডিক্লাস ক'রে তুল্‌তে আপনি ভারি পারেন, কিন্তু আমি দেখি মানুষকে মানুষ ক'রে দেখাবার ক্ষমতা এর চেয়েও আপনার ঢের বেশি। এক একটা অত্যন্ত চাপা লোক যেমন তার বড় দুঃখটাকেও বলবার সময় এমন একটা তাচ্ছিল্যের সুর দেয় যে হঠাৎ মনে হয় যেন সে আর কারো দুঃখটা গল্প ক'রে যাচ্ছে। এর সঙ্গে তার নিজের যেন কোন সম্পর্ক নেই। আপনিও বলেন ঠিক তেম্‌নি ক'রে। ইনিয়ে বিনিয়ে কাতরোক্তি কোথাও নেই—অথচ, কত বড় না একটা জীবনের ট্র্যাজিডি পাঠকের বুকে গিয়ে বাজে। আপনার লেখায় এই সহজ শান্ত রিফাইণ্ড্‌ বলার ভঙ্গীটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করে। তাইতেই সেদিন লিখেছিলুমও চারইয়ারীর কথাগুলো ঠিকমত বোঝবার জন্যে পাঠকের Education এবং Culture বিশেষ একটা পর্য্যায়ে পৌঁছান দরকার। তা না হ'লে এর সমস্ত সৌন্দর্য্যই তার কাছে ঝুটো হয়ে যাবে।

কিন্তু 'বাঁদর' বানাবার সময় ওই চাপা তাচ্ছিল্যের সুরটা লেখায় কোনমতেই থাকা সম্ভবপর নয়, থাকেও না। বোধ করি এই জন্যেই "বড়দিন" আমার ভাল লাগে নি। ওর মর‍্যালের তামাসাটা ধরতে পারলুম না।

আবার এমনও হ'তে পারে আমি মোটেই বুঝ্‌তে পারি নি। হয়ত তাই। সুতরাং আমার ভাল-না-লাগার দাম একেবারে নাও থাক্‌তে পারে। হয়ত বা আগাগোড়াই অনধিকার-চর্চা ক'রে যাচ্চি। তা যদি হয় আমাকে মাপ করবেন। অনধিকার-চর্চার কথাটা আমি অতি-বিনয় ক'রে বলচি নে। কারণ, আমি লেখাপড়া শিখি নি, ইংরিজি ভাল ক'রে না পড়াশুনা থাক্‌লে লেখার ভাল-মন্দ বিচার করবার ক্ষমতা হয় না। এ ক্ষমতাটাও শিক্ষাসাপেক্ষ। বড় বড়

লোকের বড় বড় সমালোচনা যারা পড়ে নি, তারা স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা থেকে অমনি এক রকম ক'রে বুঝতে যে পারে না তা নয় বটে, কিন্তু যে-সব জিনিস তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরে তাদের ভেতর তারা এক পাও ঢুক্‌তে পারে না। কপাট যে বন্ধ, সে যে বাইরে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে শুধু বন্ধ কপাটের পানে চেয়ে আছে এও ঠাওর পায় না। এই জন্যেই ত সব জিনিসেরই সবাই সমালোচক। মনে করে কথার মানেগুলো যখন বুঝ্‌তে পারচি তখন সমস্তই বুঝচি। ইংরিজির কথা এই জন্য তুল্‌লুম যে বাঙলা ভাষায় সমালোচনার বইও নেই সে শেখবার বালাইও নেই। এও যে রীতিমত সাকরেদি ক'রে শিখতে হয় এ ধারণাও নেই। আমার ধারণা আছে ব'লেই এত কথা বল্‌লুম। এ-সব কথা আমি বিদ্বান লোকদের মুখে শুনেচি। অতএব, আমার ভাল-না-লাগার মূল্য আপনি এই আন্দাজে দেবেন। আমি জানি আমি যা-তা একটা সমালোচনা লিখে ছাপ্‌তে দিলেই তা ছাপা হয়ে যাবে এবং সেজন্য আপনার অনুমতি চাওয়াটাও বাহুল্য কিন্তু আপনার লেখার উপর আমার একটু বেশি শ্রদ্ধা আছে ব'লেই আমার অক্ষমতা জানিয়ে আপনার মত জান্‌তে চাচ্চি। যদি আপত্তি না থাকে ত দুটো একটা কথা বল্‌বার সাধটা মিটিয়ে নিই। আমার বিজয়ার শ্রদ্ধা গ্রহণ করিবেন।—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা]

বাজে শিবপুর,
২৯শে পৌষ ১৩২৪।

শ্রীচরণেষু,—আজ আমরা আপনার কাছে যাইতেছিলাম। কিন্তু, পথে শ্রীযুক্ত প্রমথবাবু[১]র কাছে টেলিফোঁ করিয়া শুনিলাম আপনি বোলপুরে। মাঘোৎসবের সময় হয়ত আসিবেন, কিন্তু, তখন দেখা করা শক্ত।

আমাদের পাড়ায় একটি ছোটখাটো সাহিত্যসভা আছে। দু'এক মাস অন্তর কাহারো বাটীতে তাহার অধিবেশন হয়। নিতান্তই নগণ্য ক্ষুদ্র ব্যাপার। তবুও গতবারে আমরা প্রমথবাবুকে ধরিয়াছিলাম, তিনি দয়া করিয়া সভাপতি হইয়াছিলেন।

কয়েক দিন হইতে আমরা ক্রমাগত তর্কাতর্কি করিয়াও মীমাংসা করিতে পারিতেছি না, এ সভায় আপনার পায়ের ধূলা পড়ার কিছুমাত্র সম্ভাবনা আছে কি না।

এবার যখন বাড়ী আসিবেন, যদি অনুমতি দেন, আমরা গিয়া আপনার কাছে আবেদন করি।—সেবক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বাজে শিবপুর। হাবড়া।
২৬শে বৈশাখ ১৩২৯।

শ্রীচরণেষু,—ছেলেদের মুখে মুখে শুনিতে পাইয়াছিলাম যে আপনি আমার প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। উত্তেজনার সময় রাগের মুখে হয়ত আপনার সম্বন্ধে মিথ্যা কিছু বলিয়া থাকিব, কিন্তু যে ব্যক্তি ইহার সত্যাসত্য আপনার কাছে যাচাই করিতে গিয়াছিলেন তিনিও

১। প্রমথ চৌধুরী।

অপরাধ কম করেন নাই। ইংলণ্ডের ব্যবহারে আপনি ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং সমস্তই ওই পাঞ্জাব চিঠিখানার জন্য, ওটা না লিখিলে এ সকল কিছুই হইতে পারে না,—এই কথাগুলা আমি যে ঠিক কি ভাবে তখন বলিয়াছিলাম আমার মনে নাই; বানাইয়া মিথ্যা কথা আমি সচরাচর বলি না, কিন্তু বলা একেবারেই যে অসম্ভব তাহাও নয়। অন্ততঃ, এ সব নিশ্চয়ই বলিয়াছি যে এবার বিলাত হইতে ফিরিয়া আপনি অনেক বদলাইয়া গিয়াছেন এবং বাঙ্‌লা দেশের লোকের প্রতি আপনার পূর্ব্বের সে স্নেহ মমতা আর নাই। চরকা, নন-কো-অপারেশন প্রভৃতির উপর আপনার কোন আস্থা বা বিশ্বাস নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আপনার নিকট হইতে একদিন আমি রাগ করিয়াই চলিয়া আসিয়াছিলাম। তাহার পরেই হয়ত কতকগুলা মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া থাকিব। হয়ত আমার মনের মধ্যে এ ভাব ছিল যে লোকে ভুল বুঝে ত বুঝুক।

আপনার কাছে আমি অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু এই প্রথম বলিয়া আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। আপনি ছাড়া আর কোন বড়লোকের বাড়ীতে আমি ইচ্ছা করিয়া কোনদিন যাই না, আমার সে পথটাও নিজের দোষে বন্ধ হইয়াছে মনে হইলে ভারি দুঃখ হয়।

আপনার অনেক শিষ্যের মধ্যে আমিও একজন; তাহাদের মত এত কাল আমিও কখনো আপনার নিন্দা করিতে যাই নাই, কিন্তু এবার কেন যে আমার এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হইল জানি না।

আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি।—সেবক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বাজে শিবপুর। হাবড়া।
২৯শে বৈশাখ '২৯।

শ্রীচরণেষু,—ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য আপনি দেশের অমঙ্গল করিবেন এত বড় অপবাদ যদি দিয়াই থাকি ত তাহার পরেও চিঠি লিখিয়া আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করিতে যাওয়া শুধু বিড়ম্বনা নয়, আপনাকে বিদ্রূপ করা। অতএব, আপনার পত্রের স্বর যে এরূপ কঠিন হইবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

আমার অপরাধের কথা যাঁহারা আপনাকে জানাইয়াছেন তাঁহারা সীমা আর কোথাও ইহার রাখেন নাই। ইহার পরে আমি আর কি বলিব।

আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন।—সেবক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বাজে শিবপুর। হাবড়া
২রা মাঘ '৩০।

শ্রীচরণেষু,—সহস্র প্রকার কাজের মধ্যে সম্প্রতি আপনার যে কিছু মাত্র অবকাশ নেই সে আমরা সকলেই জানি। তবুও আমি এই ভেবে লিখেছিলাম যে গান আপনার কাছে কথা কহার মতই সহজ, অথচ, একমাত্র এর জোরেই আমার নাটকের সব ত্রুটি ঢেকে যেতো।

সত্যেন্দ্র বেঁচে থাক্‌লে আপনার এই চিঠিখানি দেখিয়ে আজ তার কাছ থেকে অনায়াসে গান আদায় ক'রে আন্‌তে পারতাম। এ চিঠি তার কাছে প্রায় আদেশের মত হোতো। কিন্তু সে পরলোকে এবং আর কেউ নেই যে গিয়ে বলি।

কলকাতায় এসে আপনার ত নিঃশ্বাস নেবার সময় থাকে না। তখন এই নিয়ে উৎপাত করতে আমি পেরে উঠ্‌ব না। আমার শত কোটী প্রণাম গ্রহণ করবেন। ইতি—সেবক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

[শ্রীঅমল হোমকে লেখা]

বাজে শিবপুর,—হাওড়া

১৬—৮—১৯

পরম কল্যাণীয়েষু,—

অমল, 'ভারতী'র আড্ডায় সেদিন শুনলাম তোমারও নাকি খুব ফাঁড়া গিয়াছে।[১] ইংরেজের মারমূর্ত্তি খুব কাছে থেকেই দেখে নিলে ভাল করে। এ একটা কম লাভ নয়। আমাদের মোহ কাটাবার কাজে এরও প্রয়োজন ছিল। দরকার মনে করলেই ওরা যে কত নিষ্ঠুর কতটা পশু হতে পারে, তা ইতিহাসের পাতাতেই জানা ছিল এতদিন—এবার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হ'ল।

আর এক লাভ—দেশের বেদনার মধ্যে আমরা যেন নতুন করে পেলাম রবিবাবুকে[২]। এবার একা তিনিই আমাদের মুখ রেখেছেন।

'নারায়ণের' সময় সি. আর. দাশ একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, রবিবাবু যখন নাইটহুড নেন, তখন নাকি দাশ সাহেব কেঁদেছিলেন। এখন একবার তাঁর দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করতাম, আজ আমাদের বুক দশ হাত কি না বলুন।

তোমার কাগজের নামই শুনেছি—কখনো চোখে দেখি নি। পাঠিও না দু-একখানা। তোমার এডিটর[৩] ত এখন জেলে। চালাও জোরসে! তোমার নাম-ডাক এখান থেকে শুনেই আমরা খুশী হই। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১। এই চিঠিখানি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সময় লেখা। অমলবাবু এই সময় লাহোরের দৈনিক 'ট্রিবিউন' পত্রের সহিত যুক্ত ছিলেন।

২। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট রবীন্দ্রনাথকে যে "নাইট্" উপাধি দিয়েছিলেন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ তা ত্যাগ করেন।

৩। কালীনাথ রায়।

বাজে শিবপুর। ১২ই ভাদ্র, '৩০

অমল,—আমাকে বিসর্জ্জনটা[১] দেখাও। শুনলাম আবার না কি হবে। সেদিন সুধীরের[২] -দোকানে গিয়ে ওকে নিয়ে যাওয়া আর হয়ে উঠল না। তোমাদের কাগজে ভুনি বোসের প্রশংসাটা[৩] পড়ে যেতে না পারার দুঃখটা আরও যেন বেড়ে গেল। আচ্ছা, ও লেখাটা সত্যিকার বল তো কার? অমন ইংরেজী কি ও বুড়ো লিখতে পারে? এ যে রীতিমত মুন্সিয়ানা!

যাকগে ইংরেজী। আমি ওর কি-ই বা বুঝি? অভিনয়টা কিন্তু সত্যিই বুঝি। সখের থিয়েটার অনেক করেছি। ফীমেল পার্টও বাদ যায় নি। রবিবাবুর অভিনয় দেখি নি কখনো। সুরেশ সমাজপতির কাছে তার গল্প শুনেছিলাম একবার। লোকটাকে হয়ত তোমরা রবিবাবুর নিন্দুক বলেই জান। একবার যদি তাঁর মুখে সঙ্গীত-সমাজে রবিবাবুর বিসর্জ্জন অভিনয়ের গল্পটা শুনতে! অতএব ও বস্তু না দেখে মরছি না। তুমি এই চিঠি পেয়েই খবর নেবে আবার কবে হচ্ছে, আর দুখানা দশ টাকার টিকিট কিনবে। তার পর আমাকে জানাবে ও যথাসময়ে এম্পায়ারের সাম্‌নে হাজির থাকবে। কিন্তু তোমারও কি টিকিট লাগবে অমল রবিবাবুর অভিনয়ে? তা লাগে লাগুক।

তোমাদের—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১। বিশ্বভারতীর সাহায্যকল্পে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকখানি এই সময় কলকাতায় এম্পায়ার থিয়েটারে অভিনীত হচ্ছিল। এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জয়সিংহের ভূমিকায় নেমেছিলেন।

২। এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্সের অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার।

৩। বিসর্জন অভিনয় দেখে নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু (থিয়েটার-মহলে 'ভুনি বোস' নামে পরিচিত) কলকাতার ইংরেজী দৈনিক 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজে' এক সুদীর্ঘ প্রশস্তি প্রকাশ করেছিলেন।

বাজে শিবপুর,
৪ঠা আশ্বিন-'২৬

৺ সবিনয় নিবেদন,—আপনার পত্রখানি আমি দুইবার করিয়া পড়িয়াছি। আমার সেই পত্রখানির অংশবিশেষ যদি আপনার কোন কাজে আসে ত আমি খুশীই হইব। যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন আমার লেশমাত্র আপত্তি নাই। তবে আমার চিঠি লেখার প্রণালী এত কাঁচা, এত এলোমেলো যে ভাষার দিক দিয়া একটু লজ্জা করে। মহেন্দ্রবাবু, আমি কেবল দুইটি জাতি মানি। আমার আন্তরিক বিশ্বাস কোন মানুষেরই কোন একটা সুনির্দ্দিষ্ট জাতি নাই, জাতি আছে কেবল মানুষের হৃদয়ের,—মস্তিষ্কের। সে কেমন জানেন? এই ধরুন আপনি নিজে। আপনার শিক্ষা, আপনার হৃদয়ের প্রশস্ততা, ইহার স্বদেশপ্রীতি, স্বজাতির দুঃখে বেদনা বোধ, ইহার উদ্যম, ইহার আন্তরিকতা,—এইগুলিই বড় জাতীয়। যে আধারে ইহারা বাস করে সেই আধারটাই উঁচু জাতের। নইলে ব্রাহ্মণই কি আর দুলে-বাগ্দীই বা কি—ওইগুলো না থাকিলে কেবলমাত্র জন্মপত্রিকার লেখাগুলাই কোন মানুষকে কোনদিন উচ্চ পদ দিতে পারিবে না। সে লেখা সোনার জল দিয়া মহামহোপাধ্যায়ের কলম হইতে বাহির হইলেও না।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বেশ নাম। ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের সঙ্গে সঙ্গে ও কথাটাও ব্যবহার করিতে করিতে ক্রমশঃ একটা বাদ দিলেই চলিয়া যাইবে।

আপনি ঘৃণা দিয়া ঘৃণার প্রতিশোধ দিবার কথা লিখিয়াছেন। বোধ হয় আপনার কথাই সত্য। এ বিষয়ে আমার বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা নাই, সেই জন্য মতামত দিতে পারিলাম না। তবে, এটুকু বুঝিতে পারি কেবলমাত্র ভাল মানুষের দ্বারাই সংসারের সকল কাজ চলে না।

[কাজী আবদুল ওদুদ[১]কে লেখা]

বাজে শিবপুর। ২০. ৩. ১৮

সবিনয় নিবেদন,—দিন দুই হইল আপনার পত্র এবং 'মীর পরিবার' পাইয়াছি। শেষ গল্পটা (হামিদ) ছাড়া আর তিনটি গল্পই পড়িয়াছি। আজকালকার দিনে গল্প পড়িয়া আনন্দ পাওয়া এবং সুখ্যাতি করিতে পারা দুইই যেন কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। বই উপহার পাইয়া গ্রন্থকারকে দুটা ভাল কথা বলিতে, সর্ব্বান্তকরণে উৎসাহ দিতে পারি না বলিয়া আমি অতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া থাকি। আপনি সেই সুযোগ আমাকে দিয়াছেন বলিয়া আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।…

আপনার রচনার মধ্যে যে উর্দ্দু কথা ব্যবহার করিয়াছেন সে ভালই হইয়াছে। তা না হইলে মুসলমান পাঠক-পাঠিকা কখনই ইহাকে নিজেদের মাতৃভাষা বলিয়া অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারিত না। তাহাদের কেবলই মনে হইত ইহা হিন্দুদের ভাষা, আমাদের নয়। এই পাশাপাশি দুইজাতির মধ্যে সাহিত্যের সংযোগ সাধনের বোধ করি ইহাই সবচেয়ে ভাল উপায়। অবশ্য সকল সাহিত্যিকই এই মতের সপক্ষে নয়, কিন্তু, আমি নিজে এইরূপ রচনারই পক্ষপাতি।

তবে, একটি কথা আপনাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। আমি অনেক দিন এই ব্যবসা করিতেছি, হয়ত যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করিয়াছি, আশা করি, অযাচিত উপদেশ দিতেছি মনে করিয়া ক্ষুব্ধ হইবেন না। কথাটা এই যে, সকল জাতির মধ্যেই ভালমন্দ লোক আছে। হিন্দুর মধ্যেও আছে, মুসলমানের মধ্যেও আছে। এই সত্যটি বিস্মৃত হইবেন না। আর একটি কথা মনে রাখিবেন যে, গ্রন্থকার কোন বিশেষ জাতি, সম্প্রদায় বা ধর্ম্মের লোক নয়। সে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদি সমস্তই। ভবদীয় শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১। ইনি ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

[লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়[1]কে লেখা]

বাজে শিবপুর (হাওড়া)

২০।৭।১৯

পরম কল্যাণীয়াসু,—আপনার পত্র এবং 'মিলন' আদ্যোপান্ত পড়িলাম। আমার বই যে আপনার ভাল লাগে ইহার চেয়ে গ্রন্থকারের বড় পুরস্কার আর কি আছে। আপনি ভক্তির দাবী জানাইয়াছেন। ভক্তি যেখানে শুধু বিনয় নয়, সত্যকার বস্তু, সেখানে এ দাবী আছে বৈকি। তবে, ভক্তি কাহাকে করি সেটাও একটু বিচার করা আবশ্যক।

আপনার সহিত আমার পরিচয় নাই, সেই জন্য বেশি কিছু প্রশ্ন করা শোভা পায় না, তবুও জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, আপনি যখন ব্রাহ্মসমাজের নয়, তখন বিধবা-বিবাহ দিতে চান কেন?

এটা কি শুধু একটা ক্ষণিকের খেয়াল 'হেম ও গুণীর' অবস্থা দেখিয়া করুণায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে? এতে কি আপনার সত্যকার আপত্তি নাই? তা যদি থাকে, অথচ একটা 'মিলন' হইয়া গেলেও মনটা খুসি হয়—এই যদি হয় ত এ 'মিলনের' বিশেষ কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে করিতে পারি না।

তবে, লেখা হিসাবে অর্থাৎ রচনার ভাল-মন্দ বিচারে এ লেখার দাম ধার্য্য করিতে যাওয়া এটুকু চিঠির কর্ম্ম নয়।

আমার সকল বই আপনি পড়িয়াছেন কি না জানি-না। পড়িয়া থাকিলে নিশ্চয়ই অন্ততঃ এই ব্যাপারটা চোখে পড়িয়াছে যে অনেকগুলি বড় এবং সুন্দর জীবন শুধু বিধবা-বিবাহ সমাজে না থাকার জন্যই চির-দিনের জন্য ব্যর্থ নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। ইহার অধিক নিজের সম্বন্ধে বলিবার আমার নাই।—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১। কানপুর প্রবাসী জনৈকা মহিলা সাহিত্যিক।

বাজে শিবপুর। হাওড়া
২৯।৭।১৯

পরম কল্যাণীয়াসু,—আপনার পত্র পাইলাম। আমাকে চিঠি লিখিয়া প্রত্যুত্তরের আশা করাটা যে অত্যন্ত দুরাশা, আমার এই চমৎকার অভ্যাসটির খবর যে আপনি কি করিয়া সংগ্রহ করিলেন তাহাই ভাবিতেছি। কারণ, কথাটা এতবড় সত্য যে তাহার প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। যথার্থই লোকে আমার কাছে জবাব পায় না—আমি এম্‌নি অগাধ কুড়ে।

তবুও আপনাকে দু'খানা চিঠি লিখিয়া ফেলিলাম যে কি করিয়া, ভাবিতে গিয়া দেখি ঐ যে আপনি ভক্তির দাবী করিয়াছেন,—উহাই এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে। বস্তুতঃ, এই বস্তুটা মানুষকে দিয়া কত অদ্ভুত কার্য্যই না করাইয়া লয়। আমাকে যে বড় ভাইয়ের মত ভক্তি করে, তাহাকেই চিঠি লিখিতেছি, তাহার কথার উত্তর দিতেছি,—ইহার অন্তরে কি বিপুল অহঙ্কারই না প্রচ্ছন্ন থাকে!

আপনাকে আমি কিছুই শিখাই নাই, কখনো চোখেও দেখি নাই, কাহার কন্যা, কাহার বধূ, কি পরিচয় কিছুই জানি না, অথচ, নিজেকে যখন আপনি আমার ছোট বোন বলিয়া অভিহিত করিতেছেন,—এ সৌভাগ্য কদাচিৎ ঘটে,—তখন, এ ভাগ্য যাহার ঘটে, তাহাকে এক প্রকার নেশার মত পাইয়া বসে।

আমাকে না জানিয়া এবং হিন্দুঘরের বধূ হইয়াও আমাকে অসঙ্কোচে পত্র লিখিয়াছেন। ইহা সকলে পারে না সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া আমিও যে আপনাকে অসঙ্কোচে পত্র লিখিতে পারি প্রশ্ন করিতে পারি, এ আশঙ্কা আপনার মনের মধ্যে ছিল না বলিয়াই লিখিতে পারিয়াছিলেন, থাকিলে পারিতেন না। এতটুকু বিশ্বাস আমার প্রতি

আপনার ছিলই। না হইলে এতগুলা বই লেখা আমার বৃথাই হইয়াছে।

বেশ, ছোট বোনের মত তুমি যখন খুসি আমাকে চিঠি লিখো। আমার সত্যকার শিষ্যা এবং সহোদরার অধিক একজন আছে, তাহার নাম নিরুপমা। আজ সাহিত্যের সংসারে সে আপনার বোধ করি অপরিচিত নয়, 'দিদি' 'অন্নপূর্ণার মন্দির' 'বিধিলিপি' ইত্যাদি তাহারই লেখা। অথচ, এই মেয়েটিই এক দিন যখন তাহার ষোল বৎসর বয়সে অকস্মাৎ বিধবা হইয়া একেবারে কাঠ হইয়া গেল, তখন আমি তাহাকে বার বার করিয়া এই কথাটাই বুঝাইয়াছিলাম, "বুড়ি, বিধবা হওয়াটাই যে নারীজন্মের চরম দুর্গতি এবং সধবা থাকাটাই সর্ব্বোত্তম সার্থকতা ইহার কোনটাই সত্য নয়।" তখন হইতে সমস্ত চিত্ত তাহার সাহিত্যে নিযুক্ত করিয়া দিই, তাহার সমস্ত রচনা সংশোধন করি এবং হাতে ধরিয়া লিখিতে শিখাই—তাই আজ সে মানুষ হইয়াছে, শুধু মেয়ে-মানুষ হইয়াই নাই।

এইটি আমার বড় গর্ব্বের জিনিস।

তুমি লিখিয়াছ, যে স্বামীকে জানিল না চিনিল না তেমন বালবিধবার আবার বিবাহ দিতে দোষ কি? তোমার মুখে এই কথাটার অনেক দাম। এবং আমার লেখা যদি একটিও বালবিধবার প্রতি তোমার এই করুণা জাগাইতে পারিয়া থাকে ত আমারও বড় পুরস্কার পাওয়া হইয়াছে।

এইবার তোমার লেখার সম্বন্ধে কিছু বলিব। আজকাল রাশি রাশি বাঙ্‌লা উপন্যাস বাহির হইতেছে। ইহাতে দু'টা জিনিস আমি লক্ষ্য করিয়াছি। প্রথম, পুরুষদের লেখা বইগুলা প্রায়ই যে অন্তঃসারহীন অপাঠ্য বই হইতেছে,—শুধু এই নয়, ইহাদের পোনর আনাই অত

লোকের চুরি। এবং ইহাতে তাহারা লজ্জা পর্য্যন্ত অনুভব করে না। বই বিক্রী হইলেই তাহারা যথেষ্ট মনে করে।

দ্বিতীয় এই দেখিয়াছি মেয়েদের লেখা বইগুলা আর যাহাই হোক, সেগুলা অন্ততঃ কাহারো চুরি নয়। তাহারা যাহা কিছু ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে দেখিয়াছে, নিজের জীবনে যথার্থ অনুভব করিয়াছে তাহাই কল্পনা দিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং তাহাতে কৃত্রিমতাও বেশি থাকে না।

তোমার লেখায় যে সৎসাহস ও সরলতা আছে, তাহা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। রচনা হিসাবে খুব ভাল না হইলেও ইহার অকৃত্রিমতাই ইহাকে সুন্দর করিয়াছে। আমার পরিশিষ্ট লিখিতে গিয়া আর সময় নষ্ট করিয়ো না,—স্বাধীনভাবে বই লিখিয়ো, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুমি কাহারো চেয়ে হীন হইবে না।

এইখানে তোমাকে আর একটা উপদেশ দিয়া রাখি। নারীর স্বামী পরম পূজনীয় ব্যক্তি, সকলের বড় গুরুজন। কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীও দাসী নয়। এই সংস্কার নারীকে যত ছোট, যত ক্ষুদ্র, যত তুচ্ছ করে এমন আর কিছু নয়।

যখনই বই লিখিবে এই কথাটাই সকলের বেশি মনে রাখিতে চেষ্টা করিবে।

স্বামীর বিরুদ্ধে কদাচ বিদ্রোহের সুর মনে আনিতে নাই, কিন্তু স্বামীও মানুষ, মানুষকে ভগবান বলিয়া পূজা করিতে যাওয়া কেবল নিষ্ফল নয়, ইহাতে নিজেকে এবং স্বামীকে উভয়কেই ছোট করিয়া তোলা হয়।

তোমাকে আর একটা প্রশ্ন করিব। "যে বিধবা স্বামীকে জানে নাই চিনে নাই…"

কিন্তু যে একবার জানিয়াছে চিনিয়াছে—অর্থাৎ যে ষোল সত বছর বয়সে বিধবা হইয়াছে, তাহার সুদীর্ঘ জীবনে আর কাহাকেও ভাল বাসিবার বা বিবাহ করিবার অধিকার নাই? নাই কিসের জন্য একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবে, ইহার মধ্যে শুধু এ সংস্কারটাই গোপন আছে যে স্ত্রী স্বামীর জিনিস। স্ত্রীর নারী বলিয় আর কোন স্বাধীন সত্তা নাই।

"হেম সংশয়ের মধ্যেই দিন কাটাইতেছিল। যাহার দৃঢ়তা না তাহার কি বন্ধনই ভাল নয়?"

বন্ধন কেবল তখনই ভাল যখন এই প্রশ্নটার শেষ মীমাংসা হই যাইবে যে বিবাহই নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেয়ঃ।

অথচ, আমি কোথাও বিধবার বিবাহ দিই নাই। এইটি তোমা কাছে আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইতে পারে।

তার উত্তর এই যে সংসারে অনেক আশ্চর্য্য দ্রব্য আছে, এ চেষ্টা করিয়াও তাহার হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো।—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মঙ্গলবার, ৫ই আগষ্ট '১৯

বাজে শিবপুর—হাওড়া

পরম কল্যাণীয়াসু,—আপনার খাতা এবং ভিতরের অন্যান্য লেখাগু যথাসময়ে পাইয়াছি, এবং এত সত্বর উত্তর দিতে বসিয়াছি দেখিয়া অত্য আত্মপ্রসাদ্‌লাভ করিতেছি। মনে হইতেছে এইবার আপনাকে অনে কথা বলা প্রয়োজন। কিন্তু আপনার মত গুছাইয়া পত্র লিখিবা শক্তি আমার এত অল্প যে হিতৈষী বন্ধুরা বেশ স্পষ্ট করিয়াই শুনাই দেন যে, আমার একান্ত বিশৃঙ্খল ও ছেলেমানুষের মত এলোমে

পত্রের সমস্তটুকু পড়িয়া উঠিতে তাঁহাদের ধৈর্য্য রক্ষা করা দায় হইয়া উঠে, এবং যদিচ কোনমতে তাহা শেষ হয় ত মানে বুঝিতে গলদঘর্ম্ম হইতে হয়। অভিযোগটা নিতান্ত যে ভিত্তিহীন নয় তাহা অতিবড় বিনয়ের দোহাই দিয়াও প্রতিবাদ করা চলে না। এবং ইহার নমুনা হইতে যে আপনাকে বঞ্চিত করি নাই এ সংবাদ গোপনে যদি আপনার বন্ধুবান্ধবের কাছে প্রকাশ করেন ত আমি অভিমান করিব না।······

আমার অনেক ব্রাহ্ম মহিলা বন্ধু আছেন। তাঁহাদের পত্র লিখিতে এবং বন্ধুর মতই অসঙ্কোচে লিখিতে আমার বাধ-বাধ করে না। কিন্তু আমাদের সমাজ এবং তাহার বিধি-বিধান এমন যে ছোট বোনটিকেও চিঠি লিখিতে শুধু সঙ্কোচ নয় শঙ্কা হয়, পাছে, আপনার অভিভাবক বা স্বামী কিছু মনে করেন এবং সেজন্য আপনাকে দুঃখ পাইতে হয়।···তবুও যে আপনাকে এত কথা লিখিতে বসিয়াছি তাহার এইমাত্র কারণ যে, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা তাহাতে আপনার পত্র পড়িয়া এই কথাই আমার বার বার মনে হইয়াছে যে-বয়সে নারীর আত্মমর্য্যাদা জন্মে ইহা সেই বয়সের লেখা। এই গাম্ভীর্য্য, এই সাহস ও সংযম স্ত্রীলোকের পঁচিশের এদিকে জন্মিতে আমি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য আপনার সম্বন্ধে আমার ভুল হইতেও পারে, কিন্তু ভুল না হইলেই আমি নিশ্চিন্ত হইব। কারণ, একান্ত তরুণ বয়সের অনাত্মীয় রমণীর সহিত পত্রের আদান-প্রদান করিতে কেন সঙ্কোচ ও দ্বিধা হয় যদি সে বয়স উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন ত অনায়াসেই বুঝিবেন। তবে সকলের চেয়ে বড় কথা এই যে আমাকে তুমি দাদা বলিয়া ডাকিয়াছ। দাদার কাছে ছোট বোনের লজ্জা করিবার বিশেষ কিছু নাই। বড় ভাইয়ের সম্মান এবং মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আমাকে যখন ইচ্ছা এবং যা ইচ্ছা হয়,

লিখিও এবং যত খুসি দাদার উপর অত্যাচার উপদ্রব করিয়ো আমি আনন্দই পাইব।'

তোমার চিঠির এবং লেখার ধরণ ও ভঙ্গী দেখিয়া আমার কেবল বুড়িকে মনে পড়ে। তোমাদের হাতের লেখাটা পর্য্যন্ত যেন এক।

এই ৪।৫ দিন জলে ভিজিয়া জ্বরের মত হইয়াছে,—কোথাও বার হইতে পারি নাই বলিয়া তোমার খাতাখানা বেশ মন দিয়া পড়িবার অবকাশ পাইয়াছি। পড়িতে পড়িতে কি মনে হইয়াছে জানো? একটা দামী জিনিসের দোকান অগোছালো এলোমেলো হইয়া পড়িয়া থাকিলে যে জিনিসের দাম জানে তার যেমন কষ্ট বোধ হয়—ঠিক তেমনি। ঠিক এই অবস্থায় এক দিন বুড়ির লেখাগুলা পাইয়াছিলাম।

তোমার অনেক দামের মালমশলা মজুদ আছে দিদি, কিন্তু বড় বিশৃঙ্খল। আমার ব্যবসাও এই বলিয়া খালি মনে হয় তার মত তোমাকেও যদি হাতে ধরিয়া বছরখানেকও শিখাইতে পারিতাম ত ইতিপূর্ব্বে আমি যে আশীর্ব্বাদ তোমাকে করিয়াছিলাম তা শাখায় শাখায় ফুলে ফলে ফুটিয়া উঠিতে বেশি দেরি হইত না। 'দিদি'র মত আর একখানা বই লোকের চোখের উপর পড়িতে অতি অল্প সময়ই লাগিত। কিন্তু সে যখন হইবার নয় তখন দুঃখ করিয়া আর কি করিব! মনে ভাবি এমনতর কত শতই না শুধু একটুখানি শেখানোর অভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কে তাহার খবর রাখে? শুধু যে সব আবর্জ্জনা, যারা কেবল চুরি করা ছাড়া আর কোন শক্তিই ধরে না তারাই কেবল ঝুড়ি ঝুড়ি খোঙ্রা দিয়া বাঙলা সাহিত্যকে দূষিত এবং ভারাক্রান্ত করিতেছে। যারা সংসারে সত্য উপলব্ধি করিয়াছে, নিজের প্রাণ দিয়া যারা স্নেহ প্রেমের স্বরূপ অনুভব করিয়াছে, তারা আড়ালেই পড়িয়া থাকে। দুঃখের আগুনে পুড়িয়া যাদের অনুভূতি শুদ্ধ ও সৎ হইতে

পায় নাই,—তাদের উপরেই আজকাল সাহিত্যসৃষ্টির ভার পড়িয়াছে বলিয়াই বাঙ্‌লা সাহিত্য আজকাল এমন করিয়া নীচের দিকে চলিয়াছে।

লীলা, কেবল হৃদয়ে অনুভব করিলেই একটা জিনিস ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সমস্ত জিনিসই কিছু-না-কিছু শিখিতে হয়, এই শেখাটা কেবল নিজে নিজেই সব সময়ে হয় না। কিন্তু কি করিব দিদি, তোমাকে শিখাইয়া নিরুপমার মত করিয়া তুলিতে পারি সে অবকাশ ত নাই। আর যা নাই তার জন্য আপশোষ করিয়াই বা কি হইবে।

যাই হোক, তোমাকে মোটামুটি একটা উপদেশ দিই। রচনায় 'অধ্যায়' ভাগ করিতে হয়, এবং গ্রন্থকারের মুখে রচনার বিষয়টা চোদ্দ আনা না দিয়া পাত্র-পাত্রীর মুখে দিতে হয়। শুধু যেখানে তাহা পারা যায় না সেইখানেই কেবল গ্রন্থকারের মুখের কথায় পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না। আর একটা কথা এই যে, বেশি খুঁটিনাটি লইয়া আপনাকে এবং পাঠককে কাহাকেও দুঃখ দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। অনেক জিনিস তাহাদের কল্পনার জন্য ফেলিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু কতটা পাঠকেরা সম্পূর্ণ করিয়া লইবে এই জিনিসটা শিক্ষাসাপেক্ষ। এবং বুদ্ধিসাপেক্ষও বটে।

এখন হইতে তোমার সত্যকার শিক্ষা আরম্ভ হোক। অধ্যায় ভাগ করিয়া আমার বইয়ের ধরণে লিখিতে সুরু কর এবং দুটো অধ্যায় লিখিয়া আমাকে পাঠাও। আমি কাটিয়া কুটিয়া (আমার সামান্য শক্তির মত) তোমাকে ফিরিয়া পাঠাইব। এবং তাহারই পাশে পাশে কেন কাটিলাম তাহার কৈফিয়ৎ লিখিয়া দিব।

এই পরিশ্রমটা আমি কেন করিব জানো লীলা? তোমাকে দিয়া সত্যই সাহিত্যের মন্দিরে কিছু পূজার জিনিস জোগাড় করিব বলিয়া। এবং এ আশাও করি সে-জিনিস বড় সামান্য মূল্যের হইবে না। তোমার মধ্যে এ জিনিসের মূল্য স্পষ্ট দেখিতে না পাইলে তোমাকে শুধু শুধু

গোটাকতক মন-রাখা ভদ্রতার কথা বা ইতর কথায় খোষামোদ করিয়া নিজের এবং তোমার উভয়েরই সময় নষ্ট করিতাম না।

আমার এই কথাটা মনে রাখিয়ো, আমার আশীর্ব্বাদে তুমি কাহারো চেয়ে কম হইবে না।

তোমার খাতাখানা ২।৪ দিন পরে ফিরাইয়া পাঠাইব। "কালো" গল্পটাকে অধ্যায় ভাগ করিয়া পরিণীতার ধরণে আর একবার পাঠাইতে পারো না? দিদি, প্রথমে অনেক দুঃখ অনেক কষ্ট করিতে হয়, অসহিষ্ণু হইলে হয় না। এ জিনিস এত দুঃখ এত পরিশ্রমের বলিয়াই ইহার এত মূল্য! অনেক পরিশ্রমই বৃথা যায় বলিয়া প্রথমে মনে হয় বটে, কিন্তু, কোন পরিশ্রমই কোনদিন সত্যসত্যই নষ্ট হয় না,—আর এক ভাবে ফিরিয়া আসে। রাত্রি অনেক হ'ল, উপরে যাবার জন্যে তিনি ভয়ানক চেঁচামেঁচি করচেন—তাই আজ এইখানেই শেষ করি। আজও পেটে ভাত পড়ে নি ব'লে বোধ করি চিঠিখানা আরও গোলমেলে হয়ে গেল,—একটু কষ্ট ক'রে পোড়ো এবং কোথাও যদি কোন কথা অসংলগ্ন থাকে বড়দাদা ব'লে মাপ কোরো। আমার আশীর্ব্বাদ জেনো।

রাত্রি ১২৷৷০টা। তোমার দাদা

যখন বুঝিব তখন আমি নিজেই মাসিকপত্রে ছাপিতে দিব। আমি দিলে কোন সম্পাদকই কখনো 'না' বলে না। তাহারা জানে আমি উপযুক্ত না হইলে দিই না।

সংসারের কাজে নাকি তোমার সময় খুব কম। হইবারই কথা তবুও এই কথাটাই সত্য যে অনবকাশের মধ্যেই হয়ত বা কখনো কখনো সময় পাওয়া যায়, কিন্তু অবকাশের মধ্যে কোনকালে কাজ করিবার অবসর পাওয়া যায় না।

বাজে শিবপুর, হাওড়া
১৪.৮.১৯

পরম কল্যাণীয়াসু,—কাল এবং আজ তোমার বড় এবং ছোট্ট দুখানি চিঠিই পেলাম। প্রথমেই নিজের খবরটা দিই। আমি চিরকালই সমস্ত দোর জানালা খুলে শুই। সেদিন রাত্রি চারটের সময় ঘুম ভেঙে দেখি বিছানা বালিশ গায়ের জামা কাপড় সমস্ত বৃষ্টির ছাটে এম্‌নি ভিজেচে যে শীত করচে। দুর্ভাগ্য আবার এমন যে সেদিন বিকেল বেলাতেও বার হয়ে পথে কম ভিজি নি,—দুটোতে জড়িয়ে একটু জ্বরের মত হ'ল কিন্তু এক দিনেই সারলে না,—বাড়তেই লাগল। এখন ওটা সেরেছে। দ্বিতীয় দফায় আরো চমৎকার। ক'দিন থেকে ডান পায়ের হাঁটুর খানিকটে নীচেয় এত জ্বালা আর চুলকোতে লাগল যে অস্থির হয়ে উঠ্‌লাম। দিন-চারেক পূর্ব্বে একদিন সকালে উঠে দেখি খানিকটে যায়গা লাল হয়ে ঠিক যেন একজিমার ভাব হয়েচে। একটু একটু ফুলেও আছে। কিছু দিন থেকে শুন্‌ছিলাম এদিকে খুব বেরি-বেরি হচ্চে। ওটা যে কি পদার্থ তা আজও দেখবার সুযোগ পাই নি, ভাবলাম বুঝি, আমাকেই ধরেচে। ভয়ে যাই আর কি! ক'সে টিনচার আইডিন লাগাতে সুরু ক'রে দিলাম,—কিন্তু বার কয়েক ঘন-ঘন লাগাবার পরে সে এমন মূর্ত্তি ধারণ করলে যে, তার চেয়ে বুঝি সত্যিকারের বেরি-বেরি হওয়াই ছিল ভাল। ডাক্তার এসে ভয়ানক বকৃতে লাগলেন,—আপনার কি এতটুকু কোন বিষয়ে সবুর নেই? এবার না হয় কষ্টিক কিম্বা এ্যাসিড-ট্যাসিড লাগিয়ে যা পারেন করুন আমি চল্‌লাম। যাই হোক পরে ঠাণ্ডা হয়ে ওষুধ আর মালিসের ব্যবস্থা ক'রে হুকুম ক'রে গেলেন, পা দুটো একটা তাকিয়ায় তুলে যেন চুপ ক'রে শুয়ে থাকি। কি করি দিদি, তাই আছি। তৃতীয় দফায়,—কোন কালে আমি

অম্বলের রুগি নই। এত কম খাই যে অম্বল পর্য্যন্ত আমার কাছে ঘেঁসে না, পাছে তাকেও বা অনাহারে শুকিয়ে মরতে হয়। কি যে সেদিন জোর ক'রে ছাই পাঁশ কতকগুলো ঘরের তৈরি করা সন্দেশ খাইয়ে দিলে যে আজও যেন তার ঢেঁকুর উঠ্‌চে। আমি এ-দেশের একটি বিখ্যাত কুড়ে। চিবোবার ভয়ে কোন জিনিস সহজে মুখে দিতে চাই নে,—আমার ধাতে ও-অত্যাচার সইবে কেন? কি বল দিদি, ঠিক না? কিন্তু বাড়ির লোকে বোঝে না, তারা ভাবে আমি কেবল না খেয়ে খেয়েই রোগা। সুতরাং খেলেই বেশ ওদেরই মত হাতী হয়ে উঠব। স্বর্গীয় গিরিশবাবু তাঁর আবুহোসেনে লাখ কথার একটা কথা ব'লে গিয়েছেন যে "অবলার বড় নোলা, তারা ম'লেও খায়।" মেয়েমানুষ জাতটাকে তিনি চিনেছিলেন! আজ বিশ বছর আমরা কেবল খাওয়া নিয়েই লাঠালাঠি ক'রে আস্‌চি। ঐ খেলে না, খেলে না—রোগা হয়ে গেল—ঘর-সংসার রান্না-বান্না কিসের জন্যে—যেখানে দু-চোখ যায় বিবাগী হয়ে যাবো—ইত্যাদি কত কি। আমি বলি, ওরে বাপু, বিবাগী হবে ত শীগ্‌গীর হও,—এ যে শুধু আমাকে ভয় দেখিয়ে দেখিয়েই কাঁটা ক'রে তুল্‌লে! বাস্তবিক, আমার দুঃখটা আর কেউ দেখলে না দিদি! আমি প্রায়ই ভাবি, সত্যিকার স্বর্গ যদি কোথাও থাকে ত সেখানে বোধ হয় এমন ক'রে একজন আর একজনকে খাবার জন্যে জবরদস্তি করে না! আর তা যদি হয় ত আমি যেন বরঞ্চ নরকেই যাই!

হাঁ, আরও একটা আছে। দিন কুড়ি আগে কুকুরের ঝগড়া থামাতে গিয়ে কোথাকার একটা ঘেয়ো কুকুর আমার হাতের তেলোতে আচ্ছা ক'রে দাঁত ফুটিয়ে দিয়ে পালাল। হতভাগা কুকুরটা কি অকৃতজ্ঞ! তাকেই আমি আমার 'ভেলু'র কবল থেকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম।

ভয়ে কাউকে এ কথা বলি নি, শুকিয়েও গিয়েছিল, কিন্তু কাল থেকে আবার যেন মনে হচ্চে ব্যথা হচ্চে।

কিন্তু আর নয়, আপাততঃ এইখানেই আমার শারীরিক কুশলের তালিকাটা মোটামুটি সম্পূর্ণ করলাম। তবে একটা সুখ এই যে বুড়ো হয়েচি। এখন থেকে এমনি একটা-না-একটা উপলক্ষ ক'রে ত চল্‌তে হবে। কত রকম-বেরকমের দুঃখ দৈন্য আপদ বিপদের মাঝখান দিয়ে ত আজ চল্লিশের কোটা পার হোলাম। শুনি আমাদের বংশে আজও কেউ চল্লিশ পৌঁছোন নি। সে হিসেবে ত অন্ততঃ পিতৃ-পিতামহদের হারিয়েছি! আর কি চাই!

যাক্ গে! বুড়ো মানুষের বাঁচা-মরা নিয়ে আর তোমাদের উদ্বিগ্ন করতে চাই নে, কিন্তু তুমি ত দিদি তেমন ভাল নেই? শরীরে যত্ন কোরো,—এখন পরিশ্রম করার দরকার নেই, ভাল হয়ে বাড়ি ফিরে এসো তার পরে সব হবে। তোমার খাতার লেখাগুলো ত মন দিয়েই পড়লাম,—সমস্তই আছে তাতে, নেই শুধু একটু শিক্ষা। সাহিত্য রচনা করবার কৌশলটাও ত আয়ত্ত করা চাই, ভাই, নইলে শুধু শুধু ত নিজের অনুভূতি মাত্র সম্বল ক'রেই কাজ হবে না। কিন্তু আমি এই ব্যবসাই ত করি, ঠিক জানি এটুকু শিখিয়ে নিতে আমার বেশি দেরি লাগবে না। কতটুকু লিখতে হয়, কোন্‌টা বাদ দিতে হয়, কোন্‌টা চেপে যেতে হয়—

"ঘটে যা তা সব সত্য নয়,
কবি তব মনভূমি, রামের জন্মস্থান
অযোধ্যার চেয়ে ঢের সত্য জেনো।"

এতবড় সত্য কথা আর নেই। দিদি, যত ঘটনা ঘটে তার সবটুকু ত লিখতে নেই—কতক পরিস্ফুট ক'রে বলা, কতক ইঙ্গিতে সারা, কতক

পাঠকের মুখ দিয়ে বলিয়ে নেওয়া। অবশ্য, যতটুকু তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম, কেবল চিঠি লিখে কেটে কুটে দিয়ে দূর থেকে ব'সে ততটুকু হবে না, তবুও চেষ্টা করতে হবে বৈকি। আর যদি এবারেও শীতের পূর্ব্বে বেরিয়ে পড়তে পারি ত, তোমাদের ঐ খোট্টার দেশেও না হয় ১০।১৫ দিনের জন্যে কাছাকাছি কোথাও একটা বাড়ি নিয়ে একটু সাহায্য করবার চেষ্টা করব। আর আমার সনাতন কুড়েমিই যদি সে সময়ে পেয়ে বসে ত বাস্ এই পর্য্যন্তই।

✓ …মহিলারা? তাঁরা নিরাপদে থাকুন, তাঁদের অনেকের কাছেই তোমাকে বার করতে বোধ করি আমার প্রবৃত্তি হয় না। একটা কথা খুলে বলি। ঐ দূর থেকে শুনতেই…মহিলারা! উচ্চ শিক্ষিতা! দু'চার জন ছাড়া আমাকে তাঁরা মনে মনে ভারি ভয় করেন; তাঁদের কেবলই মনে হয় আমি তাঁদের ভিতরটা বুঝি খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছি—তাই তাঁরা আমার সাম্‌নে কিছুতে স্বস্তি পান না,—অন্তরটা তাঁদের এমনি কৃত্রিম, এমনি সঙ্কীর্ণতায় ভরা! বস্তুতঃ এদের মত সঙ্কীর্ণ চিত্তের স্ত্রীলোক বাঙলা দেশে আর নেই! দিদি, আমি কোন কালে খাওয়া-ছোঁয়ার বাচবিচার করি নে, কিন্তু…মেয়েদের হাতে আমি কোন দিন কিছু খাই নে। শুধু খাই তাঁদের হাতে যাঁদের বাপ মা দু-জনেই ব্রাহ্মণ এবং বিয়েও হয়েচে: ব্রাহ্মণের সঙ্গে। …সমাজ-ভুক্ত হোন্ তাতে আসে যায় না, কিন্তু ঐ রকম মেশানো-জাত হ'লে আমি তাঁদের ছোঁয়া খাই নে। তারা বলে শরৎবাবু শুধু লেখেন বড়-বড় কথা, কিন্তু বাস্তবিক তিনি ভারি গোঁড়া। আমি গোঁড়া নই লীলা, কিন্তু শুধু রাগ ক'রেই এদের হাতে খাই নে। আর এটাও দেখেছ বোধ হয়…মেয়েদের মধ্যে সাড়ে পোনর আনাই কুরূপা। কেবল সাবান পাউডার আর জামা কাপড়ের দ্বারা, আর নাকি খোনা গলায়

কথা ক'য়ে যত দূর চলে! কেবল ৪।৫টি মেয়েকে দেখেছি তাঁরা সত্যিই শ্রদ্ধার পাত্রী। তাঁদের বি. এ. পাশ করা সত্বেও আমাদের বোনেদের সঙ্গে প্রভেদ করা যায় না। এতই ভাল, মনে হয় যেন তাঁরা হিন্দুর মেয়ে হয়ে আজও আছেন।

এই মেয়েদের নিন্দে করচি ব'লে হয়ত তোমার খুব রাগ হচ্চে, কিন্তু জানই ত দিদি, ভেতরে ভেতরে তোমাদের প্রতি আমার কত শ্রদ্ধা কত স্নেহ। শুধু তাদের ন্যাকামি, বিদ্যের জাঁক আর কুসংস্কার-বর্জ্জিত আলোর দম্ভ,—এবং যা সত্য নয় তার ভান—এই দেখেই আমার এত অরুচি।

তাদের কাছে তুমি হাসির পাত্রী হবে? কি বোল্‌ব, এদের ডজন-খানেক গাড়ী বোঝাই ক'রে যদি তোমাদের কানপুরে একবার চালান দিতে পারতাম! আর কিছু না হোক ভায়ার কাজে লাগতে পারত।

"দাদার মর্য্যাদা?" কি ক'রে জান্‌বে তোমার ত দাদা নেই!

তোমার স্বামীর উদার মতের কথা শুনে ভারি খুসি হ'লাম। আমি তাঁকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করচি। কিন্তু দিদি, একটি কথা তাঁকে বল্‌তে ইচ্ছে করে। আমি নিজে একবার ছেলেবেলায় ৬।৭ শত বাঙালী কুলত্যাগিনীর ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলাম। অনেক দিন, অনেক মেহন্নত, অনেক টাকা তাতে নষ্ট হয়, কিন্তু একটা আশ্চর্য্য শিক্ষাও আমার হয়েছিল। দুর্নামে দেশ ভ'রে গেল সত্যি, কিন্তু এই কথাটা নিঃসংশয়ে জানতে পারলাম, যারা কুলত্যাগ ক'রে আসে তাদের শতকরা প্রায় আশি জন সধবা! বিধবা খুব কম! স্বামী বেঁচে থাক্‌লেই বা কি, আর কড়া পাহারা দিয়ে রাখলেই বা কি! আর বিধবা হ'লেই বা কি! দিদি, অনেক দুঃখেই মেয়েমানুষে নিজের ধর্ম্ম নষ্ট করতে রাজী হয়, আর যে-জন্যে হয় সেটা পরপুরুষের রূপও নয়, একটা বীভৎস প্রবৃত্তির লোভও নয়।

তারা এতবড় জিনিসটা যখন নিজের নষ্ট করে তখন বাইরে গিয়ে কিছু একটা আশ্চর্য্য বস্তু পাবার লোভে নয়, কেবল কিছু একটা থেকে আপনাকে রেহাই দেবার জন্যেই এ দুঃখ মাথায় তুলে নেয়। এ-সকল কথা হয়ত তুমি সব বুঝবে না, আমার বলাও হয়ত সাজে না, কিন্তু— সবচেয়ে বড় কথা এই যে তুমি ত শুধু মেয়েমানুষই নও,—আমার ছোট বোন কি না! আর এ জিনিসটা সংসারে নিতান্ত তুচ্ছ জিনিসও নয়।

"কাহিনী"র ভেতরে কতটা সত্যি আর কতটা কল্পনা আছে জানি নে, কিন্তু কল্পনা যদি হয় ত বাহাদুরী আছে বটে! সাহসের ত অন্ত নেই দেখি! কে উনি? এখন পবিত্রর কথা একটু বলা চাই। তাকে আমি বেশি দিন জানি নে বটে, কিন্তু এটা জানি সে নির্ম্মলচরিত্র এবং সত্যিই খুব সৎ ছেলে! তোমাকে দিদি হয়ত বলতেও পারে। কারণ বয়সে হয়ত তোমার চেয়ে ২।৪ মাসের ছোটই হবে। তার কাছে কখনো কোন নারীর অমর্য্যাদা হবে না এই ত আমার বিশ্বাস। তাকে তুমি চিঠি লিখতে পারো কোন ক্ষতি নেই। আর তা ছাড়া তুমি নিজেও ত খাঁটি সোনা। কার কেমন সম্মান কেমন মর্য্যাদা সমস্ত তোমার কাছে বজায় থাকবে এই আমার দৃঢ় ধারণা। শুন্‌তে পাই সে নাকি এরি মধ্যে চারিদিকে রাষ্ট্র ক'রে বেড়াচ্চে যে অল্প দিনের মধ্যে বাঙ্‌লা সাহিত্যে আর একজন লেখিকার লেখা দেখতে পাওয়া যাবে যে কারও চেয়ে ছোট যায়গায় দাঁড়াবে না। কাল একটা লোক ওই মিলনটা ছাপাবার জন্যে আমায় খোসামোদ করতে এসেছিল। আমি দিই নি। বলি, কাগজের উপযুক্ত নয়। তাড়াতাড়ি দরকার ত নেই। অনেকে খুব ভাল বল্‌বে জানি, কিন্তু নিন্দে করবারও লোকের অভাব হবে না তাও জানি। আমি ধৈর্য্য ধ'রে এক বৎসর অপেক্ষা ক'রে যখন মাসিক পত্রে ছাপতে দেব, তখন এই সন্দেহটা থাকবে না।

আমি ত তোমাকে শিষ্যা করতে সম্মত হয়েচি, কিন্তু দেখো বোন্, শেষকালে বুড়ির মত যেন গুরু-মারা বিদ্যে পেয়ে বোসো না। সে তো আমার চেয়ে বড় হয়ে গেছেই, হয়ত বা শেষকালে তুমিও তাই হবে। সংসারে বিচিত্র কিছুই নয়,—কিছুই বলা যায় না।

কিন্তু এতে স্বীকার কোরব যখন তুমি লিখে জানাবে যে তুমি ভাল হয়ে গেছ, আর কোন অসুখ নেই। নইলে হার্ট ডিজিজের লোককে আমি সাক্‌রেদ কোরব না। আগে তাকে ডাক্তারের সার্টিফিকেট পেশ করতে হবে, তা কিন্তু জানিয়ে রাখচি। আমি কষ্ট ক'রে শেখাবো আর তুমি হঠাৎ স'রে প'ড়ে আমাকে পণ্ডশ্রম করাবে সে হবে না।

তুমি একবার লিখেছিলে "আপনার জানিত শ্রীরামপুর!" আর জয়রামপুরটা বুঝি অজানিত? তার ম্যালেরিয়া আর বোলতার মত মশার ঝাঁক সহজে ভুলতে পারে এমন মানুষ পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। গত বোশেখ মাসে এর ভয়েই বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণ নিতে পারি নি। জয়রামপুরের আর একটি মেয়ে আমাকে বলে দাদা, আর আমি বলি 'ছোড়্‌দি'।

ডিহরীতে যাচ্ছো? যখন তোমাদের জন্মও হয় নি তখন আমি ওই ডিহরীর ক্যানালের পাড়ে পাড়ে পাকা খিরনী কুড়িয়ে কুড়িয়ে বেড়াতাম আর ফাঁস ক'রে গিরগিটি ধরতাম। উঃ সে কত কালের কথা। তখন রেল হয় নি, ছোট ষ্টিমারে চ'ড়ে আরা থেকে যেতে হোতো। তোমাদের বাঙলোটাও আমি যেন চোখে দেখ্‌তে পাচ্চি। আচ্ছা, তোমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে ডানহাতি সূর্য্য উঠে না? তখনকার কালে ওদেশে একটা ঘাট ছিল সতীচওড়া না এমনি একটা কি নাম। বোধ করি তোমাদের ওখান থেকে মাইল দুই হবে। কিছু কাল ঐখানে বসেচি, কি জানি সে ঘাটের অস্তিত্ব আজও আছে কি না!

"ভবঘুরে"র ত কোথাও যেতে আসতে বাধে না কি না! আচ্ছা, বর্ম্মার অত কথা জান্‌লে কি ক'রে? ম্যাজিষ্ট্রেট (ডেপুটি) যে ওখানে *'মিউক' এ খবর কে দিলে? ম্যাণ্ডলে থেকে যে ল্যাঞ্চে যাতায়াতের পথ আছে সেই বা কে বল্‌লে? যদি যথার্থ ই বর্ম্মায় থেকে থাকো সে কোন্ যায়গায়?* ও দেশটার হেন স্থান তো নেই যেখানে এ দুটি পা একদিন না একদিন ঘুরে বেড়িয়েচে! অথচ আমার মত বাদশাকুড়েও দুনিয়ায় কমই আছে।

'রাজলক্ষ্মী'কে কোথায় পাবে? ও-সব বানানো মিছে গল্প। শ্রীকান্ত একটা উপন্যাস বইত নয়; ও-সব মিছে জনরবে কান দিতে নেই। 'কাহিনী'টি কি সত্যি? কার কাহিনী? তুমি বেঁচে থাকো দীর্ঘজীবী হও, মানুষ হও বার বার এই আশীর্ব্বাদ করি। আমার আদেশেও কখনো ভুলেও শরীর অযত্ন কোরো না। তোমাকে দেখি নি তবুও কেন জানি নে তোমার উপর আমার বড় স্নেহ জন্মেচে! ঐটে বোধ হয় তোমার কপালের লেখা। আমার এমন মনে হচ্চে যদি না এত কুড়ে হতুম ত হয়ত শীতকালে শুধু তোমাকেই দেখবার জন্যে কানপুরে যেতাম। কিন্তু সে যে কখনো হবে না তাও বুঝি।

তোমার ছেলে দুটিকে অনেক আশীর্ব্বাদ করচি। তার মা-বাপের গুণ যদি পায় ত সংসারে সার্থক হবে। কিন্তু তোমার নিজের বেঁচে থেকে মানুষ করা চাই। ম'রে গেলে কিছুতে চলবে না। তা হ'লে আমারও বোধ হয় সত্যিই ভারি কষ্ট হবে।—দাদা

সত্যি বলচি তোমার ঐ গোছানো চিঠি লেখার কাছে আমার এই এলোমেলো চিঠি পাঠাতে যেন লজ্জাই করে!

আজকের গল্পর প্রথম অধ্যায়ের কথা পরের চিঠিতে জানাবো।

বাজে শিবপুর। ৭ই ভাদ্র ১৩২৬

পরম কল্যাণীয়াসু,—তোমার চিঠি পেয়েছি। কয়েকটা দরকারী কথা আছে। বুড়ির ওপর আমার ভারি আশা ছিল, কিন্তু সে ঐ একটা 'দিদি' ছাড়া আর কিছুই লিখতে পারলে না। কেন জানো? বার-ব্রত জপ-তপ ইত্যাদি জ্যাঠামির আগুনে ভিতরে তার যা-কিছু মধু ছিল সব বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে গেল। অবশ্য আতিশয্যের জন্যেই, না হ'লে আমাদের ঘরের কোন্ মেয়ে আর এ-সব ব্যাপার কিছু কিছু না করে? যাক্। তোমার উপর আমার দ্বিতীয় আশা। তোমার যে বয়স এই বয়সই মানুষের রওনা হবার বয়স। তাই তোমাকে আমি শিখিয়ে নিতে চাই। আর এই জন্যেই তোমার কোন লেখা কোথাও ছাপাতে সম্মত হই নি। আমি নিশ্চয় জানি প্রথমে নিজের লেখা ছাপা অক্ষরে নিজের নামে দেখবার সাধ অনেকেরই হয়, কিন্তু এও জানি এক বছর তোমার সবুর সইবে।

কিন্তু শেখানোর সে সুবিধে নেই, থাকাও সম্ভব নয়। তবু একবার ওদিকে বোধ হয় যাবো, যেখানেই থাকি তোমার সঙ্গে একবার দেখা হওয়াই সম্ভব। তোমার হয়ত একবার মনেও হ'তে পারে এই ত এঁদেরই বই পড়ি তা প'ড়েও যদি শিখতে না পারি, ইনি দু'দিনে এমন কি শিখিয়ে আমাকে রাজা করবেন! এ-কথা খুব সত্যি, বাস্তবিকই এ শেখবার জিনিস নয়। তবু,—এই ধর না "তুলসী মৃত্যুকালে যখন তার···ইত্যাদি ইত্যাদি" আমি কিন্তু উপস্থিত থাকলে লেখবার আগে তোমাকে এই কথাটা ব'লে দিতাম, যে তুলসী মরেছে, যে সমস্ত গল্পের মধ্যে আর আসবে না, তার সম্বন্ধে পাঠকের বেশি কৌতূহলও থাকে না, সেটা আর্টের দিক্ দিয়েও অপল্‌কা। সুতরাং তার সম্বন্ধে প্রথমেই দু'পাতা ইতিহাস পাঠককে ক্লান্ত করে; আমি হ'লে কোথায় আরম্ভ

কোরতাম বলবার পূর্ব্বে এই কথাটা বলতে চাই, আরম্ভটাই সকলের চেয়ে শক্ত, এইটার উপরেই প্রায় সমস্ত বইটা নির্ভর করে।

ধরো যদি এমনি কোরে সুরু হতো—একদিন তুলসীর মৃতদেহ শ্মশানে ভস্মশেষে পরিণত হইয়া আসিতেছিল। তাহার তেরো বছরের মেয়ে মঞ্জরী অদূরে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার মুখের উপর নির্ব্বাণোন্মুখ চিতার দীপ্ত রশ্মি কতক্ষণ ধরিয়া যে বিচিত্র রেখায় খেলা করিতেছিল কেহ নজর করে নাই, হঠাৎ এক সময় তাহারই প্রতি তারা ঠাকুরাণীর চোখ পড়ায় তিনি যেন চমকিয়া গেলেন। মনে হইল ওই যাহার নশ্বর দেহের এইমাত্র সমাপ্তি হইল, সেই যেন অকস্মাৎ তাহার ছেলেবেলার মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তেমনি তুলনাহীন রূপ, তেমনি শান্ত মাধুর্য্য, মুখের উপর ঠিক যেন তেমনি বিষাদের গাঢ় ছায়া মাখানো। এবং এই সদ্য মাতৃহীনার মুখের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার চিন্তার সূত্র অতীত দিনের অনেক সুখ দুঃখের কাহিনীর ভিতর দিয়া ছায়াবাজীর মতো সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। তাঁহার মনে পড়িল সেই যেদিন তুলসী স্বামী হারাইয়া একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া তাঁহার বাড়িতে প্রথম পা দিয়াছিল, তাহার পরে কেমন করিয়া সে তাহার পূর্ণবিকশিত রূপের লাবণ্য লোকচক্ষু হইতে একান্ত গোপনে তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের সহিত একেবারে মিশাইয়া দিয়া ইত্যাদি…

এই অতীত দিনের ইতিহাসটা যতটা সংক্ষেপে সারিতে পারা যায় সারা আবশ্যক, কারণ এ-কথা মনে রাখিতেই হইবে বইয়ের মধ্যে আর সে আসিবে না, সুতরাং তাহার চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার খুব বেশি প্রয়োজন হয় না।

তার পরে গল্প লিখিতে গিয়া প্রথমে যাহাকে প্লট বলে তাহার প্রতিই অতিরিক্ত মন দেবার দরকার নাই। যে যে লোক তোমার

বইয়ে থাকিবে প্রথমে তাহাদের সমস্ত চরিত্রটা নিজের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া লইতে হয়। এই ধরো যাঁকে খুব জানো, তোমার বাবা কিম্বা তোমার স্বামী। তার পরে এই দুটি চরিত্র তাঁদের দোষগুণ লইয়া কোন্ কোন্ ব্যাপারের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে পারেন তাহাই ঠিক করিয়া লইতে হয়। ধরো তোমার বাবা তাঁর কাজের মধ্যে, তাঁর মামলা-মোকদ্দমার মধ্যে; তোমার স্বামী তাঁর বন্ধুর চাকরির মধ্যে, উদারতার মধ্যে বা ত্যাগের মধ্যে ভালো করিয়া সম্পূর্ণ হইতে পারেন,—তখনই কেবল গল্প বাঁধিবার চেষ্টা করা উচিত। নইলে প্রথমেই গল্পের প্লট লইয়া মাথা ঘামাইবার আবশ্যক হয় না। যাহার হয় তাহার গল্প ব্যর্থ হইয়া যায়।

আরও অনেক ছোটখাটো জিনিস আছে যেগুলো লেখার সঙ্গে সঙ্গে মুখে বলিয়া না দিলে চিঠিতে লিখিয়া জানানো শক্ত। এইগুলোই একদিন তোমাকে বলিয়া দিয়া আসিব। কিন্তু সেদিন যে কবে হবে সে আমার বিধাতা পুরুষই জানেন।…তুমি আমার অসংখ্য আশীর্ব্বাদ জানিও।—তোমার দাদা শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাজে শিবপুর। ২৪।১১।১৯

পরম কল্যাণীয়াসু,—কাল রাত্রে ১০½টায় দিদির বাড়ি থেকে ফিরে এসে আজ সকালে তোমার ও সরোজের চিঠি পেলাম। তার পত্র ইংরাজিতে। তেমন ইংরাজি জানি না বলিয়া ভাল বুঝিতে পারি নাই। বিদ্বান বন্ধুবান্ধব কেহ আসিলে পড়াইয়া লইয়া পরে জবাব দিব।

দিদির শাশুড়ীর কাজকর্ম্ম খুব ঘটা-পটা করিয়া সারা হইল। আমি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তাদের দেশে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বর বড্ড বেশি, গরীব দুঃখীরা মরচেও মন্দ না। ওষুধের বাক্স নিয়ে গিয়েছিলাম, নিজে গোটা দুই মাত্র মারিতে পারিয়াছি,—আর কিছুদিন থাকিতে পারিলে

আরও কোন্ না গোটা দুই তিন শিকার মিলিত! দুর্ভাগ্য,—কাবু হইয়া পড়িলাম (ওষুধ ও বিশেষ করিয়া পথ্যের অভাবেই,—তোমাদের ভগবানের শ্রীচরণে তাদের দ্রুত আশ্রয় মিলিতেছে।) তবু ফিরিয়া আসিয়াছিলাম আর কিছু ওষুধ ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে, কিন্তু মনে হইতেছে কাল সকাল নাগাদ নিজের জ্বরটাই বেশ সুস্পষ্ট হইতে পারিবে। আজকার দিনটা কোনমতে চাপা আছে। আর এম্‌নি চাপাই থাকে ত পরশু আবার যাইব।…তোমার দাদা

বাজে শিবপুর। হাওড়া।
৩০-৩-২১

পরম কল্যাণীয়াসু,—…বরিশাল কন্‌ফারেন্সে আমার যাবার বড় ইচ্ছা ছিল, শুধু আমার নতুন পাঠশালার কাজে এম্‌নি ব্যস্ত রইলাম যে সময় পেলাম না। নিজেকে এখন সাবেক পরিচিত সকল কাজের বাইরে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করচি, এতে অনেক প্রকারের সাংসারিক ত্রুটি, অনেক রকমের দুঃখ-কষ্টের ব্যাপার ঘটবে,—সেইগুলো সইবার এখন ডাক পড়েচে। তাছাড়া এই দীর্ঘ জীবনের জালে অনেক গ্রন্থি প'ড়ে গেছে, অথচ, ধীরে সুস্থে খোল্‌বার মত বয়সও হাতে নেই—কাজেই একটুখানি তাড়াহুড়োই চল্‌চে।

তোমার বাবার শরীর বোধ হয় আজকাল ভাল আছে—সরোজের চিঠি থেকে তাই যেন মনে হ'ল।

আমার খবরটা পৌঁছে দেবার লোক তুমি পাবেই—অতএব এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। দাদার চিরদিনের স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ তোমাদের প্রতি রইল,—তোমরা কেবল এই প্রার্থনা কর আর যেন বিক্ষিপ্ত না হই।…

তোমার দাদা—

বাজে শিবপুর—হাওড়া
২৭শে জুন '২১

পরম কল্যাণীয়াসু,—লীলা আজ তোমার চিঠি পেলাম। তোমাকে যে জবাব দিই নি তা নিতান্তই সময়ের অভাবে। যথার্থই দিদি এখন আমার এক মুহূর্ত্তের সময় নেই। কংগ্রেসের কাজটা যদি সার্থক হয় ত আবার হয়ত সময় পাওয়া যাবে। আজকাল আমার সেই দু'বছর আগের মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ দিনের কথাগুলো নিরন্তর মনে পড়ে। আমি ছিলাম একজন ভলান্‌টিয়ার—আমার পাশের লোক এবং সুমুখের ৬।৭ জন যখন 'জান্ গিয়া' ব'লে গুলি খেয়ে প'ড়ে ম'রে গেল—তখন আমি পালাই নি কিন্তু আমার লাগে নি। অনেকদিন আশ্চর্য্য হয়েছি, সেদিন কি কোরে মেশিনগানের গুলি লাগে নি। আজ মনে হয় তারও প্রয়োজন ছিল।···দাদা

বাজে শিবপুর, হাবড়া
১লা জানুয়ারি '২৩

পরম কল্যাণীয়াসু,—গয়া থেকে ফিরে এলাম। কংগ্রেস শেষ হবার আগেই চ'লে এসেছিলাম, দেহটা নিতান্ত অপটু হয়ে পড়ল ব'লে। যাবার আগেই তোমাকে চিঠি লিখ্‌ব ভেবেছিলাম, কিন্তু কাজে হয় নি, গয়ায় গিয়ে সেখান থেকে লিখ্‌ব মনে করি তাও ঘটে উঠ্‌ল না, ফিরে এসে জবাব দিচ্চি। এই যে লিখব লিখব ভাবি অথচ, লিখি না,—এরও একটা দাম আছে, নিতান্ত ফেলে দেবার জিনিস নয়। কিন্তু এ-কথা কটা লোকে আর বোঝে? তারা বলে তোমার দাম তুমিই নিয়ে থাকো, আমাদের অদামী চিঠির জবাবটা দিয়ো। তাহ'লেই আমাদের হবে।

এক দিন আমার সম্বন্ধে সবাই বলত ওর ভারি দয়া-মায়ার শরীর। আর, আজ সবাই—বোনেরা ভায়েরা বন্ধু-বান্ধবেরা সকলে বলাবলি করচে ওর দেহে দয়ামায়ার বাষ্পও নেই। আমি বলি এরও দাম আছে, তারা বলে ও-দামে আমাদের কাজ নেই, তোমার আগেকার অ-দামী বস্তুটাতেই আমাদের প্রয়োজন। ঘরের গৃহিণী পর্য্যন্ত ওই সুরে সুর মিলিয়েছেন, হয়ত বা তাঁর গলার জোরটাই এখন সকলের গলা ছাপিয়ে উঠ্‌ছে।—দাদা

বাজে শিবপুর। হাবড়া

৩রা মে ১৯২৩

পরম কল্যাণীয়াসু,—···কয় দিন হইল আমার একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। এ্যালায়েন্স ব্যাঙ্কে যথাসর্ব্বস্ব ছিল, ব্যাঙ্ক হঠাৎ ফেল হওয়ায় সমস্তই বোধ হয় গেল। বাড়িটা শেষ হয় নাই,[১] পুকুর শেষ হয় নাই, ভাবিয়াছিলাম এ বছরে কিছুই আর ফেলিয়া রাখিব না সমস্ত শেষ করিব, কিন্তু পুঁজি নিঃশেষ হওয়ায় সবই স্থগিত রহিল। কিন্তু এটাও তত বড় বিপদ নয়, অনেকে আমার মারফৎ তাহাদের যথা-সর্ব্বস্ব আমারই ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়াছিল এই বিশ্বাসে যে আমি কখনো ফাঁকি দিব না। এখন এইগুলি কড়ায়গণ্ডায় আমাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। অনেকগুলি পরিবারের ভার আমার কাঁধেই ছিল, কি যে তাহাদের বলিব ভাবিয়া পাই না। অথচ এ-কথা নিশ্চয় যে আমি বন্ধ করিলে তাহাদের হাঁড়ি বন্ধ হইবে। ভগবান যদি দেন ত সে আলাদা কথা। অনেক সময়ে তিনি দেন না, মানুষকে

১। সামতাবেড়ের বাড়ী।

অনাহারে অর্দ্ধাহারে মরিতে হয়। ভাবিতেছি মাস দুই তিন কোথাও গিয়া দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া দেখিব যদি হাজার পাঁচ ছয় টাকাও অন্ততঃ উপার্জ্জন করিতে পারি। হয়ত কতক রক্ষা হয়। আত্মীয়দের সংসার লইয়াই মস্ত ভাবনা!···—তোমার দাদা

বাজে শিবপুর। হাবড়া
১৭ই মে ১৯২৩

পরম কল্যাণীয়াসু,—কিছু কাল এখানে ছিলাম না। ঘণ্টা তিনেক হইল বরিশাল হইতে বাটী আসিয়া পৌছিয়া তোমার পোষ্টকার্ড পাইলাম। এই জন্যই যথাসময়ে চিঠির জবাব দেওয়া হয় নাই।···

হুগলী জেলে আমাদের কবি কাজী নজরুল উপোস করিয়া মর-মর হইয়াছে। বেলা ১টার গাড়ীতে যাইতেছি, দেখি যদি দেখা করিতে দেয় ও দিলে আমার অনুরোধে যদি সে আবার খাইতে রাজী হয়। না হইলে তার কোন আশা দেখি না। একজন সত্যকার কবি। রবিবাবু ছাড়া বোধ হয় এখন কেহ আর এত বড় কবি নাই।···দাদা—

৭ ভাদ্র ১৩২৬
[২৪ আগষ্ট ১৯১৯]

···আমার একটু পরিচয় চাই না কি? কিন্তু রাজলক্ষ্মী আবার কে? কেউ নেই।···শ্রীকান্তটা আর একবার পড়ে দেখো। হয়ত তার ওপর ঘৃণাই হবে। কিন্তু সব কল্পনা, সব কল্পনা, বেবাক্ মিথ্যে। তারপরে আমার বিদ্যেসিদ্যে কিছু নেই। বড় দরিদ্র ছিলাম—২০টি টাকার জন্য এক্জামিন দিতে পাইনি। এমন দিন গেছে যখন ভগবানকে

জানাতাম, হে ভগবান, আমার কিছুদিনের জন্যে জ্বর করে দাও তাহ'লে দু'বেলা খাবার ভাবনা ভাবতে হবে না, উপবাস ক'রেই দিন কাটবে। অবশ্য বেশি দিনের জন্যে এ অবস্থা ছিল না। মায়ের মৃত্যুর পরে বাবা প্রায় পাগলের মতো হয়ে যা কিছু ছিল সমস্ত বিলিয়ে নষ্ট ক'রে দিয়ে স্বর্গগত হন।...তারপরে পড়তে সুরু করি। ১৪ বছর ১৪ ঘণ্টা ধরে পড়ি। সেই যে একজামিন দিতে পারি নি কেবল সেই রাগে। বর্ম্মার রেঙ্গুনে ছিলাম কেরাণী—হঠাৎ বড় সাহেবের সঙ্গে মারামারি ক'রে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই ব্যবসা আরম্ভ করেছি। কিন্তু অকস্মাৎ এমনি কপাল ফিরে গেল যে রাতারাতিই একটা বিখ্যাত লোক হয়ে গেলাম। মাঝে মাঝে সন্ন্যাসীর চেলা হয়েও দিন কাটাতে ছাড়ি নি। আমার এই জীবনটা আগাগোড়াই যেন একটা মস্ত উপন্যাস। এবং এই উপন্যাসে সব কাজই করেছি, কেবল ছোট কাজ কখনো করি নি। যখন মরব—ফর্সা খাতা রেখে যাবো—যার মধ্যে কালির আঁচড় এক জায়গাও থাকবে না।

বাজে শিবপুর। হাওড়া।
৯ই আগষ্ট '২০

পরম কল্যাণীয়াসু,—...আমার মানসিক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন তুমি বহুদিন হইতে করিয়া আসিতেছ, এবং বহু দিন হইতেই আমি নীরবে আছি। কিন্তু আমার মত যখন তোমার বয়স হইবে, তখন হয়ত ইহা বুঝিতেও পারিবে যে জগতে মানুষের এমন কথাও থাকিতে পারে যাহা কাহারও কাছে ব্যক্ত করা যায় না। গেলেও তাহাতে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের মাত্রাই বাড়ে। অথচ, এই নীরবতার শাস্তি অতিশয় কঠিন।

ভীষ্ম যে একদিন স্তব্ধ হইয়া শরবর্ষণ সহ্য করিয়াছিলেন সে কথাটা চিরদিনের জন্য মহাভারতে লেখা হইয়া গেল, কিন্তু কত অলিখিত মহাভারতে যে এমন কত শরশয্যা নিত্যকাল ধরিয়া নিঃশব্দে রচিত হইয়া আসিতেছে তাহার একটা ছত্রও কোথাও বিদ্যমান নাই। এমনি করিয়াই সংসার চলিতেছে।...

তোমার এই দাদাটির অনেক বয়স হইয়াছে, অনেকের অনেক প্রকারের ঋণ এ নাগাদ শোধ করিতে হইয়াছে, তাহার এই উপদেশটা কখনো বিস্মৃত হইয়ো না যে, পৃথিবীতে কৌতূহল বস্তুটার মূল্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া যত বড়ই হোক, তাহাকে দমন করার পুণ্যও সংসারে অল্প নয়।

যে বেদনার প্রতিকার নাই, নালিশ করিতে গেলে যাহার নীচেকার পঙ্ক জেরায় জেরায় একেবারে উপর পর্য্যন্ত ঘুলাইয়া উঠিতে পারে, সে যদি থিতাইয়া থাকে ত, থাক্ না। কি সেখানে আছে নাই-বা জানা গেল। কি এমন ক্ষতি?...

দুঃখের ব্যাপারে আমিই সকলকে ছাড়াইয়া চলিয়াছি, আর সবাই আমার পিছনে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া আসিতেছে—এ ধারণা সত্যও নয়, সাধুও নয়। সৌভাগ্যের দম্ভে রাবণকে পড়িতে হইয়াছিল, কিন্তু দৈন্য ও দুর্ভাগ্যের অহঙ্কারে গৌতমীকে যখন সমস্ত অর্জ্জিত পুণ্যের জরিমানা দিতে হইয়াছিল, তখন সে বিচার ইংরেজ হাকিমের আদালতেও হয় নাই, কালা-গোরার মকদ্দমায় পিনাল কোডের ধারাতেও নিষ্পত্তি হয় নাই।...বই আমি যাই লিখি না কেন, এলোমেলো চিঠি লেখায় আমার সমকক্ষ হইতে পারে এরূপ ব্যক্তি যথেষ্ট নাই।

[শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা]

বাজে শিবপুর। হাওড়া

১২. ১০. ২০

শ্রদ্ধাস্পদেষু,—কেদার বাবু, আপনার অবস্থা শুনিলাম, এবার এ অধীনের অবস্থাটা শুনুন।

কিছু দিন হইতে পিঠের উপরটায় শির-দাঁড়া ধরিয়া একটা অল্প-স্বল্প ব্যথা উপভোগ করিতেছিলাম, বিশেষ কাহারো তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি ছিল না। না আমার না গৃহিণীর। অকস্মাৎ একরাত্রে ব্যথায় ঘুম ভাঙিয়া গেল, দেখি নিঃশ্বাস ফেলে কাহার সাধ্য! অনেক তাপ-সেক মালিশাদি করিয়া সকালে একটু ভাল লক্ষণ যদিবা দেখা দিল, সন্ধ্যা হইতে এমন হইল যে ডাক্তার ডাকা অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। সেই অবধি ভুগিতেছি। তাহার উপরে আবার এক দিন মোটর স্লিপ্ করায় কোমরেও দারুণ হ্যাঁচ্‌কা লাগিয়া আছে। তবে আফিম ভরসা। ইহাতে যদি অচলা ভক্তি রাখিতে পারি, তবে দুর্দ্দিন কাটিবেই কাটিবে। ভগবান শ্রীদেবাদিদেব আমাদের প্রতি বর দিয়াছিলেন যে রক্তবাহে না করিয়া আর আমরা কৈলাস গমন করিব না। সেটার সূচনা না হওয়া পর্য্যন্ত আমিই বা কি আর আপনিই বা কি—নির্ভয়ে থাকিতে পারেন—কোন দুশ্চিন্তার কারণ নাই।

এই জন্য সুরেশকেও[১] জবাব দিতে পারি নাই। গত বারের আপনার—নিজেও টান টানে! বড় চমৎকার বড় উপভোগ্য হয়েছে।

১। কাশীর সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। কাশীতে এই সুরেশবাবুর বাড়ীতেই শরৎচন্দ্রের সহিত কেদারবাবুর পরিচয় হয়।

কালী ঘরামীও[১] অনিন্দনীয়। প্রায় সকলগুলিই ভাল হইয়াছে। সুরেশের incomplete গল্প সম্বন্ধে এখনও বলিবার সময় আসে নাই। আরও দু'চারটে লেখা দেখি। একথা শুনিয়া সে যেন বলার চেয়ে বেশি কিছু না ভাবিয়া লয়। কাগজ-ছবি ইত্যাদিকে অবশ্য ভাল কিছুতেই বলা যায় না, তবে ভবিষ্যতে ভাল হইবে আশা করা সাজে।

আমি আছি বৈকি। লিখিতে বসিতেছি। শীঘ্রই পাঠাইয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িব—যেখানে দু চক্ষু যায়। অসুখের জন্য এবার ভারতবর্ষের দেনা-পাওনাটাও লেখা হয় নাই।—আপনার শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আপনার পাকা-হাতের হাল-ধরা বজায় থাকিলে প্রবাস-জ্যোতিঃর[২] আর যাই হোক্, ডুবিবার সম্ভাবনা নাই। আমার মনে হয় এ দুঃসময়ে আপনার আফিমের মাত্রাটা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য! এবং কর্ত্তব্য পালনের ন্যায় বড় জিনিস সংসারে আর নাই।

বাজে শিবপুর। হাওড়া

১৮. ১১. ২০

শ্রদ্ধাস্পদেষু,—কেদারবাবু, আপনার চিঠি ভাগলপুরের ফেরৎ পাইয়াছি। আপনাদের সঙ্গে আমার ব্যবহারটা যথেষ্ট নিন্দার হইয়া পড়িল, কিন্তু, নিতান্তই বাধ্য হইয়া। ভরসা করি ভবিষ্যতে আর হইবে না। প্রথমটা ত শয্যাগত অসুখ ছিল, কিছুই ভাল লাগিতেছিল না, তাহার পরে যখন দেহ সুস্থ হইল তখন অন্য উপসর্গ জুটিল।

১। 'কালী ঘরামী' কেদারবাবুর লেখা একটি গল্প।

২। কাশী থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা। কেদারবাবু এর সম্পাদক এবং সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী সহঃসম্পাদক ছিলেন।

আপনাদের লেখাটা এ মাসে পাঠাইতে পারিতাম, কিন্তু, যেহেতু 'ভারতবর্ষে' দেওয়া হইল না সেই হেতু আপনাদেরও দিতে পারিলাম না। তাঁহাদের না দিয়া আপনাদের দিলে তাঁহাদের শুধু অপরিসীম ব্যথিত করাই হইত না, অপমান করা হইত।

এ মাস হইতে আবার সমস্ত নিয়মিত হইবে। আমাকে লইয়া যাঁহারাই যে কিছু কারবার করেন তাঁহাদিগকেই এইরূপ ভুগিতে হয়। আমি কেবল নিজেই অন্যায় করি না, আরও পাঁচ জনকে বিড়ম্বিত করি। এটা আপনারা নিজগুণে ক্ষমা করিয়া লইবেন। স্বভাবং!

এখন আছেন কেমন? মাঝে মাঝে খবরাদি দেবেন। আমি যতটা পারি শীঘ্রই পাঠাইতেছি, এ বিষয়ে এবার নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন'।

অপরাপর বন্ধুবান্ধবদিগকে আমার নমস্কার দিবেন এবং নিজেও গ্রহণ করিবেন।—আপনাদের শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বাজে শিবপুর। হাবড়া
৯ই এপ্রেল '২৪.

প্রিয়বরেষু,—কেদারবাবু, আমার আচরণের সঙ্গে আমার কথা মিল্‌বে না। তাই যদি বলি কত দিন মনে মনে ভেবেচি হঠাৎ যদি আবার দেখা হয়ে যায় কত আনন্দই না দুজনের হয়, এ হয়ত আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না। কথনো আপনাকে চিঠিপত্র লিখি না—আমি প্রায় কাউকেই লিখি না—অথচ, আপনি যে আমাকে কত স্নেহ করেন সে কথা এক দিনের জন্যেও ভুলি নে।

কাগজে খবর পেয়ে আমার দীর্ঘ জীবনের জন্যে কামনা করেছেন এর ভিতরের বস্তুটি কি ভুল করবার?

কিন্তু দীর্ঘ জীবনের প্রার্থনা কেন? আপনাকে সত্য সত্যই বলছি কাল যদি এর ফেরবার ডাক পড়ে বলি নে যে বাপু পরশু এসো,—একটা দিন পরে যাবো।

অনেক দিন ত বাঁচলাম। এখন গুটি গুটি রওনা হলেই কি বেশ দেখ্‌তে শুন্‌তে শোভন হয় না? আমার ঠিকুজি-কুষ্ঠি বলেন ৫৯ পুরো না হ'লে কিছুতেই যাওয়া চল্‌বে না—আমি বলি, করই না বাবা কিছু দিন মাপ। মার্ক পাবার বিধি ত ইংরেজের জেলেও আছে। দাও কিছু ছাড়্‌।

আমি শ্রান্ত হয়ে গেছি কেদারবাবু, এ ছাড়া আর বিশেষ কোন রোগ বালাই নেই। লোকে কেবলই আমাকে খাটাতে চায়!

আপনি নিজে কেমন আছেন? কাশীতে আর থাকেন না কেন? ও স্থানটার একটা গুণ এই যে পরিচিত লোকগুলোর মাঝে মাঝে মুখ দেখা যায়।

মাঝে মাঝে এমনি এক আধ বার সম্বাদ নেবেন। আমার প্রীতি এবং নমস্কার নেবেন।—আপনাদের শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বাজে শিবপুর। হাবড়া

১৪-১০-২৪

প্রিয়বরেষু,—আজ সকালে আপনার চিঠি পেলাম। নানা কাজে ভুলে থাকি, প্রতি দিন অনেক চিঠিই ত পাই, কিন্তু কালে-ভদ্রে লেখা আপনার কয়েক ছত্র আমাকে যে আনন্দ দেয় তা সত্যই দুর্লভ। প্রীতির মধ্যে দিয়ে আসবার সময়ে সে যেন অনেকখানি সঙ্গে ক'রে আনে। কেদারবাবু, মানুষের সত্যকার ভালবাসা আমি টের পাই,—এখানে আমার বড় বেশি ভুলচুক হয় না।

আপনার শরীর ভাল নয়, একটু বেশি তাড়াতাড়িই যেন সে জীর্ণ হয়ে এলো। একদিন যদি সে ভার বইতে আর না চায় হায় হায় আমি কোরব না, কিন্তু ব্যথা পাবো। তখন নূতন লেখার সঙ্গে সঙ্গে কেবলি মনে হবে একজন আর নেই এ লেখা যাঁর আনন্দ দিয়ে গ্রহণ করবার হৃদয় ছিল, শক্তি ছিল।

আপনার নিজের লেখার সম্বন্ধে কখনো আপনি একটি কথা বলেন নি, আমিও কখনো একটি কথা বলি নি। অথচ, যেখানে যা বেরিয়েচে সমস্ত পড়েচি। প্রশংসার বদলে প্রশংসা দিতে আমার অত্যন্ত সঙ্কোচ হোতো। কেবলি মনে হোতো পাছে আপনার বিশ্বাস না হয়, পাছে আপনার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে।

বৎসরও আসবে, বিজয়াও আসবে—একদিন কিন্তু আপনিও আসবেন না, আমিও না। আপনি আমার বয়সে বড়, আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করবেন, সেদিন যেন আমার বেশি দূরে না থাকে। আমি ভারি শ্রান্ত। তুচ্ছ সুখ তুচ্ছ দুঃখ, একবার হাসি একবার কান্না—নিতান্তই আমার পুরণো হয়ে গেছে। আটচল্লিশ বছর বয়স হ'ল—ঢের হয়েছে। আমার বড় ইচ্ছে এর পরে কি আছে পেতে। নিরর্থক কতকগুলো বিলম্ব হবার কোন প্রয়োজন অনুভব করিনে। আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করবেন। সত্যের সুমুখেই যদি এসে পড়ে থাকেন, আপনার সত্য আশীর্ব্বাদ আমার ফলবে।—

আপনার শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

[শ্রীহরিদাস শাস্ত্রী১কে লেখা]

বাজে-শিবপুর, হাওড়া

২৮. ৩. ২৫.

তোমার চিঠি পড়িলাম। এবার কাশীতে গিয়া এত লোকের ভীড়ের মধ্যেও, কেবল তোমাকেই শুধু আত্মীয় ব'লে মনে হইয়াছিল। অথচ কিছুই তোমার জানিতাম না। এই পত্র পড়িতে সময় কিছু নষ্ট হইল বটে, কিন্তু সময় কি শুধুই প্রহর দণ্ড পল বিপল? তার অতিরিক্ত আর কিছুই নয়? সে দিক্ দিয়া তোমার এই সুদীর্ঘ পত্র লিখিতে এবং আমার পড়িতে ও চিন্তা করিতে কিছুই নষ্ট হয় নাই, বরঞ্চ কিছু সঞ্চয়ই হইল··· মেয়েদের ২৩ হইতে ৩৫ বৎসর বয়সের মধ্যেই সঙ্কটজনক সময়, কারণ ২২।২৩এর পরে, যখন সত্যকার প্রেম জাগ্রত হয়—তখন কেবল আধ্যাত্মিক ভালবাসাতে ইহার সকল ক্ষুধা মেটে না। কিন্তু এ তো গেল একটা দিক্—শারীরিক দিক্। কিন্তু আর একটা বড় দিক্ আছে—সেইটাই চিরদিনের মীমাংসাবিহীন সমস্যা। সংসারে সচরাচর এরূপ ঘটে না, কিন্তু যে দুই চারি জনের অদৃষ্টে ঘটে, তাহাদের মত ভাগ্যবান্‌ও নাই—দুর্ভাগাও নাই। ইহাদের দুর্ভাগ্যের উপর কাব্যজগতে সকল মাধুর্য্য সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে···অথচ এত বড় সত্যও আর নাই—

সুখ দুখ দুটী ভাই—
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি দুখ যায় তার ঠাঁই!

···সমাজের মধ্যে যাকে গৌরব দিতে পারা যায় না, তাকে কেবল

১। হরিদাসবাবু কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে কবিরাজী করতেন। শরৎচন্দ্র কাশী গেলে সেখানে এঁর সঙ্গে পরিচয় হয়।

মাত্র প্রেমের দ্বারাই সুখী করা যায় না। মর্য্যাদাহীন প্রেমের ভার, আলগা দিলেই দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠে।...তা ছাড়া শুধু নিজেদের কথা নয়, ভাবি সন্তানের কথাটা সবচেয়ে বড় কথা, তাহাদের ঘাড়ে অপরের বোঝা চাপাইয়া দিবার ক্ষমতা অতিবড় প্রেমেরও নাই।...একটা কথা।
৮ —যথার্থ ভালবাসিলে মেয়েদের শক্তি ও সাহস পুরুষের অপেক্ষা ঢের বেশি। কোনো কিছুই তাহারা গ্রাহ্য করে না! পুরুষেরা যেখানে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে, মেয়েরা সেখানে স্পষ্ট কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া দিতে দ্বিধাই করে না।...সমাজের অবিচার অত্যাচারের যে কেহ প্রথমে প্রতিবাদ করে, তাহাকেই দুঃখ পাইতে হয়।...

ইং ১৯১৫

...সত্যকার ভালবাসার জন্য জগতে দুঃখভোগ নাকি করিতে হয়। কেহ না করিলে সমাজের অর্থহীন অবিচারের প্রতিবিধান হইবে কিসে? সমাজের বিরুদ্ধে যাওয়া, আর ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যাওয়া যে এক বস্তু নয়—এই কথাটাই লোকে ভুলিয়া যায়।

শিবপুর, হাওড়া

[১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬]

পরম কল্যাণবরেষু,

কাল বাড়ী থেকে এসে তোমার চিঠি পেলাম। আমার অভ্যাসের দোষে বহু দিন তোমাকে পত্র দিতে পারি নি। জানি অন্যায় যে কত বেশী হচ্ছে, তবু হয়ে ওঠে নি, এমনি কুড়েমি আমার। তবে সান্ত্বনা এইটুকু যে তোমরা ছোট ভাইয়ের মত, দাদার অপরাধ নেবে না।...

আমার যথাপূর্ব্বং। যদি না ঢের বেশী বেড়ে গিয়ে থাকে। Constipation আমাকে নিয়ে তবে যাবে এইটেই অবশেষে স্থির

হয়েছে—যাক্, একটা কিছু এত দিনে বোঝা গেছে। অথচ দেশে গিয়ে জলবায়ুর গুণেই হোক বা কিছু কিছু শারীরিক পরিশ্রম করি ব'লেই হোক—এ রোগটা ঢের কমে থাকে। অতএব, শেষ চেষ্টার জন্য সপরিবারে শিবপুর ছেড়ে রূপনারায়ণ নদের তীরেই বছর খানেক বাস ক'রব ঠিক করেছি। খুব সম্ভব, এই ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই সকলে চলে যাবো।...

তুমি কেমন আছ হরিদাস? সব ভাল ত? কেদারবাবু শুনেছি আমার সম্বাদের জন্য ব্যস্ত। বাস্তবিক আমাকে তিনি কি চোখেই যে দেখেছিলেন! কিন্তু ভুল করেছিলেন—আমি তার যোগ্য নই।

কিছু দিন থেকে শিবপুরে আর প্রায়ই থাকি না, মন ভাল লাগে না। কোথায় যে লাগবে তাও ছাই ভেবে পাই নে। দেখি এবার বাড়ী গিয়ে গোলাপের আর জুঁই মল্লিকের চাষ করে।

যাবার সময়ে বুড়ো বয়সে ওদিকের পথটা ভগবান কি বন্ধুর করেই রেখেছেন। আত্মীয় বন্ধুজনদের আশীর্ব্বাদ করতে ইচ্ছে হয়—যৌবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই যেন ইহকালের মিয়াদ ফুরোয়। ইতি—৫ই ফাল্গুন ১৩৩২।—দাদা

[?][1]

বাজে শিবপুর,
হাবড়া।
২৯. ৬. ২৫

মা,

তোমার চিঠি পেয়েছি। শরীর আমার বেশ ভালই আছে। কোন অসুখ বিসুখ নেই, তুমি আমার জন্যে ভেবো না। হরিদাস তোমাকে বাড়িয়ে বলেছে।

হরিদাস আমার ছোট ভাইয়ের মত। আমার মত সেও তোমাকে দেখবে। তাকে সকল কথা জানিয়ো। অমন ভাল ছেলে কাশীতে আর নেই। তা' ছাড়া সে নিজে চিকিৎসক।

প্রভাসের[২] বৃন্দাবন থেকে শীঘ্র আসার কথা আছে, সে এসে পড়লে আমি কাশীতে একবার যেতে পারি।

প্রকাশের[৩] বিয়ে হয়ে গেছে, দিদি এখন এখানেই আছেন।

তুমি বাসা বদল ক'রে ভালই করেছ। এ ঘর কি তোমার পছন্দ-মত হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে ত, হয়ত ২।১ টাকা ভাড়া বেশী দিলে অপেক্ষাকৃত ভাল ঘর পাওয়া যেতে পারে। তোমার বাড়ীভাড়ার জন্যে চিন্তা করার আবশ্যক নেই, কারণ সে টাকা হরিদাস দেবে। তোমার কাছে তারা বাড়ীভাড়া চাইবেও না।[৪]

১। জনৈকা ভদ্রমহিলা। বৃদ্ধ বয়সে ইনি কাশীতে বাস করতেন। কাশীতেই এঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় হয়। শরৎচন্দ্র এঁকে বুড়ীমা বলতেন।

২। শরৎচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা স্বামী বেদানন্দ। ইনি বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন।

৩। শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

৪। হরিদাস শাস্ত্রী লিখেছেন :—"বুড়ীমা সম্বন্ধে দাদা একবার লিখিয়াছিলেন—

তুমি আমাকে মাঝে মাঝে তোমার খবর দিয়ো, তোমার সকল কথা আমি হরিদাসের কাছেই শুনতে পাবো।

আমার সেই ভোলা চাকরটির বড় অসুখ। চিকিৎসা চল্‌ছে, অল্প বয়স, তাই আশা হয় সে সেরে উঠবে।

তোমার শরৎ।

'বুড়ীমা দুঃখে পড়ে একদিন আমায় ছেলে বলেছিলেন—এখন কাশীতে আছেন··· ঠিকানায় খোঁজ নিও। বুড়ীমা সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে ও বধূ ছিলেন। বালবিধবা। বেশ পড়াশুনা ছিল—বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের অনেক গল্প করিতেন। খুব মালপো তৈরি করিতে পারিতেন ও খাওয়াইতেন। শেষ বয়সে চোখটা খারাপ হইয়াছিল বলিয়া পড়িতে পারিতেন না।'—শরৎচন্দ্র আমার হাত দিয়া তাঁকে কিছু সাহায্য করিতেন।··· চিঠিখানি ছাপানর উদ্দেশ্য—কি ভাবে নিজেকে গোপন রাখিয়া তিনি সাহায্য দান করিতেন, তার একটা প্রমাণ এর মধ্যে আছে। চিঠিতে লিখিতেছেন বাড়ীভাড়া যা কিছু হরিদাস দিবে, উহা আত্মগোপনের প্রকার মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে টাকা তিনি আমার কাছে পাঠাইতেন আমি বুড়ীমাকে দিতাম।" ('সাহানা,' ১৩৪৬)

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা]

বাজে শিবপুর। হাবড়া
২৮. ৪. ২৫

...শরীরটা তেমন সুস্থ নয়।

ভেলু [১] বেঁচে নেই। গত বৃহস্পতিবারের আগের বৃহস্পতিবারে আমি ঢাকা থেকে সকালে এসে পৌঁছাই। তখনি বেলগেছে হাঁসপাতাল থেকে তাকে মোটরে ক'রে বাড়ী আনি। এনেই কিন্তু সে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়ে। ডাক্তারেরা বলেন acute gastritis. সাত দিন সাত রাত খাই নি ঘুমুই নি—তবুও পরের বৃহস্পতিবার ভোর ৬টার সময় তার প্রাণ বার হয়ে গেল। শেষ দিন বড় যন্ত্রণা পেয়েই সে গেছে।

বুধবারে জোর ক'রে কড়া ওষুধ খাওয়াবার চেষ্টা করি, চাম্‌চে দিয়ে মুখে গুঁজে দেবার অনেক চেষ্টা ক'রেও ওষুধ তার পেটে গেল না; কিন্তু রাগের ওপর আমাকে কাম্‌ড়ালে। সেদিন সমস্ত রাত আমার গলার কাছে মুখ রেখে কি তার কান্না। ভোরবেলায় সে কান্না তার থাম্‌লো।

আমার ২৪ ঘণ্টার সঙ্গী, কেবল এ দুনিয়ায় আমাকেই সে চিনেছিল। যখন কাম্‌ড়ালে এবং সবাই ভয় পেলে তখন রবিবাবুর এই কথাটাই শুধু মনে হ'তে লাগ্‌লো—তোমার প্রেমে আঘাত আছে নাইক অবহেলা! তার আঘাত ছিল, কিন্তু অবহেলা ছিল না। এর পূর্ব্বে এত ব্যথা আমি আর পাই নি।

১। শরৎচন্দ্রের কুকুরের নাম ছিল ভেলু।

…ডাক্তার প্রভৃতি বহু বন্ধু-বান্ধবেই এখন ধরেছেন চিকিৎসা করাতে। অর্থাৎ পাগলা কুকুর কামড়ানোর পরে যা করা উচিত। উচিত যা তাই চলবে। ২৮টা injectionএর আজ ১০টা injection হয়ে গেল। আরো ১৮টা বাকি। তাও সম্পূর্ণ হবে। মানুষকে বাঁচাতেই হবে,—কারণ, your life is too valuable ! দেখাই যাক্ valuable lifeএর শেষটা কি দাঁড়ায় !—

তোমার শরৎ

[শ্রীরাধারাণী দেবীকে লেখা]

বাজে শিবপুর, হাবড়া
১৪. ৮. ২৫

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধারাণী, আজ তোমার চিঠি নরেনের[১] হাত থেকে পেলাম।...আমার লেখা বেশি করে পড়ায় মেয়েদের অনেক সময় বিড়ম্বনা ভোগ করতেও হয়। এই যেমন আমার অভিমত প্রকারান্তরে সমর্থন করবার ফলে তোমাকে গালাগালি খেতে হ'ল। আমার নিজের সংস্কার বলে বড় বেশি বালাই নেই। তাই বহু সময়ে—তোমাদের কথা এত খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করি যে, অনেকে সইতে পারে না। এই জন্যেই বোধ হয়—কোনো দুজন লোকের ধারণা আমার সম্বন্ধে এক নয়। কত অদ্ভুত দুর্নামই যে আমাকে নিয়ে প্রচারিত আছে তার সীমা সংখ্যা নেই।

পুরুষেরা বলে আমি সমাজ ধ্বংস করে দিলাম; আবার মেয়েরা বলে ঠিক তার উল্টো। কত মেয়ের সঙ্গেই ত আমার পরিচয় আছে, তারা আমাকে আপনার লোকের চেয়েও আপনার ভাবে। তারা অসঙ্কোচে বলে যে আমার লেখা থেকে তারা অধঃপথে ত যায়ই না, বরঞ্চ সৎপথ পৃথিবীতে যদি কিছু থাকে ত তারই খোঁজ পায়। আমাকে যদি তুমি দাদা বলেই ডাকো ত আমার লেখায় সত্যিকার দুর্নীতি কোথাও নেই এ বিশ্বাস যেন তোমার নিঃসন্দেহে থাকে।

তুমি ছেলেমানুষ, সাহিত্য নিয়েই যদি থাকো ত একটা বড় অবলম্বন

১। নরেন্দ্র দেব। রাধারাণী দেবী নরেনবাবুর জ্যাঠামশায়ের শ্যালককন্যা। পরে নরেনবাবুর সঙ্গেই এঁর বিয়ে হয়েছিল।

পারে। আমি মনীষী নই, কিন্তু তোমাকে সাহায্য করতে পারবো।
…আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো।—শরৎদা

বাজে শিবপুর, ২৫. ২৮. ২৫

রাধারাণী,

তোমার চিঠি পেয়েছি।…সাহিত্য ব্যাপারে তোমাকে কিম্বা তোমাদের সাহায্য করার আমার আজও উৎসাহ আছে। একদিন ছেলেবেলায়—নিরুপমা, সুরেন গঙ্গো, গিরীন গঙ্গো প্রভৃতিকে নিয়ে আমি ছোট অখ্যাত অজ্ঞাত সাহিত্য-সভা করেছিলাম। তাইত আজ বাঙলা-সাহিত্য তাদের কাছে কত কি পাচ্ছে।

তেমনি আবার একটা গোষ্ঠী তৈরি করে যেতে চাই। যদি কেউ ভবিষ্যতে ভাল হয়, যদিচ তাদের কাজ চোখে দেখে যাবার আমার আর সময় হবে না। তোমার সঙ্গে দেখা হলে এ সব আলোচনা করব। সাবধানে থেকো, আমি ভাল আছি।—বড়দা

কল্যাণীয়া রাধারাণী,

তোমার এইমাত্র চিঠি পেলাম। কুড়ে মানুষ তাছাড়া না থাকে হাতের কাছে চিঠির কাগজ, না থাকে খাম, না পাই খুঁজে ডাকটিকিট—নানা কারণে চিঠির জবাব দেওয়া ঘটে ওঠে না। তুমি ছোট বোন, অভিমান করতে পারো, এ ক্ষেত্রে আমারই দোষ—তোমার রাগ হবারই কথা। কিন্তু কি করি ভাই, বুড়োমানুষ সব কাজেই ত্রুটি হয়ে পড়ে।

সরসীবালা বসু নামটি বোধহয় ইতিপূর্ব্বে শুনেছি। তবে তাঁর কোন লেখা পড়েছি বলে ঠিক মনে হচ্ছে না। বিশেষতঃ বোধ হয় তুমি জানো না যে, নির্ব্বিচারে গল্প উপন্যাস আমি একেবারেই প্রায় পড়িনে। আমার পড়ার বই আলাদা।—বড়দা

[চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে[১] লেখা]

বাজে শিবপুর, ৫ঠা বৈশাখ, ১৩৩২

প্রিয়বরেষু,

পৌছানো খবর[২] একটা দিতে হয় প্রথা আছে। কিন্তু তুমি তো জানো আমি সকল 'প্রথা'র বাইরের মানুষ। তবুও দিচ্চি শুধু এই কথা মনে করে হয়ত তোমরা ভাব্‌বে। এখানে এসে মনে হচ্চে কি-ই বা এত কাজ ছিল, আরও দুদিন থাকলেই হোতো। কি যত্নটাই তোমরা আমাকে করেছ। মানুষের জীবনে এই দিনগুলোই শুধু মনে থাকে। ছেলেমেয়েদের আমি আশীর্ব্বাদ করি, এবং প্রার্থনা করি তোমরা নিরাপদে এবং কল্যাণে থাকো।

তোমার গৃহিণী কি রকম করেই যে আমাদের সকল দিকে নজর রেখেছিলেন আমি তাই এখানে এসে গল্প করচি।—তোমার শরৎ

ডাক্তার রমেশ[৩] ও তোমার রমেশদিদি[৪] বোধ হয় চলে গেছেন। সবাই মিলে কত আদরই আমাদের করলে। ইচ্ছে ছিল তাঁদেরও একটা চিঠি লিখি। কিন্তু সে চিঠি কি আর পৌছবে। আর একবার ঢাকায় যেতেই হবে।

১। ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ও ১১ই এপ্রিল তারিখে ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন হয়, তাতে সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র। সাহিত্য সম্মিলন শেষ হয়ে গেলে শরৎচন্দ্র মুন্সীগঞ্জ থেকে ঢাকায় যান। সেখানে গিয়ে তিনি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে উঠেছিলেন। চারুবাবু তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। এখানে শরৎচন্দ্র ঢাকা থেকে ফিরে এসে পৌছানোর খবরের কথা বলেছেন।

৩। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। ইনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন।

৪। রমেশবাবুর স্ত্রী। শরৎচন্দ্র এখানে পরিহাস করে তোমার রমেশদিদি বলেছে

বাজে শিবপুর। ২১শে এপ্রিল '২৫

ভাই চারু,

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলাম। আজ আমার চিঠিপত্র লেখবার মত মনের অবস্থা নয়, তবুও তোমাকে এই কথাটা না জানিয়ে থাকতে পারলাম না। তোমার হয়ত মনে পড়বে, আসবার সময় পথের ধারে—একটা মৃতপ্রায় বাছুর, তারপরেই একটা জবাই করা মোরগ আমার চোখে পড়ে। আমি তোমাকে বলি, আজ যাবার সময় এত মৃত্যুর চেহারা দেখি কেন? তুমি বললে, একটা গোধাও ত ছিল। আমি বললাম, কই, আমি ত তা দেখি নি।

তারপর তোমরা ষ্টেশন থেকে চলে গেলে, গাড়ী ছাড়বার পরেই দেখি রাস্তার ধারে একপাল শকুনি আর একটা মরা কুকুর। আমার নিজের কুকুর ছিল হাসপাতালে, মন যে আমার কি খারাপ হয়েই গেল তা লেখা যায় না। ইংরাজীতে যাকে বলে Superstition সে আমার নেই, কিন্তু তিন তিনটে মৃত্যুর কথা সমস্ত পথ আমাকে একটা মুহূর্ত্তের শান্তি দিলে না। বাড়ী এসে শুনলাম ভেলু ভাল আছে এবং হাসপাতালের চিঠি পেলাম।

বাড়ীতে নিয়ে এলাম বৃহস্পতিবার। পরের বৃহস্পতিবার সকাল ৬টায় ভেলু মারা গেল। আমার চব্বিশ ঘণ্টার সঙ্গী আর নেই। সংসারে এতবড় ব্যথার ব্যাপারও যে আছে এ আমি ঠিক বুঝতাম না। বোধ হয়—তাই এটা আমার প্রয়োজন ছিল। আর একটা জিনিষ টের পেলাম চারু, পৃথিবীতে objectiveটা কিছুই নয়, subjectiveটাই সমস্ত। নইলে একটা কুকুর বইত নয়। রাজা ভরতের উপাখ্যান কিছুতেই মিথ্যে নয়।—তোমার শরৎ

[শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা]

৩০শে জানুয়ারি '২৬

শিবপুর। হাবড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠিতে আনন্দ পেলাম। আত্মীয়তার সম্বন্ধ বছর মাস দিয়ে মাপ্‌তে গেলেই ভুল হয়। অথচ, এই ভুল অধিকাংশ লোকেই করে।

তুমি ফিরে এলে[১] আবার দেখা হবে। বাইরের লোকের জানাবার দরকার কি।

দশাশ্বমেধ ঘাটে কবিরাজ শ্রীমান্ হরিদাস শাস্ত্রী থাকেন। খাঁটি মানুষ। তাঁকে বাস্তবিকই আমি বড় ভালবাসি। তাঁর সঙ্গে বোধ হয় তোমার আলাপ নেই। যদি পারো—পরিচয় কোরো, খুসি হবে।

আমার মেজভাই[২] এ যাত্রা রক্ষা পেলেন। আরোগ্য হবার মুখে চলেছেন, আশা করি শীঘ্রই পুনরায় কাজের জন্য প্রস্তুত হতে পারবেন।

আমি ঠিক ভাল নই বটে, তবে, মোটের ওপর আছি এক রকম। Constipationএর জ্বালাই হয়েছে আমার সব চেয়ে অশান্তি। রোজ রোজ তাল তাল হত্তুকি বাটা খেয়ে চালিয়ে যাচ্চি।

সম্প্রতি একজন কোব্‌রেজ আমার চিকিৎসার ভার নিয়েছেন। ভরসা দিয়েছেন এ রোগ মানসিক। অতএব মাস খানেকের মধ্যেই আমাকে নিরাময় করতে পারবেন। পারেন ভালই, না পারেন আমার হত্তুকি এবং Lequid parafin ত আর কেউ ঘুচোবে না। দিন কেটে যাবে। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ রইল।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১। উমাপ্রসাদবাবু এই সময় কাশীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

২। প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইনি যৌবনের প্রারম্ভেই রামকৃষ্ণ মিশনে প্রবেশ ক[রে] সন্ন্যাসী হন এবং স্বামী বেদানন্দ নাম গ্রহণ করেন।

সামতাবেড় ও কলিকাতার চিঠি

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা]

সামতাবেড়, পাণিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

শ্রীচরণেষু,

আপনার চিঠি[১] পেয়েছি। অসুস্থতার জন্যে যথাসময়ে উত্তর দিতে না পারায় অপরাধ হয়ে গেল। ষোড়শীর সম্বন্ধে আপনার অভিমত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছি। কিন্তু দু-একটা কথাও আমার নিবেদন করবার আছে, এ কেবল আমার ব্যক্তিগত বিষয় নয়, সাধারণভাবে অনেকেরই ঠিক এমনি ব্যাপার ঘটে বলেই আপনাকে জানানো প্রয়োজন। এই নাটকখানা লিখেচি আমার একটা উপন্যাস অবলম্বন করে। তাতে যত কথা বলতে পেরেছি, চরিত্র সৃষ্টির জন্যে যত প্রকার ঘটনার সমাবেশ করতে পেরেছি এতে তা পারি নি। কালের দিক দিয়েও নাটকের পরিসর ছোট, ব্যাপ্তির দিক দিয়েও এর স্থান সঙ্কীর্ণ, তাই লেখবার সময়

১। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র তাঁর "দেনা-পাওনা" উপন্যাসখানির নাট্যরূপ দেন। নাটকে রূপান্তরিত হ'লে তখন "দেনা-পাওনা"র নাম হয় "ষোড়শী"। ষোড়শী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'লে শরৎচন্দ্র একখানি ষোড়শী রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে নাটকটি সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানতে চান। রবীন্দ্রনাথ ষোড়শী প'ড়ে শরৎচন্দ্রকে তখন এই চিঠিখানি লিখেছিলেন—

কল্যাণীয়েষু—তোমার ষোড়শী পেয়েছি। বাংলা সাহিত্যে নাটকের মত নাটক নেই। আমার যদি নাটক লেখবার শক্তি থাকত তা হলে চেষ্টা করতুম, কেন না, নাটক সাহিত্যের একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

নিজেও বারম্বার অনুভব করেচি—এ ঠিক হচ্চে না। অথচ উপন্যাসটাই যখন এর আশ্রয় তখন ঠিক কি ভাবে যে হতে পারে তাও ভেবে পাইনি। বোধ করি উপন্যাস থেকে নাটক তৈরির চেষ্টা করতে গেলেই এই ঘটে, একদিক দিয়ে কাজটা হয়ত সহজ হয় কিন্তু আর দিকে ক্রটিও হয় প্রচুর, হয়েছেও তাই। আরও একটা হেতু আছে। এ জীবনে নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাবার কালে চোখে পড়েছে অনেক জিনিস। আপনি যাকে বলেছেন, এ দেশের লোক-যাত্রা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা। কিন্তু অনেক কিছু দেখা এবং জানা সাহিত্যিকের পক্ষে নিছক ভালো কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ জন্মেছে। কারণ, অভিজ্ঞতায় কেবল শক্তি দেয় না, হরণও করে! এবং সাংসারিক সত্য সাহিত্যের সত্য নাও হতে পারে। বোধ হয় এই বইখানাই তার একটা উদাহরণ। এটা লিখি একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানা বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি কোরে। সেই জানাই হ'ল আমার বিপদ। লেখবার সময় পদে পদে জোরা

আমার বিশ্বাস, তোমার নাটক লেখবার শক্তি আছে। ভিতরের প্রকৃতি আর বাইরের আকৃতি এই দুটিই যখন সত্যভাবে মেলে তখনি চরিত্র-চিত্র খাঁটি হয়—আমার বিশ্বাস তোমার কলম ঠিকভাবে চল্‌লে এই রূপের সঙ্গে ভাব মিলিয়ে তুলতে পারে, কেন না, তোমার দেখবার দৃষ্টি আছে, ভাববার মন আছে, তার উপরে এ দেশের লোকযাত্রা সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত। তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভূলতে পারো তাহলে তোমার এই শক্তি বাধা পাবে। সকল বড় সাহিত্যের যে পরিপ্রেক্ষিত (perspective) সেটা দূরব্যাপী, সেইটির সঙ্গে পরিমাণ রক্ষা করতে পারলে তবেই সাহিত্য টিঁকে যায়—কাছের লোকের কলরব যখন দেয়াল হয়ে সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টনে তাকে অবরুদ্ধ করে, তখন সে খর্ব্ব হয়ে অসত্য হয়ে যায়।

ষোড়শীতে তুমি উপস্থিত কালকে খুসি করতে চেয়েচ, এবং তার দামও পেয়েচ। কিন্তু নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করেচ। যে ষোড়শীকে এঁকেচ সে এখনকার কালের

করে সে আমার কল্পনার আনন্দ ও গতিকে কেবল বাধাই দেয়নি, বিকৃত করেছে। সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনা মেশাতে গেলেই বোধ হয় এমনি ঘটে। জগতে দৈবাৎ যা সত্যই ঘটেছে তার যথাযথ বিবৃতিতে ইতিহাস রচনা হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য রচনা হয় না। অথচ সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে হোলো আমার ষোড়শী। এই উপায়ে সাধারণের কাছে সমাদর লাভ করা গেল প্রচুর, কিন্তু আপনার কাছে দাম আদায় হোলো না। এ আমার বাইরের পাওয়া সমস্ত প্রশংসাই নিষ্ফল করে দিলে।

এমনি আমার আর একখানা বই আছে পল্লী-সমাজ, এর বিক্রীও যত, খ্যাতিও তত। অথচ যতই লোকে এর প্রশংসা করে, ততই মনে মনে আমি লজ্জা পাই। জানি এ টিঁকবে না। কারণ এ-ও সত্যে মিথ্যেয় জড়ানো। মিথ্যেও বরঞ্চ টিঁকে, কিন্তু সত্যের বোনেদের ওপর যে অসত্য, সে পড়তে দেরি হয় না। কথাটা হঠাৎ যেন উল্টো মনে হয়।

ফরমাসের, মনগড়া জিনিষ, সে অন্তরে বাহিরে সত্য নয়। আমি বলিনে যে এই রকম ভাবের ভৈরবী হতে পারে না,—কিন্তু হতে গেলে যে ভাষা যে কাঠামোর মধ্যে তার সঙ্গতি হতে পারত, সে এখনকার দিনের খবরের কাগজ পড়া চেহারার মধ্যে নয়। যে কাহিনীর মধ্যে আমাদের পাড়াগাঁয়ের সত্যকার ভৈরবী আত্মপ্রকাশ করতে পারত সে এই কাহিনী নয়। সৃষ্টিকর্ত্তারূপে তোমার কর্ত্তব্য ছিল এই ভৈরবীকে একান্ত সত্য করা, লোকরঞ্জনকর আধুনিক কালের চল্‌তি সেন্টিমেন্ট মিশ্রিত কাহিনী রচনা করা নয়। জানি আমার কথায় তুমি রাগ করবে। কিন্তু তোমার প্রতিভার পরে শ্রদ্ধা আছে বলেই আমি সরল মনে আমার অভিমত তোমাকে জানালুম। নইলে কোন দরকার ছিল না। সাহিত্যে তুমি বড়ো সাধক, ইন্দ্রদেব যদি সামান্য প্রলোভনে তোমার তপোভঙ্গ করেন তাহলে সে লোকসান সাহিত্যের। তুমি উপস্থিত কালের কাছ থেকে দাম আদায় করে খুসি থাকতে পারো—কিন্তু সকল কালের জন্য কি রেখে যাবে? ইতি ৪ ফাল্গুন ১৩৩৪। তোমার—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক সময়ে আমি শুধু ছবি আঁকতাম। ছবিতে এর মুণ্ডু, ওর ধড়, তার পা এক কোরে চমৎকার জিনিস দাঁড় করানো যায়। কারণ সে কেবল বাইরের বস্তু, চোখে দেখেই তার বিচার চলে। কিন্তু সাহিত্যে চরিত্র সৃষ্টির বেলায় তা হয় না। মানুষের মনের খবর পাওয়া কঠিন। সেখানে নিজের খেয়াল বা প্রয়োজন মত এর একটু, তার একটু, কতক সত্য, কতক কল্পনা জোড়া-তাড়া দিয়ে উপস্থিত মতে লোকরঞ্জন করা যায়, কিন্তু কোথায় মস্ত ফাঁকি থেকে যায়, এবং উত্তর কালে এই ফাঁকটাই একদিন ধরা পড়ে। কি জানি, হয়ত এই জন্যেই আজকাল প্রখর বাস্তব সাহিত্যের চলন সুরু হয়েছে। তাতে দলে দলে লোক আসে সবাই ছোট, সবাই সত্য, সবাই হীন, কারও কোন বিশেষত্ব নেই, অর্থাৎ যেমনটি সংসারে দেখা যায়। অথচ, সমস্ত বইখানা পড়ে মনে হয়, এতে লাভ কি? কেউ হয়ত বল্‌বে, লাভ নেই—এম্‌নি। মাঝে মাঝে হয়ত, অত্যন্ত সাধারণ মামুলি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও নিপুণ বর্ণনা থাকে,—তার ভাষাও যেমন আড়ম্বরও তেমনি,—কিন্তু তবুও মন খুসি হয় না, অথচ এরা বলে এই ত সাহিত্য।

ষোড়শীর সম্বন্ধে আপনি ঠিক যে কি বলেছেন আমি বুঝতে পারি নি। শুধু একটুকুই বুঝেচি এ যে ঠিক হয়নি, সে আপনার দৃষ্টি এড়ায় নি।

আপনি পরিপ্রেক্ষিতের উল্লেখ করেছেন। ছবি আঁকায় এতে দূরত্বের পরিমাণে বড় জিনিস ছোট, গোল জিনিস চ্যাপ্টা, চৌকো জিনিস লম্বা, সোজা জিনিষ বাঁকা দেখায়। কতদূরে কোন্ সংস্থানে বস্তুর আকারে প্রকারে কিরূপ এবং কতটা পরিবর্ত্তন ঘটবে তার একটা বাঁধাধরা নিয়ম আছে। এ নিয়ম ক্যামেরার মত যন্ত্রকেও মেনে চলতে হয়। তার ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু সাহিত্যের বেলা তো এর তেমন কোন বাঁধাধরা আইন নেই। এর সমস্তই নির্ভর করে লেখকের রুচি এবং বিচার-বুদ্ধির পরে! নিজেকে

কোথায় এবং কতদূরে যে দাঁড় করাতে হবে তার কোনও নির্দেশই পাবার যো নেই। সুতরাং ছবির perspective এবং সাহিত্যের perspective কথার দিক দিয়ে এক হলেও কাজের দিক দিয়ে হয়ত এক নয়। তাছাড়া সাহিত্যের বর্ত্তমান কালটা যত বড় সত্য, ভবিষ্যৎ কালটা কিছুতেই ঠিক অত বড় সত্য নয়। নর-নারীর যে একনিষ্ঠ প্রেমের ওপর এতকাল এত কাব্য লেখা হয়েছে, মানুষে এত তৃপ্তি পেয়েছে, এত চোখের জল ফেলেছে সেও হয়ত একদিন হাসির ব্যাপার হয়ে যাবে। অন্ততঃ অসম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে তো আজ তাকে কল্পনাতেও গ্রাহ্য করা চলে না।

একটা concrete উদাহরণ নিই। রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধের বিবরণে অনেক জায়গা জুড়ে আছে। রাক্ষসে-বাঁদরে মিলে কোন পক্ষ কি রকম লড়াই করলে, কে কি অস্ত্র নিক্ষেপ করলে তার কত রকমের নাম, কত রকমের বর্ণনা। কার হাত, কার পা, কার গলা কাটা গেল তাও উপেক্ষিত হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্রে এ ব্যাপার ছোটও নয়, তুচ্ছও নয়, এবং কবির কাছে হয়ত সেকালের লোকে ভিড় কোরে চেয়েছিল, এবং পেয়ে অকৃত্রিম আনন্দও উপভোগ করেছিল। কিন্তু আজ সুদূর ব্যবধানে যুদ্ধক্ষেত্রের ও যুদ্ধার্থী বীরগণের যুদ্ধকৌশল অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে, সাহিত্যের দুরব্যাপী perspective বলতে কি আপনি এই ধরণের জিনিসই ইঙ্গিত করেছেন?

আমি পূর্ব্বে কখনো নাটক লিখিনি। এখন দুএকটা লেখার ইচ্ছে হয়, কিন্তু বাধা বিস্তর। আমার উপন্যাসের বিচার পাঠকসমাজ করেন, তার প্রশস্ত ক্ষেত্র, কিন্তু নাটকের পরীক্ষক যে কে বোঝা কঠিন। থিয়েটারবালারা, না বোকা-দর্শকেরা—কোথায় যে এর হাইকোর্ট তা কেউ জানে না। রামায়ণ, মহাভারত থেকে কিম্বা তেমনি প্রতিষ্ঠিত টড,

সাহেবের রাজস্থান থেকে নাটক লিখলে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কিন্তু আপনার কাছে তাড়া খেতে হয়।

পরিশেষে আপনি আমার শক্তির উল্লেখ করে লিখেচেন, "তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পারো তা হলে তোমার এই শক্তি বাধা পাবে।" আপনি নানা কাজে ব্যস্ত, কিন্তু আমার ভারি ইচ্ছে হয়, আপনার কাছে গিয়ে এই জিনিসটা ঠিক মত জেনে আসি। কারণ উপস্থিত কালটাও যে মস্ত ব্যাপার, তার দাবী মানবো না বললে, সেও যে শাস্তি দেয়।

আপনি অনুমতি না দিলে আপনার সময় নষ্ট করে দিতে আমার সঙ্কোচ হয়। আমার চিঠি লেখার ধরণটা ভারি এলো-মেলো—কোন কথাই প্রায় গুছিয়ে বলতে পারি নে। লেখার দোষে কোথাও যদি অপরাধ হয়ে থাকে মার্জ্জনা করবেন।[১] ইতি—২৬ ফাল্গুন ১৩৩৪

সেবক

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাবড়া
২৯শে আশ্বিন ১৩৩৯

শ্রীচরণেষু,

আমার বিজয়ার শতকোটী প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতিমধ্যে আপনি নানা গুরুতর কাজে ব্যাপৃত ছিলেন এবং শান্তিনিকেতনেও থাকিতে পারেন নাই—এই জন্যই প্রণাম নিবেদন করিতে বিলম্ব করিলাম।

১। শরৎচন্দ্রের উত্তর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে আর একখানি চিঠি লেখেন। সেই চিঠিখানি এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

কালের যাত্রার সঙ্গে যে আশীর্ব্বাদ[১] আপনার পাইলাম সে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আপনার তুচ্ছতম দানও জগতের যে কোন সাহিত্যিকের সম্পদ, আমি এ দান মাথায় করিয়া লইলাম।

আমার ভাগ্য ভালো যে ৩১শে ভাদ্র আপনার কলিকাতায় আসা সম্ভবপর হয় নাই—আসিলে সেদিনের অনাচার দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত

১। ১৩৩৯ সালের ৩১শে ভাদ্র টাউন হলে দেশবাসীর পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রের যে জন্ম-জয়ন্তী হয় তাতে পৌরোহিত্য করবার কথা ছিল রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু বিশেষ কাজের জন্য রবীন্দ্রনাথ আসতে না পারায় তাঁর লিখিত আশীর্বাণী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কবির বাণীটি এই—

কল্যাণীয়েষু—শরৎচন্দ্র, বিশেষ উদ্বেগজনক সাংসারিক ঘটনায় তোমার জন্মদিনের উৎসবে সম্মাননা সভায় উপস্থিত থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হোলো। অগত্যা আমার আন্তরিক শুভ কামনা এই উপলক্ষ্যে পত্র যোগে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিই।

তোমার বয়স অধিক নয়, তোমার সৃষ্টির ক্ষেত্র এখনো সম্মুখে দীর্ঘ প্রসারিত, তোমার জয়যাত্রার বিরাম হয়নি। সেই অসমাপ্ত যাত্রা পথের মাঝখানে অকস্মাৎ তোমাকে দাঁড় করিয়ে অর্ঘ্য দেওয়া আমার কাছে মনে হয় অসাময়িক। এখনো স্তব্ধ হবার অবকাশ নেই তোমার, ফলশস্য-বহুল দূর ভবিষ্যৎ এখনো তোমাকে সম্মুখে আহ্বান করচে।

সত্তর বছর উত্তীর্ণ করে কর্ম্ম সাধনার অন্তিমপর্বে আমি পৌঁচেছি। কর্তব্যের চক্ররথ প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করার পরেও এখনো যদি আমাকে চলতে হয় সেটা পুনরাবর্তন মাত্র। এই কারণেই অল্পদিন হোলো আমার দেশ আমার জীবনের শেষ প্রাপ্য সমারোহ করে চুকিয়ে দিয়েছে। সাধারণের কাছে আমার পরিচয় সমাপ্ত হয়ে গেছে বলেই এই শেষকৃত্য সম্ভবপর হয়েছে। আকাশ থেকে শ্রাবণের মেঘ তার দান যখন নিঃশেষ করে দেয়, তখনি ধরাতলে প্রস্তুত হয় শরতের পুষ্পাঞ্জলি। তারপরেও মেঘ যদি সম্পূর্ণ বিশ্রাম না করে সেটা হয় বর্ষার পুনরুক্তি মাত্র, সেটা বাহুল্য।

সেই দাঁড়ি-টানা সময় তোমার নয়, এখনো তুমি দেশকে প্রতিদিন নব নব রচনা-বিস্ময়ে নব নব আনন্দ দান করবে এবং সেই উল্লাসে দেশ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ তোমার জয়ধ্বনি করতে

হইতেন। আর সবচেয়ে পরিতাপ এই যে আমার প্রায় সমবয়সী সাহিত্যিকরাই এই উপদ্রবের সূত্রপাত করিয়াছিল। শুধু এইটুকু সান্ত্বনা যে হয়ত এটাই ইহারা ভালোবাসে,—আমি উপলক্ষ মাত্র। কারণ, গত বৎসরের জয়ন্তী উৎসবেও ইহারা কম দুঃখ দিবার চেষ্টা করে নাই।

আমি একদিন নিজে গিয়া আপনাকে প্রণাম করিয়া আসিতে চাই, শুধু সঙ্কোচে যাইতে পারি না, পাছে কেহ কিছু মনে করে।

থাকবে। পথে পথে পদে পদে তুমি পাবে প্রীতি, তুমি পাবে সমাদর। পথের দুই পাশে যে সব নবীন ফুল ঋতুতে ঋতুতে ফুটে উঠবে তারা তোমার; অবশেষে দিনের পশ্চিমকালে সর্বজন হস্তে রচিত হবে তোমার মুকুটের জন্য শেষ বরমাল্য। সেদিন বহুদূরে থাক। আজ দেশের লোক তোমার পথের সঙ্গী, দিনে দিনে তারা তোমার কাছ থেকে পাথেয় দাবী করবে; তাদের সেই নিরন্তর প্রত্যাশা পূর্ণ করতে থাকো। পথের চরম প্রান্তবর্তী আমি সেই কামনা করি। জনসাধারণ সম্মানের যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে তার মধ্যে সমাপ্তির শান্তি বাচন থাকে, তোমার পক্ষে সেটা সঙ্গত নয় এ কথা নিশ্চিত মনে রেখো।

তোমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে "কালের যাত্রা" নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশা করি আমার এ দান তোমার অযোগ্য হয় নি। বিষয়টি এই—রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে মহাকালের রথ অচল। মানব সমাজের সকলের চেয়ে বড় দুর্গতি কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ-বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব-সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। সেই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে, তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।

কালের রথযাত্রার বাধা দূর করবার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক এই আশীর্বাদ সহ তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করি। শুভানুধ্যায়ী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আপনার শরীর এখন কেমন আছে? এই ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া কি করিয়া যে এত বড় শারীরিক পরিশ্রম আপনি করিতে পারেন ইহাই বিস্ময়ের ব্যাপার। ইতি—সেবক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই বাণীটি ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবেও শরৎচন্দ্রকে ঐদিন আর একটি পত্র দিয়েছিলেন। সেই পত্রটি হ'ল—

কল্যাণীয়েষু,—সম্প্রতি সাংসারিক বিশেষ দুর্যোগ না থাকলে আমি নিশ্চয়ই তোমার অভিনন্দন সভায় যোগ দিতুম। এমন কি শারীরিক অস্বাস্থ্য ও দুর্বলতাও বাধা ঘটাত না।

প্রাচীনকালে আর্যদের ঘরে অগ্নিগৃহ থাকত সেখানে পবিত্র অগ্নিকে যত্ন করে জ্বালিয়ে রাখা হোত, নিবতে দিত না। সাহিত্যে যাঁরা কীর্তিশালী দেশের চিত্তভবনে সেই পুণ্য অগ্নি অনির্বাণ রাখার কাজ তাঁদেরই। তোমার প্রতিভার দ্বারা দেশের হৃদয়কে তুমি জয় করেচ, দেশের গভীর অন্তরে তোমার প্রবেশাধিকার। তোমার লেখনী বাঙালীর চিত্ততত্ত্বকে হাসি ও অশ্রুর নবতর ও গভীরতর ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত করে তুলেছে। যেখানে তার মনোমন্দিরে চিরন্তনের পুণ্য বেদিকা, সেইখানে তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যপ্রদীপ বাংলা সাহিত্যের জ্যোতিঃশিখায় দীর্ঘ আয়ুঃ সঞ্চার করবার জন্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে, এই কথা জেনে আমার কর্মাবসানের পশ্চিমদ্বার থেকে তোমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করি। ইতি—৩১ শে ভাদ্র ১৩৩৯—তোমাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা]

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট

জেলা হাবড়া। ৮ই বৈশাখ ১৩৩৩

প্রিয়বরেষু,—কেদারবাবু, কয়েক দিন হইল আপনার পোষ্টকার্ড-খানি পাইলাম। চিঠিটুকু ছোট, কিন্তু স্নেহে ভরা। কিসের জন্য জানি না আমাকে আপনি এতখানি ভালবাসিয়াছিলেন। যে সকল গুণে মানুষকে মানুষে ভালবাসে আমার ত তাহার কিছুই নাই। অন্ততঃ, ত্রুটি এত বেশি যে তাহার পরিমাণ হয় না।

সেদিন দিলীপকুমার রায়কে রবিবাবু লিখিয়াছিলেন, "শরৎ শুনেছি নিজের আইনে নিজেকে কোন্ দ্বীপান্তরে চালান্ ক'রে দিয়ে নিঃসঙ্গ বন্দীব্রত গ্রহণ ক'রে ব'সে আছেন—তাঁর ঠিকানা জানি নে—তুমি নিশ্চয়ই জানো, অতএব তাঁকে মোকাবিলায় বা ডাকযোগে জানিয়ো যে যেখানেই থাকুন সর্ব্বান্তঃকরণে আমি তাঁর কল্যাণ কামনা করি।"

কেদারবাবু, বন্দীব্রতই নিয়েছি। সহরেই থাকি বা পাড়াগাঁয়ে বাস করি আমি সংসারের জোয়ার-ভাঁটার উভয়েরই বাহিরে গিয়াছি।

দেহ নিয়তই মন্দের দিকে পা ফেলিতেছে,—মনে আছে হয়ত আপনার ৫১ বৎসরে যাবার দিন কুষ্ঠিতে ধার্য্য করা আছে, আর বড় তার বিলম্ব নাই,—বছর দেড়েক—জগদীশ্বর করুন তাই যেন হয়। আর যেন তিনি আমার ক্লান্তিকে বাড়াইয়া না দেন।

কানপুরে যাওয়ার পূর্ব্বের দিন অকস্মাৎ বার কয়েক বমি করিয়া সমস্ত পেটে এমন ব্যথা ধরিল যে ৫।৭ দিন চিকিৎসকের আদেশে শয্যাগ্রহণ করিয়া রহিলাম। তবে সে ভাবটা আর নাই। এইবার

বাস্তবিকই ভারি ইচ্ছা হইয়াছে একবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়। গরম যদি এত না পড়িত আমি কাশী যাইবার জন্য আপনাদের বাড়ী ভাড়া করিতে অনুরোধ করিতাম।[১]

কিছুই আর করি না, রূপনারাণের তীরে ঘর বাঁধিয়াছি,—একটা ইজি চেয়ারে দিনরাত পড়িয়া থাকি।

হরিদাস ভায়ার[২] সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ হয় আমার অন্তরের স্নেহাশীর্ব্বাদ দিবেন।

তবে সম্প্রতি ভাল আছি; General নালিশ ছাড়া particular অভিযোগ নাই।

আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন। ইতি—আপনার শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া। ২২শে কার্ত্তিক '৩৩

প্রিয়বরেষু,—আপনার চিঠি পেলাম। কেদারবাবু, বলিবার কিছু আর নাই। বাড়ীর একটা পশুপক্ষীর মৃত্যুও যাহার সহে না তাহার বলিবার আছেই বা কি। একবার আপনাদের কাছে গিয়া বসিবার বড় ইচ্ছা করে, আর ভাবি ভিতরে ভিতরে আমি যে এতবড় দুর্ব্বল ছিলাম এ কথা ত জানিতাম না। এ ব্যথা [ভ্রাতৃবিয়োগের] আমার সহিবে কি করিয়া!—আপনার শরৎ

১। কেদারবাবু এই সময় কাশীতে ছিলেন।

২। কাশীর কবিরাজ হরিদাস শাস্ত্রী।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া [২৩, ২, ২১]

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু—আমি ত এখনও বাঁচিয়া আছি কেদারবা আমার নমস্কার জানিবেন। আপনি? আছেন ত? টিকিয়া থাকি একটা খবর দিবেন, না থাকিলে আর কি করিবেন? সে ক্ষে জবাব না পাইলেও আমি রাগ করিব না, বাস্তবিকই মন আম এত বড় উদার ও ক্ষমাশীল হইয়া গেছে। গৃহিণী? আছেন এগিয়েছেন?—আপনার শরৎ।

সামতাবেড়, পানিত্রাস
জেলা হাবড়া। ২৯ শে আশ্বিন '৩৪

প্রিয়বরেষু,—নমস্কার জানাবার সময় হ'ল। তাই। কাশী যা প্রায় স্থির। বাড়ীর জন্যে চিঠি লিখেচি, একটা খবর পেলেই হয়।

কিন্তু আপনি? না থাক্‌লে? বাবা বিশ্বনাথ দিনকতক অনুপ থাক্‌লেও আমি আপত্তি কোরব না, কিন্তু আপনার অনুপস্থিতি ত কাশী আমার কাছে একদিনেই অচলা হয়ে উঠ্‌বে। দয়া ক' আবেদনটিকে আমার অতিশয়োক্তির কোঠায় ফেলে যেন নিশ্চিন্ত হ না। আমি জানি আমাকে আপনি বোঝেন। ইতি—আপনার শরৎ

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া। [১০ জুন ১৯২৮

প্রিয়বরেষু,—কত কাল পরে আপনার হাতের লেখা চোখে দেখ পেলাম। সকলের আগে এই কথাটাই মনে এলো যে ভালব যেখানে সত্য, যেখানে অন্তরের বস্তু,—তার মধ্যে আর ভ্রম নেই।

মন স্বতঃসিদ্ধের মত মেনে নেয়। আমাদের বাইরের আচরণ দেখে কারো ভাব্‌বার যো নেই যে আমরা কেউ কাউকে স্মরণ করি, অথচ, আমার দিক দিয়ে তো জানি যখনই আপনার লেখা ছাপার অক্ষরে পড়ি তখনই মনে পড়ে কাশীর কথা। জীবনের শেষ দিকে ঐটুকুই সম্বল রয়ে গেল। আগে প্রায়ই ইচ্ছে হোতো কাশী যাই,—এখন সে ইচ্ছেও আর হয় না আপনি নেই ব'লে। আচ্ছা কেদারবাবু, কাশী-বাস কি আপনি ছেড়ে দিলেন? শেষকালে কি পূর্ণিয়ার ভাগাড়টাই সার করবেন? জানি আপনার পূর্ণিয়া ছাড়বার অনেক বাধা, তবু ও যায়গাটাতেই আছেন মনে হ'লে আমার বিশ্রী লাগে। ভাববারও যো নেই যে এই তো কাশী, ইচ্ছে হলেই গিয়ে কেদারবাবুকে দেখে আসা যায়।

এবার আমার সামতাবেড়ের আসন টল্‌লো বোধ হয়। আর ভালো লাগ্‌চে না। অথচ, কোথায় গেলে যে ঠিক ভালো লাগ্‌বে তাও ভেবে পাচ্চি নে। পূজোর পরে যাহা কিছু একটা কোরব।

আপনি ষোড়শীর কথা শুন্‌লেন কার কাছে? শিশিরের অভিনয় দেখেছেন? কি চমৎকার করে। বইটা আমার উপন্যাস দেনা-পাওনার গল্প থেকে নেওয়া। থিয়েটারের মত কোরে একটা বইও (নাটক) ছাপানো হয়েছে। পড়েছেন? বই যা হোক্, অভিনয় বড় ভালো হয়।

আপনার শরীর এখন কেমন আছে কেদারবাবু? আগেকার চেয়ে ভালো ত? প্রার্থনা করি আপনি আরও কিছু দিন বেঁচে থেকে গল্প লিখুন। আমি প্রত্যেক ছত্রটি তার পড়ি। বন্ধুর লেখা ব'লে নয়, সত্যিকার সাহিত্যিক মানুষের লেখা ব'লে পড়ি।

আমি ভালোয় মন্দয় বেঁচে আছি,—কিন্তু বাঁচাটা পুরোনো হ গেছে। রোজই সে খবর টের পাচ্ছি।—আপনার শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যা

চিঠির জবাব দিতে ভুলবেন না।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট

জেলা হাবড়া। ২৭শে আশ্বিন '৩৬

প্রিয়বরেষু,—আজ বিজয়া দশমীর সায়াহ্ন। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। এ জীবনে যে কয়জনের সত্যকার স্নেহলাভ ক'রে ধন্য হয়েছি আপনি তাঁদেরই একজন। কিন্তু সে স্নেহের মর্য্যাদা আমি শুধু জড়তা আর আলস্যের জন্যই রাখ্‌তে পারি নি। অথচ, এমন মাস বোধ হয় একটিও কাটে না যাতে আপনাকে স্মরণ না করি। আর বাইরের অপরাধ যতই বেড়ে চলে ততই ভাবি আপনি কোনদিন আমাকে ভুল বুঝ বেন না।

১লা কার্ত্তিক

কোষ্ঠীর ফলাফল আজ সকালে শেষ হ'ল। আচ্ছা, আমার মত একজন সামান্য লোককে কি ভেবে এতখানি গৌরব দিয়ে বস্‌লেন? সাহিত্যিকের দল ভাব্‌বে কি বলুন ত?

চমৎকার লাগ্‌লো। দীন দুঃখী কেরাণীকে কেউ আজও এমন অন্তর দিয়ে ভিতরে পেয়ে এত মধুর কলম দিয়ে সংসারে প্রকাশ করে নি। ব্যথায় বুকের মধ্যে যেন টন্‌ টন্‌ করতে থাকে। ভাষা আর লেখার ভঙ্গীটি ভগবান যেন আপনাকে ঢেলে দিয়েছিলেন। এব একটি হিতোপদেশও এই বইখানি থেকে সংগ্রহ করেচি। রেলে তরুণ-কবি-কর্ম্মচারীটি যখন বলচে যে দিনের মধ্যে একবারও থাত

খানি হাতে নিয়ে বস্‌তে না পারলে দিনটাই যেন ব্যর্থ মনে হয়। লিখ্‌তে পারি না পারি ভেবেচি নিজের জীবনে এই পরম সত্য বাক্যটি আজ থেকে প্রত্যহ পালন ক'রে চল্‌বো। মাসের পর মাস কেটে যায় খাতা কালি-কলমে হাত দিতেও মন চায় না—আপনার আশীর্ব্বাদে যে ক'টা দিন বাকি আছে সে ক'টা দিন যেন প্রতিদিন এই কথাটি মনে রাখতে পারি।

বইখানিতে একটিমাত্র ত্রুটির বিষয় উল্লেখ কোরব,—কিন্তু রাগ করতে পারবেন না এই অনুরোধ। ভগবান লেখার শক্তি আপনাকে অপর্য্যাপ্ত দিয়েছেন, কিন্তু এ কথা ভুল্‌লে চল্‌বে না যে ঐশ্বর্য্যবানেরই মিতব্যয়ী হওয়া প্রয়োজন, কাঙালের সে আবশ্যক হয় না। শুধু লিখে চলাই তো নয়, থামতে পারার কথাটাও মনে থাকা চাই যে।

এবার কাশী কবে যাবেন? শীঘ্র যদি যান আমাকে এক ছত্র লিখে জানাবেন।

এখন থেকে চিঠির জবাব পরের দিনই দেব। এ আর অন্যথা কোরব না।

নমস্কার।—আপনার শরৎ।

পুনঃ—এইমাত্র যে চিঠিখানি বিজয়ার দিনে আমার কল্যাণ কামনা করিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা পাইলাম। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার এবং ধন্যবাদ। শ.

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট

জেলা হাবড়া, ২৫শে কার্ত্তিক ১৩৩৬,

প্রিয়বরেষু,—কয়েক দিন হ'ল আপনার অপরিসীম স্নেহের খবর ব'য়ে নিয়ে চিঠিখানি এসেছে। ভেবেছিলাম একটুখানি শান্ত হয়ে এর

জবাব দেব, কিন্তু সে সুযোগ আর পাচ্চি নে। কিন্তু কথা দিয়েচি যে যদি এক ছত্রও হয় তবুও আপনার পত্রের উত্তর লিখ্‌বো। বহু ত্রুটি হয়ে গেছে আর অপরাধ বাড়াব না। তাই এই।

পল্লীগ্রামে বাস করতে আসার যথাযোগ্য ফলভোগ আরম্ভ হয়েছে, অর্থাৎ, মামলায় জড়িয়ে—civil এবং criminal,—বেশ উত্তেজনায় ছুটোছুটি সুরু করেচি। এই তিন বছর নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার ভাবে দিব্যি ছিলাম, কিন্তু পাড়াগাঁয়ের দেব্‌তার আর সইল না, ঘাড়ে চাপ্‌লেন। বড় জমিদারের কাছে পার আছে কিন্তু, স্থানীয় অতিক্ষুদ্র পত্তনিদারের চাপ দুর্ব্বিষহ। ২।৪ বিঘে ছিল বহুকালের শিবোত্তর, জমিদারের দান কিন্তু ২।৪ বছরের নতুন পত্তনিদারের তা সইল না। গরীব প্রজারা কেঁদে এসে পড়লো,—লেগে গেলাম। খবর দিলাম যে আমি হাতে নিলে তা ছাড়ি নে। তার পরে ফৌজদারী। যাক্ সে কথা, তবে ঝঞ্ঝাট বেড়েচে। ভাব্‌চি এটা কোনমতে শেষ হলেই পালাবো। সহরই মোটের ওপর সুসহ।

কোষ্ঠির যে বিবরণ দিয়েছেন তা মোটেই অবিশ্বাস্য নয়,—জ্বরের একটা নেশার ভাব আছে, ঠিক ফৌজদারী মাম্‌লার মত অতটা না হোক, তবু তারও উত্তেজনা ফেল্‌না নয়। জ্বরের ওপর লিখ্‌লেই ওই হবে। তা হোক্, কিন্তু তার পরে শান্ত মনে যতটা সম্ভব সুস্থ দেহে তার বাড়তি অংশটা কেটে বাদ দিতে হবে। এ কাজ নিজের,—কখনো অপরে করতে পারে আমি বিশ্বাস করি নে।

ওই বইখানির মধ্যে পরিহাসের ছলে কত গভীর এবং কতই না মধুর কথা আছে। বইখানি আমার লেখাপড়া করার ঘরে বিছানার ওপরে থাকে, মাঝে মাঝে যেখানে পাতা উল্টে যায় সেখানেই দশ পনর মনিট পড়ি।

ভাদুড়ি মশাই গল্পটা আমি পড়ি নি। বসুমতী আসামাত্রই ওপরে চলে যায়, ফিরে প্রায়ই আসে না। তবে বাড়ীতেই থাকে,—সংগ্রহ ক'রে নিতে কষ্ট হবে না।

পড়ার খবর আর এক দিন দেব। কিন্তু গল্প আপনার, লেখা আপনার, আমি তার জোট খুল্‌বো কি ক'রে? সে বিদ্যে কি আছে যে আপনার ওপরেও মুরুব্বিয়ানা করলে লোকে সহ্য করবে? তবে নিতান্তই যদি হুকুম করেন তো যথাসাধ্য গল্পের সর্ব্বনাশ করতেই হবে।

জানুয়ারী মাসে যদি কাশীতে একবার যান তো আমি লাহোরের ফিরতি নেবে যাবো।

নমস্কার।—আপনার শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট

জেলা হাবড়া, ৭ই পৌষ ১৩৩৭।

প্রিয়বরেষু,—চিরদিন সময় বইয়ে দিয়েই হোলো হুঁস, তাই এ জীবনের সকল কাম্যই এলো হাতের কাছে, কিন্তু নাগালের নীচে নাব্‌তে আর চাইলে না। বার বার চিঠি লিখ্‌তে চাইলাম, বার বার দিন-ক্ষণ গেলো উত্তীর্ণ হয়ে। সেই চিঠি আজ লেখাও হোলো, কিন্তু তার ফলটুকু আর পেলাম না। হাতের বাইরেই রয়ে গেলো। আমার সান্ত্বনা এ আমার কপালের লেখা, একে এড়াবো কি ক'রে? ভালোবেসে খোঁজ-খবর নেবার মামলায় বিজয়ের দিকটা এ জন্মে আপনাকেই ছেড়ে দিলাম,—জন্মান্তর যদি থাকে, তখন আপনি কোরে একবার দেখ্‌বো।

কেমন আছি জান্‌তে চান? বেশ আছি। দিনরাত একটা ইজি চেয়ারে ঢাকা-বারান্দায় শুয়ে আছি। বাঁ-পা খোঁড়া, ডান-কান বধির,

অর্শের অজুহাতে অকেজো রক্তগুলো নিয়মিত বেরিয়ে যাচ্ছে,—তন্দ্রায়, আরামে ক্ষণে ক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ি, স্বপন্ দেখি, জাগি,—চোখ্ চাইলেই সুমুখে মস্ত নদী, পালের নৌকোগুলোকে গুণি, হঠাৎ কখন্ চোখ বুজে আসে, যায় সব খেই হারিয়ে,—দক্ষিণের সূর্য্যদেব ঘুরে এসে কড়া রোদে গা দেয় তাতিয়ে, চোখ মেলে গুড়গুড়ির নলটা টেনে দেখি,—বলি, কে আছিস্ রে, তামাক দে—হয়ত দিয়েও যায়, কিন্তু টান্‌লে দেখি তেম্‌নিই ধুঁয়া নেই। বক্‌লে বলে, ঘুমুচ্ছিলেন যে। সাজা তামাক পুড়ে গেছে। যাচাই করার শক্তি নেই, তবু গলা চড়িয়ে ধম্‌কে বলি,—হাঁ—ঘুমুচ্ছিলাম বই কি! ব্যাটা মিথ্যেবাদী। দে বল্‌চি শীগগির সেই দিল্লী থেকে আনা বড় কল্‌কেটায়, যেন এ বেলার মতো না নেবে। তারা চ'লে গেলে মনে মনে বলি, বাবা ভগবান, যদি সত্যিই থাকো করোই না একটা আব্‌দার মঞ্জুর, কেউ তোমাকে নিন্দে করবে না। মাথার দিব্বি রইলো, বাবা, কথাটা রাখো।

এক দিন রাখ্‌বে তা জানি, কিন্তু হয়ত আমারই মতো সময় বইয়ে দিয়ে। তখন খুশী হয়ে আর নিতে পারবো না।

কিন্তু ডাক এলো। পাথেয় উপস্থিত। ঘুমুতে-ঘুমুতে আর জাগ্‌তে-জাগ্‌তে পড়া সুরু করি। বহুদিনের অভ্যাস, বহু আফিঙ রক্ত-মাংসে জড়ানো। হেরেছি অনেকের কাছে, কিন্তু হার মানিয়েছিলাম আবগারী ব্যাটাদের। তাই ভরসা আছে, ঘুমের মধ্যেও পাথেয়র রস কস বেয়ে ভূঁয়ে গড়িয়ে পড়বে না।

চিঠির ভাষা আমার চিরকালই এলোমেলো। মানুষকে কষ্ট কোরে বুঝ্‌তে হয় এই তাদের শাস্তি। আপনাকেও স্নেহাই দিলাম না প্রার্থনা, মাঝে মাঝে যেমন খবর দেন তা থেকে যেন রাগ কোরে বঞ্চিত করবেন না। ইতি—আপনার স্নেহের শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সামতাবেড়, পানিত্রাস, জেলা হাবড়া

৫ই আষাঢ় '৩৮

সুহৃদ্বরেষু,—কেদারবাবু, যথাসময়েই আপনার স্নেহশীতল চিঠিখানি পেয়েছিলাম, কিন্তু এ ক'দিন এম্‌নি ব্যস্ত ছিলাম যে উত্তর দিতে পারি নি। কাল আমাদের হাবড়ার জেলা Congress election হয়ে গেলো। এবার বিরুদ্ধ দলের সোরগোল, গালি-গালাজ ও লাঠি ঠেকঠকি দেখে ভেবেছিলাম হয়ত বিনা রক্তপাতে শেষ হবে না। আমি President, সুতরাং আমাদেরও যথারীতি প্রস্তুত হ'তে হয়েছিল। সভায় দাঙ্গা হয় এ আমার ভারি ভয়, তাই কাঁটা তারের বেড়া, মায় electrification সবই তৈরি রাখতে হয়েছিল। আর তৈরি ছিল বলেই দাঙ্গা হয় নি, নির্ব্বিঘ্নে দখল কায়েম রাখা গেল। বছর দশেক President আছি, vested interest জন্মে গেছে—সহজে ছাড়া চলে না। চলে কি? আমাদের পক্ষের যুক্তিটা এই যে গলদ্ যতই থাক্, তোমরা বল্‌বার কে? এবং দেশের মুক্তি যদি আসে তো আমাদের দ্বারাই আসুক। তোমরা পারবে না। তোমরা হাত দিতে যেয়ো না। কিন্তু ওরা সম্মত হয় না ব'লেই তো আমরা রেগে যাই। নইলে আমাদের, অর্থাৎ সুভাষী দলের মেজাজ খুবই ঠাণ্ডা। অনেকটা আপনার মতো। যাক্, এখন একটু সময় পাওয়া গেল। দু এক মাস বই লিখ্‌তে সুরু করি। কি বলেন?

যখন কলকাতায় এসেছিলেন আমাকে একটু খবর দেন নি কেন? রাস্তা ঘাট যত খারাপই হোক্, কিছু একটা উপায় করতামই। কাশী যাবেন কবে? একবার দেখা হ'লে বড় ভালো হয়। খবর দেবেন।

—আপনার শরৎ।

২৪, অশ্বিনী দত্ত রোড, কালীঘাট,
কলিকাতা।
২১ কার্ত্তিক ১৩৪৩।

প্রিয়বরেষু,—আমিও অন্তরের প্রীতি নমস্কার জানাই। আপনার চেয়ে একটু দেরি ক'রে আমি সংসারে এসেছিলাম, তাই ব'লে দেরি করেই যে সংসার থেকে যেতে হবে বিধাতার এমন কোন কড়া আইন নেই। এ কথাটা আপনাকে জানানো প্রয়োজন মনে করি। কে-একজন কেরাণী নাকি আফিসে দেরি ক'রে আসতো। সাহেব তার উল্লেখ করায় বলেছিল, Yes sir I come late but, I always go early. এও ত হয় কেদারবাবু।

আপনার শরৎবাবু।

[শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা]

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট

জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণবরেষু,

আপনার পত্র পাইয়া কত কি যে মনে হইল বলিতে পারি না। বাড়ীর একটা পশুপক্ষীর মৃত্যু পর্য্যন্ত সহিতে পারি না, এই আকস্মিক ছোট ভাইয়ের শোক[১] আমাকে যেন প্রতি নিয়ত দগ্ধ করিতেছে। ব্যথা যে এত বড় থাকে এ যেন আমি জানিতাম না। কে জানিত ভিতরে ভিতরে আমি এতখানি দুর্ব্বল ছিলাম। কত কি লিখিয়াছি—সকলই মনগড়া, কে ভাবিয়াছিল আমার জীবনেই তাহা এমন সত্য হইয়া উঠিবে। আজ আর একটা সত্য উপলব্ধি করিয়াছি। তাই, বাকি জীবনটা যেন সকলেরই শুভ-কামনা করিয়া শেষ করিতে পারি। ২২শে কার্ত্তিক '৩৩।

শরৎদা

টাকা কড়ির প্রয়োজন সম্প্রতি নাই, হইলেই জানাইব।

ভায়া,

১। এই মাত্র চিঠি পেলাম। দুই একটা বানান ভুল ছাড়া যেমন সর্ব্বাঙ্গণ এর ণ স্থানে ন এমনি। আর কিছু বদলাবার নেই। দামটার সম্বন্ধে একটু বিবেচনা যদি করেন, কিম্বা না করেন সে আপনার ইচ্ছা, কারণ এখন ত ছাপার ওপর অনেক প্রকারের Tax বেড়ে গেলো।

২। গালি গালাজের বহর দেখে হয়ত আপনি ভয় পেয়েও থাকতে

১। শরৎচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা স্বামী বেদানন্দের মৃত্যুশোক।

পারেন, কিন্তু এমনিই একটা পণ্ডিত সমাজ বইটাকে[১] নির্ব্বিচারেই ভালো বলে যেমন, ওরাও নির্ব্বিচারে মন্দ বলে। ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছিল বলে আপনি কিছুমাত্র লজ্জিত হবেন না। এই অনুরোধ। সকল ব্যাপারেই দুপক্ষ থাকে। তারাই যে প্রবল পক্ষ, এ নাও হতে পারে। এবং কালের বিচারে তারাই যে সত্য এ-ও না হতে পারে।

৩। 'শেষের পরিচয়' নাম দিয়ে আর একটা লেখা আরম্ভ করে ২ chapter লিখেছি, যদি আপত্তি না থাকে তো পাঠাই। তবে এ assurance এবার দিতে পারি যে এ বইটাতে punctual হবোই। কি বলেন ? আপনার লজ্জা পাবার ব্যাপার এ বইটাতে নেই।

দাদা

সামতাবেড়, পানিত্রাস
হাবড়া

কল্যাণীয়েষু,

তুলুর[২] মারফৎ কাল রাত্রে আপনার পত্র পেলাম। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে চিঠি লেখা তা বোঝা যায়। কিন্তু অবস্থাটা ভালো বিশ্বাস করতে পারেন নি বলেই। গত বুধবার আমার জ্বর হয়, আটদিন পরেও জ্বর ছাড়ে নি, রোজ বেলা তিনটায় আসে, যায় রাত্রি দশটায়। ডাক্তারদের বিশ্বাস লিভার ঘটিত, সুতরাং আরও কদিন যে ভুগবো কোন নিশ্চয়তা নেই। ওঁরা আশা করেন আর ২।৩ দিন, কিন্তু আমার নিজের সে ভরসা নেই।

১। শেষপ্রশ্ন।

২। তুলসীদাস চট্টোপাধ্যায়। ইনি শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর ছোট জায়ের ভাই

আপনি দত্তার অভিনয় সত্ব[১] চেয়েছিলেন অতএব আমি খুসি হয়েই দিতে রাজী হয়েছিলাম। কিন্তু কপালে ঘটালে বিড়ম্বনা, নইলে বিজয়া নাটক এতদিনে শেষাশেষি করে আনতাম।

আপনি অপরকে দিয়ে সাট লেখাতে চাইচেন কিন্তু সে কি আমার চেয়েও শীঘ্র পেরে উঠবে? ওর দেখেচি অনেক অসুবিধে আছে মাঝখানে—গ্রন্থকার নিজে না হলে সে সব স্থান পূর্ণ করে তোলা কঠিন বলেই মনে করি। এবং অভিনয়ের দিক দিয়েও সে যে বিশেষ ভালো হবে তাও ভরসা করি নে, আমার নিজের লেখা হলে সে বাধা থাকে না এবং আমিও একখানা নাটক "বিজয়া" নাম দিয়ে ছাপাতে পারি। পরের তৈরি হলে ত পারবো না। Cinemaর ব্যাপারে আমার কোন গরজই নেই।

প্রথম অঙ্ক প্রবোধ গুহ লিখতে নিয়ে আর দিলে না—কপি যেটা ছিল, সেটা অভিনয়ের উপযোগী করে লিখতে আরম্ভ করেছিলুম, এমনি সময়ে এই প্রতিবন্ধক।

অথচ, আপনাদের বিলম্ব হলে (অর্থাৎ 'বিজয়া'র আশায়) বহু ক্ষতি। অভিনেতাদের মাইনে দিতে হচ্ছে নিরর্থক। এ অবস্থায় কি যে করবো বুঝতে পারিনে। অথচ সমস্ত বইটাই এক রকম তৈরী করা আছে, শুধু একটু অদল-বদল বা অল্প-স্বল্প লিখে কপি করানো। যদি ইতিমধ্যে ভাল হয়ে উঠি নিশ্চয়ই করে তুল্‌বো। কিছুদিন পূর্ব্বে যদি এ মৎলব করতেন ভাবনাই ছিল না। কিন্তু ভবিষ্যতের ভরসায়—

১। হরিদাসবাবু এবং তাঁর কয়েকজন বন্ধুর আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্ নামে এই সময় কলকাতায় একটি নামকরা পেশাদার থিয়েটার ছিল। এই থিয়েটারে অভিনয় করবার জন্য হরিদাসবাবু শরৎচন্দ্রকে তাঁর দত্তা উপন্যাসের নাট্যরূপ করে দিতে বলেছিলেন। দত্তা নাটকে রূপান্তরিত হলে তখন এর নাম হয় বিজয়া।

আপনাদের টাকাটা হাতে রাখা সঙ্গত নয় মনে করি। এতদিন চেকটা পড়েই ছিল, কাল তাকে লয়েড ব্যাঙ্কে পাঠিয়েছি। আজ সেইজন্যে আর একটা চেক লিখে পাঠালাম। যা ভালো বিবেচনা করবেন তাই করবেন।...ইতি—৭ই আষাঢ় ৪০,

শুভার্থী—শরৎদা

পরম কল্যাণীয় শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়—

Panitras.

ভায়া, ইচ্ছে ছিল নিজেই যাবো কিন্তু বড়-বৌ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা নিউমোনিয়ায় শয্যাগত। তবে, ভালো হয়ে আসচেন। দুচার দিনে যাবার বিঘ্ন ঘটবে না বলেই মনে হয়।

আমার কলকাতার বাড়ীটা শেষ হয়ে এলো। এ সময়ে আপনি আমাকে হাজার-পাঁচেক টাকা দিলে আমার দুর্ভাবনা ঘোচে। যে তিন খানা নতুন বই আমার প্রায় শেষ হয়ে এলো আশা হয়—এর থেকে ওটা এক বছরেই শোধ হতে পারবে। বাড়ীটার এষ্টিমেট ছিল চোদ্দ হাজার টাকা, যাঁরা তৈরি করলেন তাঁদের সঙ্গে ব্যবস্থা ছিল অর্দ্ধেক টাকা এ বছরে দেবো, বাকি অর্দ্ধেক পরের বছরে দেবো। কিন্তু পাকে চক্রে খরচ বেড়ে গেল আরও হাজার তিনেক বেশি। নইলে টাকার আবশ্যক হতো না, ধার না করেও নিজেই দিতে পারতাম।

এ বাড়ীতে আজ পর্য্যন্ত বোধ করি হাজার ষোল সতেরো নষ্ট করলুম, কলকাতার বাড়ীতেও বোধকরি হাজার তিরিশ নষ্ট হবে। এমনি কোরেই জীবন কাটলো।

অভাবে পড়লেই আপনাকে জানাই। এই অভাবটাও জানালুম। বিজয়া শেষ হয়েও হচ্চে না—শেষটুকুতে এসেই আটকেচি। একটা

না একটা বাধা আসচেই। এবার যেদিন যাবো সঙ্গে নিয়ে যাবো, ভরসা হয় আপনাদের অপছন্দ হবে না। ইতি—১৪ই চৈত্র ১৩৪০।

শুভাকাঙ্ক্ষী—দাদা

সামতাবেড়, পানিত্রাস
হাবড়া

কল্যাণীয়েষু, প্রকাশের মুখে শুনলাম আমার অনুরাধা-সতী ও পরেশ এই নামটি আপনার ঠিক মনোমত হয়নি, কিন্তু আমার ভারি ইচ্ছে—এ বইখানির নামকরণ এমনিই হয়। শুধু অনুরাধা নয়। আমি ইংরিজি কয়েকখানা বইয়ে এই ধরণের নাম দেখেচি বলে মনে হয়। দাদা

24 Aswini Dutt Road
Calcutta.

ভায়া, বাড়ীতে ছেলে মেয়েরা কেউ নেই, তারা গ্রামের বাড়ীতে, আছি শুধু প্রকাশ[১], আমি ও রামকৃষ্ণ[২]। দুঃখ তাঁরা কেউ ঘুষের[৩] পরিমাণটা দেখতে পেলেন না। আমরা পরমানন্দে ভোজন করবো এবং বউমাকে সর্ব্বান্তকরণে আশীর্ব্বাদ করবো। তিনি রোগমুক্ত হোন, সকলকে নিয়ে সুখী হোন। ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪। শরৎদা

১। শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

২। শরৎচন্দ্রের দিদির দেওর-পো শ্রীরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

৩। হরিদাসবাবুর স্ত্রী ব্রতউদ্যাপন উপলক্ষে সিধে পাঠিয়েছিলেন। হরিদাসবাবু এক চিঠিতে লিখে দিয়েছিলেন—দাদা, আপনার বৌমা স্বর্গলাভের আশায় ঘুষ পাঠাচ্ছেন গ্রহণ করবেন।

24 Aswini Dutt Road
Calcutta.

ভায়া, জ্যাঠামশায়ের শ্রীচরণে অর্পণ করার জন্যে কন্যা [১] এনেছেন দণ্ড বহুদূর মুসৌরি থেকে। শ্রীচরণে অর্পণ করার ইঙ্গিত বোধ করি এই যে ভবিষ্যতে না লিখলে কাজকর্ম্ম না করলে ঠ্যাং ভেঙে দেওয়া হবে।

যাই হোক্ লাঠিটি চমৎকার। আমার কাজে লাগবে। ঠ্যাং দুটাকে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দিতে।

একটা প্রার্থনা আছে, income taxবালারা—Statement দেবার তাগিদ দিয়েছেন। গত বৎসর ও এ বৎসরের 31 march পর্য্যন্ত। ঐটে যদি কাল সকালে পাঠিয়ে দেন। আপনার হিসাবের খাতা আমার কাছে আছে বটে, কিন্তু এমন বাঁধা খোলা যায় না। নইলে আপনাকে আর কষ্ট দিতাম না—নিজেই দেখে নিতাম। ৫ই আষাঢ় ১৩৪৪। শরৎদা

দিন দুই হঠাৎ কলিক ব্যথায় ভারি কষ্ট পেলাম।

24, Aswini Dutt Road
Calcutta.

ভায়া, আপনার চিঠি এবং ফুল পেলাম। আমি পরশু বিকালে বাড়ী থেকে এসেছি এবং কাল ফিরে যাচ্ছি। ওখানে হঠাৎ ওঁদের সব শরীর খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি ছাড়া বন্ বন্ করে সকলেরই নাকি মাথা ঘুরচে।

যমুনা এখানে আসে কিনা জানিনে। বুদ্ধি যখন অল্প ছিল তখন অনেকের অনেক প্রকারের উপকার করার চেষ্টা করেছি; অন্ততঃ ক্ষতি

১। হরিদাসবাবুর কন্যা লাবণ্য দেবী মুসৌরী বেড়াতে গিয়ে শরৎচন্দ্রের জন্য সেখান থেকে একটি লাঠি এনেছিলেন।

করা, হীন করার আয়োজন করা এ সব মনোহর কর্ম্ম জীবনে করেছি বলে মনে পড়ে না। আজ নিজের শক্তি কমেছে, যাবার দিন এগিয়ে এসেছে, সুতরাং নিজের দান করার সঞ্চয় যখন পাত্রের তলায় এসে ঠেকেছে, তখন এঁরা আমার কৃতকর্ম্মের পুরস্কার দিতে আরম্ভ করেছেন।[১] আমার পার হবার পারানির কড়ি ঐগুলি। নিঃশব্দে হাত পেতেই নেবো; নালিশ জানিয়ে আর অশান্তি আনবো না এই সঙ্কল্পই করে রেখেচি। আপনারা যাঁরা আমাকে সত্যিই ভালবাসেন মনে দুঃখ পান বুঝি, কিন্তু সহ্য করা ছাড়া প্রতিকারের পথ ত নেই।

শ্রীকান্ত বাড়ীতে ফেলে এসেছি। নিয়ে এসে দেবো। নানা কারণে আজ সকাল থেকেই মনটা একটু বিচলিত হয়ে আছে।

আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি। ইতি ২৫শে আষাঢ় ১৩৪৪

শরৎদা

24, Aswini Dutt Road
Calcutta.

পরম কল্যাণীয়েষু,

আপনার চিঠি আজ সকালে গ্রামের বাড়ীতে পাই। অতএব শ্রীকান্ত দিবার জন্য নিজে আসিতেই হইল। অবহেলা করি কিরূপে? আমার স্বভাব যে কাজ করা প্রয়োজন তাহা তৎক্ষণাৎ না করিতে পারিলে কিছুতেই মনের মধ্যে শান্তি পাই না, সে ত আপনি জানেন। কেমন আছেন? দেশের বাড়ীতে বড় বৌ একাকী পীড়িত। সন্ধ্যার পরে মাথা ঘোরা এক নূতন ব্যাধি, ছোট বৌমা তাঁর যে যেখানে আছে

১। যে যমুনা পত্রিকাকে শরৎচন্দ্র এক সময় লেখা দিয়ে, উপদেশ দিয়ে কত সাহায্য করেছিলেন, সেই যমুনাই শেষে শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে লিখত। শরৎচন্দ্র এখানে সেই কথারই উল্লেখ করেছেন।

সঙ্গে করিয়া মুঙ্গেরে পিতৃগৃহে ভাইয়ের বিবাহ উৎসবে যোগদান করিতে গিয়াছেন। কবে তাঁরা ফিরিবেন শ্রীভগবান জানেন। ভাবি ভায়া, বুড়োদের বাঁচিয়ে রাখেন তিনি কোন্ মহৎ প্রয়োজনে! শ্রীপাদপদ্মে একটু তাড়াতাড়ি স্থান দিলে দেখিতে শুনিতে সকল দিকেই ত শোভন হয়। ৯ই শ্রাবণ ১৩৪৪ শরৎদা

24, Aswini Dutt Road
Calcutta.

পরম কল্যাণীয়েষু—চরিত্রহীন দু'খণ্ড পেলাম। একটাতে আমার ছোট ভূমিকাটি সাঁটা আছে। অপরটায় নেই। দপ্তরি বোধ করি কাগজটা জুড়ে দিতে ভুলেছে। একটু বলে দেবেন ওটা যেন ভুল না করে।

চন্দ্রনাথ ও অরক্ষণীয়া পেলাম। শীঘ্র সংশোধন করে দেবো। গৃহদাহর জোগাড় করি।

আচ্ছা, চরিত্রহীনের দাম কমিয়ে তিন টাকা করার কি একটা প্রস্তাব হয়েছিল? আমার মনে হচ্চে যেন হয়েছিল।

কাল বাড়ী থেকে এলাম নানা প্রয়োজনে। আগামী বৃহস্পতিবারে ফিরে যাবার কথা ছিল, কিন্তু শুক্রবারেই যাবো।

এত কাছে থেকেও আপনাদের সঙ্গে দেখা হয় না। এ বড় দুঃখের কথা। বোধ হয় এই ভাদ্রের শেষের দিকেই সকলে কলকাতায় আসবো। আশ্বিন মাসটা কাটিয়ে আবার কার্তিক মাসে বাড়ী যাবো।

আমি ভাল নই। এ দেহটা সত্যিই ভাঙলো—একটা না একটা লেগে আছেই। কতদিন যে এইভাবে কাটবে প্রতিদিন তার মনে মনে হিসেব করি। আশা আছে দীর্ঘদিন নয়। বৈরাগীর জীবন যত শীঘ্র যায় ততই মঙ্গল। প্রার্থনা করি আপনি সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করুন। ১৫ই ভাদ্র ১৩৪৪। শরৎদা

[সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়কে[১] লেখা]

সামতাবেড়, পাণিত্রাস পোষ্ট

জেলা হাবড়া

২১.১০.২৬

পরম কল্যাণবরেষু,

সুধা, তোমার চিঠি পেয়ে বড় খুসি হোলাম। তোমার অসুখ বোধ হয় নানাবিধ চিন্তা ও মানসিক অশান্তির জন্যই। দয়া করে ৩০ বছরেই আমাদের ছাড়িয়ে বুড়ো হয়ো না। এইটুকু কোরো। নইলে আমরা আর মুখ দেখাতে পারবো না। আমার বিজয়ার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো।

শরৎদা

১। ইনি শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ পুস্তকের প্রকাশক "গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স" নামক প্রতিষ্ঠানের এবং ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকার অন্যতম সত্বাধিকারী। সুধাংশুবাবু এক সময় ভারতবর্ষ পত্রিকার অন্যতম সম্পাদকও ছিলেন। সুধাংশুবাবু তাঁর অগ্রজ শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় শরৎচন্দ্রেরও বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন।

[শ্রীতুলসীদাস চট্টোপাধ্যায়কে[১] লেখা]

তুলু, দুটি ছেলে মুখুয্যেদের বাড়ীতে পড়তে যায়[২], একটির হ'ল নেমন্তন্ন আর অন্যটি গেল বাদ[৩]। আমার ত খাবার নেমতন্ন হয়েছে। আমি না হয় যাব না। তার বদলে আমাদের নকুলকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এ আমার representative. ইতি—২০শে মাঘ ১৩৩০

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১। তুলসীবাবু হলেন শরৎচন্দ্রের দিদির ছোট জায়ের ভাই। তুলসীবাবু এই সময় তাঁর দিদির বাড়ীতে থেকে কলকাতায় চাকরী করতেন।

২। শরৎচন্দ্রের দিদির মেজ দেওর পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায় স্থানীয় ওড়কুলি এম, ই, স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি গ্রামের ও আশপাশের গ্রামের কয়েকটি ছাত্রকে সকাল সন্ধ্যায় বাড়ীতে বিনা পারিশ্রমিকে পড়াতেন। এই হিসাবে শরৎচন্দ্রের প্রতিবেশী দুটি ছেলেও পাঁচকড়িবাবুর কাছে পড়তে যেত।

৩। তুলসীবাবু একবার মানত হিসাবে তাঁর দিদির বাড়ীতে ৪ বছর সরস্বতী পূজা করেছিলেন। পূজায় তিনি লোকজন খাওয়াতেন। পাঁচকড়িবাবুর কাছে যে সব ছেলে পড়তে যেত তুলসীবাবু তাদেরও নিমন্ত্রণ করতেন। শরৎচন্দ্রের প্রতিবেশী যে দুটি ছেলে পাঁচকড়িবাবুর কাছে পড়ত, তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল নকুল। তুলসীবাবু এক বছর পাঁচকড়িবাবুর সকল ছাত্রকে নিমন্ত্রণ করলেও, কি ভাবে কেবল নকুলকে নিমন্ত্রণ করতে ভুলে যান। বালক নকুল নিমন্ত্রণ না পেয়ে খুবই দুঃখিত হয়। শরৎচন্দ্র নকুলের দুঃখের কথা শুনতে পেয়ে তুলসীবাবুকে এই চিঠিখানি লেখেন। চিঠি পাওয়ার পরই তুলসীবাবু শরৎচন্দ্রের কাছে ছুটে যান এবং নিজের ভুল স্বীকার করে নকুলকে পুনরায় নিমন্ত্রণ করেন। শরৎচন্দ্র সামান্য একটি বালকের দুঃখকেও যে কিরূপ হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন, এই ক্ষুদ্র চিঠিখানি তারই নিদর্শন।

শ্রীঅমল হোমকে লেখা]

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট

জেলা হাবড়া। ২৪-২-২৭

অমল,

তোমার চিঠির জবাব দিতে পারি নি, অথবা এই মনে ক'রে দিই নি যে, দেখা হ'লে সমস্ত কথা জানাবো। তোমার "অতি-আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্য"[১] আমি সেই দিনই আগাগোড়া পড়ে ফেলেছিলাম। তোমার বক্তব্য বিষয়ের মূল বস্তুটি আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। দু-একটা কথা হয়ত না বল্‌লেই হ'ত; তবে কেউ না বললেই বা বলা হয় কিরূপে? একটু দীর্ঘ হয়ে গেছে। আর একটু ছোট হ'লে একটা সুবিধে এই হ'ত যে, কোনো ব্যক্তির সম্বন্ধেই একবারের বেশী বার বলবার স্থান থাকত না। তীক্ষ্ণতা একটু কম হ'ত।

কিন্তু আমি বুড়ো মানুষ, আমাকে এর মধ্যে টেনে না আনলে ব্যক্তিগতভাবে আমি খুশী হ'তাম। যদি বল, 'আপনাকে আনলাম কি ক'রে?' তার উত্তরে আমি বিষ্ণু শর্ম্মার কৃষক ও শৃগালের গল্প উল্লেখ করতে পারি। শৃগাল বলেছিল—'ভাই, তুমি মুখে যেমন চুপ করেছিলে, তেম্‌নি আঙুলটিও যদি না আমার দিকে নির্দ্দেশ ক'রে রাখতে! ভাগ্যি, শিকারীরা তোমার আঙুলের দিকে নজর করে নি।'

তাই না অমল? "গোর্কি, শেখব, শরৎচন্দ্র কি,—" তার পরে আর সমস্ত প্রবন্ধের ভেতর শরৎচন্দ্রের নামগন্ধ নেই! রবিবাবুর নানাবিধ উদাহরণ তোলবার পরে যদি অন্ততঃ, আমার ওই রকম দু-একটা গল্প, যেমন "রামের সুমতি," "বিন্দুর ছেলে" প্রভৃতি,—অর্থাৎ দুর্নীতি বা অশ্লীলতা

১। ১৩৩৩ সালের মাঘ-সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত।

দোষ যাতে নেই,—ইঙ্গিতেও তুমি তা উল্লেখ করতে ত এটা বোঝা যেত, তুমি ঠিক এঁদের মধ্যে আমাকে ঠাঁই দিতে চাও নি।

তোমার মুখ থেকে যদি না আমি নিজে আমার সাহিত্যের সম্বন্ধে তোমার মতামত বহু বার শুনে আসতাম, তবে অনেকের মতো আমারও মনে হ'ত, তুমি ইঙ্গিতে এঁদের সকলের আগে আমাকেই দাঁড় করিয়েছ। অথচ, তুমি তা করো নি এবং করবার সঙ্কল্পও ছিল না তোমার।

যাই হোক, তোমার রচনা প্রভৃতি অতি চমৎকার হয়েছে। আমার আশীর্ব্বাদ জেনো। তোমাদের—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩০-১২-২৭

পরম কল্যাণীয়েষু,

অমল, তোমার বিয়েতে থাকতে পেরে ভারী খুশী হয়ে এসেছি। তুমি জান খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে আমার একটু বাছবিচার আছে, কিন্তু সেদিনের ঐ বিরাট পংক্তিভোজনেও ভারি তৃপ্তি ক'রে খেয়েছি। নির্ম্মল আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে খাওয়ালেন। আর এক পাশে ছিলেন তোমাদের জে সি মুখার্জি। ভারী অমায়িক লোকটি।

সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে তোমার ও নববধূর শুভ কামনা করি। আমার সামান্য স্নেহোপহার বৌমার হাতেই দেবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ভীড় ঠেলে তোমাদের কাছে ভিড়তেই পারলাম না। তাঁকে বোলো।

আশীর্বাদক

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুনশ্চ—অনেক দিন পরে সেদিন বিবাহসভায় রবীন্দ্রনাথকে দেখলাম। কি আশ্চর্য্য সুন্দর,—চোখ ফেরানো যায় না। বয়স যত বাড়ছে রূপ

যেন তত ফেটে পড়ছে। না, রূপ নয়—সৌন্দর্য্য। জগতে এত বড় বিস্ময় জানি না। শ।

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাবড়া

৮ই অগ্রাণ, '৩৮ [নবেম্বর, ১৯৩১]

ভাই অমল,

এই সঙ্গে লেখাটা[১] পাঠালাম। দেখতেই পাবে কারুকার্য্যের ছটায় অভিভূত করবার চেষ্টামাত্র করি নি; কারণ সেটা অসম্ভব।

তবে, তোমার নিজের দায়িত্বে কিছু ক'রে কাজ নেই। যাঁরা কমিটিতে আছেন, তাঁদের সকলের মত নাও। বড় অসুস্থ, তাই যেতে পারলাম না।

১। ১৩৩৮ সালের পৌষ মাসে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব "রবীন্দ্র-জয়ন্তী" উপলক্ষে রচিত মানপত্র। লেখাটি এই—

কবিগুরু,

তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।

তোমার সপ্ততিতম বর্ষশেষে একান্ত মনে প্রার্থনা করি জীবন-বিধাতা তোমাকে শতায়ু দান করুন; আজিকার এই জয়ন্তী উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হউক।

বাণীর দেউল আজি গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত না সেবক ইহার নির্মাণকল্পে দ্রব্য সম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ববর্তী সেই সকল সাহিত্যাচার্যগণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয় চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃত-কৃতার্থ হইয়াছি।

হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।

একটা কথা তোমাকে বার বার জানিয়েছিলাম যে, আমি এ-কাজের উপযুক্ত নই। কিন্তু তুমি ত কিছুতেই শুনলে না! তোমার—শরৎদা

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাবড়া
২৮শে পৌষ, ১৩৩৮ [জানুয়ারি, ১৯৩২]

পরম কল্যাণীয়েষু,

অমল, ফিরে এসে অবধি ভাবছি তোমাকে লিখব কিন্তু শরীরে দেয় নি। আমি চিরকাল ঘুমকাতুরে মানুষ, কিন্তু কি যে হয়েছে জানি নে,—আমার ঘুম যেন কোথায় পালিয়েছে। শরীরে এমন অস্বস্তি কখনো বোধ করি নি। পায়ের একটা পুরোনো ব্যথাও যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

সত্যি অমল, আমি যে কতখানি খুশী হয়ে এসেছি। সে তোমরা (না তুমি ?) টাউন হলে সভাপতির আসনে আমাকে টেনে বসালে[১], আমার গলায় মালা দিলে ব'লে নয়,—আমার লেখা মানপত্র কবির হাতে দিলে ব'লেও নয়—যে ভাবে এই বিরাট ব্যাপারটি সম্পন্ন হ'ল, এ অনুষ্ঠানটিকে যে নিষ্ঠায়, শ্রমে ও শ্রদ্ধায় সার্থক ক'রে তুললে,—তাতেই আমার আনন্দ, অকপট আনন্দ। কবির সম্বন্ধে আমি এখানে ওখানে কখনো কখনো মন্দ কথা বলেছি রাগের মাথায়, এ যেমন সত্যি—এও তেম্‌নি সত্যি যে, আমার চাইতে তাঁর বড় ভক্ত কেউ নেই,—আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশী মানে নি গুরু ব'লে,—আমার চাইতে কেউ বেশী

হে সার্বভৌম কবি, এই শুভ দিনে তোমাকে শান্তমনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি নতশিরে বারম্বার নমস্কার করি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১১ই পৌষ ১৩৩৮।

১। রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনার জন্য যে সম্মেলন হয়, সে সভার অধিনায়ক ছিলেন শরৎচন্দ্র।

মক্‌সো করে নি তাঁর লেখা। তাঁর কবিতার কথা বলতে পারবো না, কিন্তু আমার চাইতে বেশী বার কেউ পড়ে নি তাঁর উপন্যাস,—তাঁর চোখের বালি, তাঁর গোরা, তাঁর গল্পগুচ্ছ। আজকের দিনে যে এত লোক আমার লেখা প'ড়ে ভাল বলে, সে তাঁরি জন্য। এ সত্য, পরম সত্য আমি জানি। আর কেউ বললে কি না-বললে, মানলে কি না-মানলে তাতে কিছু এসে যায় না। তাই আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে যোগ দিয়েছি এই জয়ন্তীতে, না দিয়ে পারি নি। মস্ত বড় কাজ করেছ তুমি। প্রাণ ভ'রে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি।

শুনেছি তুমি এই জয়ন্তী ক'রে কলকাতায় বাড়ী তুল্‌ছ, গাড়ী হাঁকাচ্ছ! তোমার আমার বন্ধুরাই এ কথা পরম উৎসাহে প্রচার করছেন। জয়ন্তীর গোড়ায় এও শুনেছি স্বয়ং কবি তোমাকে খাড়া করেছেন, তাঁর শিখণ্ডী মাত্র তুমি—পেছনে থেকে তিনিই তোমাকে সব করাচ্ছেন! এ যে বাংলাদেশ অমল। 'সোনার বাংলা!' তবু বলতে হবে—'আমি তোমায় ভালবাসি!'

মনে কোনো ক্ষোভ রেখো না—যে যা বলে বলুক। আমি জানি তোমার বাড়ী হয় নি, গাড়ীও হয় নি—যে গাড়ী চড়ে বেড়াও সে বুঝি কর্পোরেশনের। বাস্, ঐ পর্য্যন্ত। তা না হোক্—তোমার ভাল হবে। দেশের মুখ রেখেছ তুমি। তোমাকে সমস্ত অন্তর থেকে আবার আশীর্ব্বাদ জানাই। তোমার—শরৎদা

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট, হাবড়া

১০ই মাঘ, '৩৮ [জানুয়ারী, ১৯৩২]

অমল,

তোমার চিঠি পেয়ে ভারী খুশী হলাম। রাতদিন একটা কেদারায় কাৎ হয়ে পড়ে আছি আমার সেই বারান্দায়, আর ঢেউ গুন্‌ছি। তুমি

এলে জমবে ভাল। মুখোমুখি ব'সে অনেক দিন গল্প করি নি তোমার সঙ্গে। দেখ, আড্ডা জিনিসটা উঠে যেতে বসেছে—দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু এ যে কত বড় অবনতি, তা যদি কেউ জানত! মনে পড়ে দ্বিজেন মৈত্রের সেই হাসপাতালের ছাদে গঙ্গার আলো হাওয়ায় তোমাদের সেই আড্ডা—আর শিবপুরে তাঁর ভাই সুরেন মৈত্রের ওখানে, সেও ঐ গঙ্গার ধারে। মনে পড়ে, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের সেই ন্যাড়া ছাদে আমাদের যমুনা আপিসের আড্ডা। ফণীর ওখানেই প্রথম দেখি তোমাকে। তুমি আর প্রভাত[১]। কি তার্কিকই না ছিলে তোমরা দুটি বন্ধু। আর কি পাকা! কতই বা তখন বয়স তোমাদের। সমানে তাল ঠুকে গিয়েছ আমাদের সঙ্গে। তারপর তোমাদের সেই ভারতীর আড্ডা। তেমনটি আর হবে না। আচ্ছা, শান্তিনিকেতনে কবির আড্ডাটা কেমনতরো হয় বলো দিকি। কিন্তু সে আড্ডায় হয়তো তিনিই শুধু কইবেন কথা—অন্যে রবে নিরুত্তর। মনোপলীতে আড্ডা জমে না—শুধু সলিলোকীতে যেমন জমে না নাটক। ইতি—

আঃ শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বেহালা, ১৮ই ভাদ্র, ১৩৩৯

কল্যাণীয়েষু,

অমল, তুমি মণিকে[২] ফোন ক'রে ছবি তোলবার সময়টা ঠিক ক'রে নিও। Bourne & Sheperd-এর টাকাটা মণিই দেবে, তোমাদের কাগজের লাগবে না।

১। প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

২। বেহালার শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়।

সকালের দিকেই আমার সুবিধে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে গড়গড়ার পর একটু গড়াগড়ি না দিলে বুড়ো মানুষ বাঁচব কি ক'রে? আমার জয়ন্তী করতে ব'সে নিশ্চয়ই তোমরা আমাকে মারবার সঙ্কল্প কর নি! রবিবাবু যে মারা পড়েন নি, সে নেহাৎ তাঁর পুণ্যে। বাস্ রে বুড়োকে নিয়ে তোমরা কি টানা হ্যাঁচড়াটাই না করেছিলে। পারেনও বটে উনি। কিন্তু আমি রবিঠাকুর নই, আমি—

শরৎ চাটুজ্যে।

৫ই আশ্বিন, ১৩৩৯

অমল, উদ্‌যোগপর্ব্বে উৎসাহ ক'রে তুমি যে সভাপর্ব্বের পূর্ব্বেই ব্যাধিশরশয্যা গ্রহণ করলে, এতে আর যেই দুঃখ করুক, তোমার দুঃখের কিছু নেই। তুমি যে সেদিন টাউন হলে থাকতে পার নি, তাতে তোমার সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছ। সেদিন যারা ভণ্ডুল করেছিল রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সময়েও তারাই ছিল। তারা সাহিত্যিক। তাদের আমি চিনি—তুমিও চেন। তারা সে-বার পারে নি—এবার পেরেছে। আশ্চর্য্য হই নি। রবিবাবুর অমল হোম ছিল, আমার নেই কিম্বা থেকেও ছিল না।[১] ইতি—শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১। ১৩৩৯ সালের ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে টাউন হলের সংবর্ধনা-সভা কয়েকজনের গণ্ডগোলে "ভণ্ডুল" হয়ে যাবার পর শরৎচন্দ্র এই চিঠিখানি লেখেন।

[হরিদাস শাস্ত্রীকে লেখা]

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট

জেলা—হাবড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

হরিদাস, তোমার দুখানি চিঠিই আমি পেয়েছি। তোমার দেওয়া ওষুধও অনেক বিলম্বে ভাঙা-চোরা অবস্থায় আসে, দিন দুই ব্যবহারও করি কিন্তু মনে হ'ল লোকে ঘাঁটাঘাঁটি করেছে, তাই আর খেলাম না। ওষুধ পাই নি, পেলাম তোমার সত্যকার শ্রদ্ধা এবং স্নেহ। এখন অনেকটা ভাল আছি। কিন্তু মানসিক অশান্তি না হোক্‌, অস্থিরতার আর সীমা নেই। এখন অনুশোচনা হয়, সেই আমার বর্ম্মার ছোট্ট চাকরিটুকুর জন্যে। মনে হয়, এ জীবনে ঐ চাকরী ছাড়া আর যদি কিছুই না করতাম।

দেনা-পাওনা যদি তুমি অনুবাদ কর ত তোমার ইচ্ছে এবং বুদ্ধিমতই ক'রো। বাঙলার হিন্দী অনুবাদ হওয়াই এক বিড়ম্বনা, তার পরে অক্ষর অক্ষর ছত্র ছত্র translate করবার ব্যর্থ চেষ্টায় যদি ভাবটুকুও যায় ত বাস্তবিকই খুব দুঃখের কথা। তবে এ দুঃখ থেকে বাঁচবার পথ নেই যখনই আমি হিন্দীতে অনুবাদ করার অনুমতি দিয়েছি।

তুমি বাঙলা ত খুব ভালই বোঝ, কিন্তু হিন্দী জানো কেমন? বস্তুতঃ, অত বড় বইটার সমস্ত হিন্দী করার মত শক্ত ব্যাপার আমি ত ভাবতেই পারিনে। যদি এতবড় অধ্যবসায় তোমার থাকে ত মাঝে

মাঝে কেদারবাবুকে দেখিয়ো। তিনি চিন্ মুল্লুক ঘুরে এসেছেন, তাঁর অভিজ্ঞতা আছে।

এবার একটু জলটল প'ড়ে ঠাণ্ডা হ'লেই কাশী যাবো। মাস ২।৩ থাক্‌বোই। তাতে প্রাণ থাকে আর যায়। কেদারবাবু কেমন আছেন? যদি সাক্ষাৎ হয় আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানিয়ো।

তোমার মন ত নানা কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে আছে—শান্তি স্বস্তি পাবার উপায়ও বড় হাতে নেই, এ অবস্থায় অনুবাদ করার মত অকেজো কাজে আবদ্ধ করলেও সময় কাটে। আর সংসারে কাজের মত কাজই বা কাকে বলে তাও বোঝা ভার।

আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো এবং আমি চিঠির উত্তর সকল সময় দিতে পারি বা না-পারি মাঝে মাঝে তোমার শারীরিক কুশল সম্বাদ দিয়ো। দাদা। ইতি ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

তুমি অনুবাদ সুরু ক'রে দাও। আমার সম্পূর্ণ অনুমোদন রইল।

* * *

[শ্রীনরেন্দ্র দেবকে লেখা]

সামতাবেড়, পাণিত্রাস পোঃ
জেলা—হাবড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

নরেন, কাল ডাকে তোমার খেলার পুতুল এসে পৌঁছেছে, কাল রাত্রেই ৭০।৮০ পাতা পড়েচি এবং বাকিটুকু আজ পড়ে ফেলবো স্থির করে রেখেচি, যদিনা আজ যাঁরা উলুবেড়েয় মামলা[1] করতে গেছেন তাঁরা এসে তাঁদের কৃতিত্বের বিস্তারিত বিবরণ দিতে বারোটা বাজান।

দিন কয়েকের মধ্যেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে। কারণ তোমার ওখানেই যাব। রাস্তাটা একটু শুখুক—পালকি যেন চলতে পারে।

এই বইটার সম্বন্ধে যা আমার সত্যিকার অভিমত তাই নিয়ে একটু আলোচনা করব ইচ্ছে আছে, তবে সে মতামতের মূল্য আজকালকার দিনে তোমরা কি দিতে পারবে? আমি তো প্রায় সাহিত্যিক দরবারে বাতিল হয়ে যাবার মতো হয়ে পড়েচি, লিখতে তো পারিই নে, লেখাও খারাপ হয়ে গেছে, নিজেও বুঝতে পারচি। তবে তোমরা এখনো ভালবাসো এই যা সম্বল। বুড়ো বয়সে সব শক্তিই ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। এ অস্বাভাবিকও নয়, পরিতাপের বস্তুও নয়। আমার বিজয়ার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। আজ রাধুকে[2] একখানা চিঠি

(১) এই গ্রন্থের ২৪৬ পৃষ্ঠায় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিটির মধ্যে এই মামলার কথার বিস্তৃত উল্লেখ আছে।

(২) রাধারাণী দেবী। ইনি নরেন্দ্র দেবের জ্যাঠামশায়ের শ্যালক-কন্যা। পরে নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে এঁর বিয়ে হয়।

লিখলাম। সে আমার ওপর ভারি রাগ করে আছে, এবার যেদিন তোমাদের বাড়ী যাবো তার সঙ্গে দেখা করে আসবো। নইলে সে হয়ত রেগেই থাকবে, অভিমান পড়বে না। ইতি ২রা কার্ত্তিক ৩৬। বড়দা

সামতাবেড়, পানিত্রাস
হাবড়া

কল্যাণীয়েষু,

নরেন, তোমার চিঠি এবং 'লালু'র[১] প্রুফ পেয়েছি। প্রুফের উপরে লেখা আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত বানানের নিয়ম অনুযায়ী সম্পাদক কর্তৃক সংশোধিত।

কয়েকটা বানান সম্বন্ধে আমার আপত্তি আছে—সে বানান আমি নিতে পারবো না। যাই হোক সোমবারে যাচ্ছি। জন্মাষ্টমীর পরের দিন। সাক্ষাতে আলোচনা হবে। শরৎ

একদিন একটা গল্প লিখেচি। লালুর নয়—নিজের,[২] কিন্তু মোটেই ভাল হ'ল না। নইলে তোমার পাঠশালার জন্য দিতে পারতাম।

রাধু একটু ভালো আছে শুনে খুশি হলাম। তাকে আমার আশীর্ব্বাদ দিও। ইতি ১১ই ভাদ্র ১৩৪৪ শরৎদা

---

(১) "লালু" শরৎচন্দ্রের লেখা একটি গল্প। শরৎচন্দ্রের "ছেলেবেলার গল্প" নামক পুস্তকে এই গল্পটি স্থান পেয়েছে। গল্পটি প্রথমে নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী সম্পাদিত 'সোনার কাঠি' নামক ছোটদের একটি বার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়।

(২) এই গল্পটির নাম "বছর পঞ্চাশ পূর্ব্বের একটা দিনের কাহিনী"। এই গল্পটিও শরৎচন্দ্রের "ছেলেবেলার গল্প" নামক পুস্তকের মধ্যে রয়েছে। গল্পটি নরেন্দ্র দেব সম্পাদিত "পাঠশালা" পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল।

[শ্রীরাধারাণী দেবীকে লেখা]

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধা, তোমার চিঠি পেলাম, এর আগের চিঠির জবাব দিইনি— হবেও না। এ বয়সে সব কথা মনে রাখাই কি সম্ভব? তা ছাড়া জানোই ত আমার কুড়েমির সীমা নেই। দিই দিই করেই মাসখানেক কেটে যায়, তারপরে সমস্ত ভুলে যাই। কিছু মনে কোরো না ভাই। যে কটাদিন আরও বেঁচে আছি, জবাব পাও বা না পাও মাঝে মাঝে সময় পেলে নিজের খবরটা দিয়ো।

শ্রীকান্ত শেষ পর্ব্বের 'রাজলক্ষ্মী' তোমার মনোমত হয়নি। সেই কথাটা স্পষ্ট করে লিখে জানিয়েছ বলেই রাগ কোরব এমনি বদ্‌মেজাজি আমি?—আমার মত শান্ত-শিষ্ট নিরীহ ব্যক্তি সহজে পাবে না।

তুমি যা লিখেছিলে আমি তখনই চিন্তা করে দেখেছিলাম। তবুও নিজের ভুলটা ঠিক ধরতে পারিনি। মতভেদ ত থাকবেই।

'শেষপ্রশ্নে' শেষ পর্য্যন্ত হয়ত অনেককেই ব্যথা দেবো, তবুও যা ঠিক বলে মনে করি তা বলা দরকার। তার পরের কথা পরে।

ষোড়শী বইটা একবার পোড়ো। বোধ হয় তোমার মন্দ লাগবে না। আর অভিনয় দেখবার যদি সময় পাও, সত্যিই খুসি হবে। শিশির[১] কি শেখানোই শিখিয়েছে। আমি একটি দিন মাত্র দেখেচি, সেদিন আবার ইনফ্লুয়েঞ্জার মত হয়ে শরীরটা পীড়িত হয়ে ছিল। তবু চমৎকার লেগেছিল।

(১) শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী।

কাশীর বুড়ীমা[১] আমার মায়ের মত, দেখা করতে ভারি ইচ্ছে করে। কিন্তু এদিকে আমিও তাঁর চেয়ে কম বুড়ো নই। আর জলে জলে এ অঞ্চলের কাদার ভিতরের দুর্গম রাস্তাটি মনে হলে আর পা বাড়াবার ভরসা থাকে না। একটুখানি রাস্তাঘাট শুখলেই বোধ হয় যাবো। কিন্তু তোমাদের মেয়েদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ত সোজা নয়। যার বয়স কম তার সঙ্গেও যেমন, যাঁর বয়স বেশি তাঁর সঙ্গেও তেমনি, এই কথাটা মনে হলেই মন যেন ছোট হয়ে আসে। দুর্ভাগ্য। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি—২৩শে ভাদ্র ১৩৩৪

তোমাদের বড়দা

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধে, তোমার চিঠি এবং চিঠির মারফৎ তোমার বিজয়ার প্রণাম এসে যথাস্থানে পৌঁছেচে। ষোড়শী দেখে খুসি হয়েছ শুনে আমিও খুসি হোলাম। বাস্তবিক কি চমৎকার অভিনয় করে শিশির। আরও চমৎকার তার শেখানোর পদ্ধতি।···অদ্ভুত ধৈর্য্যের সঙ্গে শিশির শেষের লক্ষ্যটায় লেগে থাকতে পারে। তারই বাহাদুরি।

আমার লেখা "সাহিত্যের রীতিনীতি" পড়ে তুমি ক্ষুণ্ণ হয়েছো লিখেচো। তোমার মনে হয়েচে যে রবিবাবুকে আমি অযথা কটূক্তি করেছি। কিন্তু কোথায় যে শ্লেষ অথবা বিদ্রূপ আছে লেখাটা আরও

১। ২২০ পৃষ্ঠায় ১নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

একবার পড়েও ত আমি খুঁজে পেলাম না। তাঁকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করি—আমার গুরুস্থানীয় তিনি, এ ত তুমি জানোই। তবে হয়ত লেখার দোষে যা বলতে চেয়েছি বলতে পারিনি—আর এক রকমের অর্থ হয়ে গেছে। দোষ যদি কিছু হয়েও থাকে সে আমার অক্ষমতার, আমার অন্তরের নয়।

তোমরা একটা কথা তেমন জানো না যে আমার ভাষার ওপরে অধিকার সত্যিই কম। বিনয়ের জন্যে বলছিনে, তোমার মত আত্মীয়ার কাছে মিছে বিনয় করে লাভ কি বলত? তবুও বলচি এ কথা আমার যথার্থ ই মনের কথা। ভাষার ওপরে দখল এতই অল্প যে দু ছত্র কবিতা পর্য্যন্ত মেলাতে পারিনে,—কথা খুঁজে পাইনে। তাই যে কেউ যেমন তেমন কবিতা লিখলেও বিস্মিত হয়ে যাই। এই কারণেই বলতে চাইলাম এক, আর হয়ে গেল অন্য। তোমরা দুঃখিত হয়ে ভেবে নিলে—দাদা বুড়ো মানুষ হয়েও আর এক বুড়োকে আক্রমণ করেছে।

সে যাই হোক, নবীন লেখকদের প্রতি আমার আন্তরিক স্নেহ এবং টান আছে। তাদের ভুলচুক হয় জানি, কিন্তু তাই বলে তাদের লোকসমাজে অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করলে আমার অত্যন্ত ব্যথা লাগে। তা ছাড়া কত বড় অন্যায় অপবাদ তাদের দেওয়া হয়, যখন ইঙ্গিত করা হয় এরা গরীব বলেই এই সব নোঙরা ব্যাপার ঘাঁটাঘাঁটি করে অর্থ রোজগার করতে চায়। আমি ভাল করেই জানি বিরুদ্ধদলের লোকেরা এই রকমই কথা বলে বেড়ায়।

কোনদিন যদি তোমার বড়দাকে ভাল করে জানতে পারো ত বুঝবে —বিদ্বেষ বলে জিনিসটা তার মধ্যে নেই বললেও অতিশয়োক্তি হবে না। একটা কথা তোমাকে জানাই, কারুকে বোলো না। পথের দাবী যখন বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল তখন রবিবাবুকে গিয়ে বলি যে আপনি যদি একটা

প্রতিবাদ করেন ত একটা কাজ হয় যে পৃথিবীর লোকে জানতে পারে যে গভর্ণমেণ্ট কি রকম সাহিত্যের প্রতি অবিচার করেছে। অবশ্য বই আমার সঞ্জীবিত হবে না। ইংরাজ সে পাত্রই নয়। তবু সংসারের লোকে খবরটা পাবে। তাঁকে বই দিয়ে আসি। তিনি জবাবে আমাকে লেখেন—"পৃথিবী ঘুরে ঘুরে দেখলাম ইংরাজ রাজশক্তির মত সহিষ্ণু এবং ক্ষমাশীল রাজশক্তি আর নেই। তোমার বই পড়লে পাঠকের মন ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। তোমার বই চাপা দিয়ে তোমাকে কিছু না বলা, তোমাকে প্রায় ক্ষমা করা। এই ক্ষমার উপর নির্ভর করে গভর্ণমেণ্টকে যা'তা' নিন্দাবাদ করা সাহসের বিড়ম্বনা।"[১]

১। এখানে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত চিঠিটিই উদ্ধৃত করা গেল—

কল্যাণীয়েষু—তোমার "পথের দাবী" পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। লেখকের কর্তব্যের হিসাবে সেটা দোষের না হতে পারে—কেন না লেখক যদি ইংরেজরাজকে গর্হণীয় মনে করেন তাহলে চুপ করে থাকতে পারেন না কিন্তু চুপ করে না থাকার যে বিপদ আছে, সেটুকু স্বীকার করাই চাই। ইংরজরাজ ক্ষমা করবেন এই জোরের উপরেই ইংরেজরাজকে আমরা নিন্দা করব সেটাতে পৌরুষ নেই। আমি নানা দেশ ঘুরে এলাম—আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েচে তাতে এই দেখলেম—একমাত্র ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোন গবর্ণমেণ্টই এতটা ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করে না। নিজের জোরে নয় পরন্তু সেই পরের সহিষ্ণুতার জোরেই যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাতে চাই তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনা মাত্র—তাতে ইংরেজ রাজের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়, নিজের প্রতি নয়। রাজশক্তির আছে গায়ের জোর, তার বিরুদ্ধে কর্তব্যের খাতিরে যদি দাঁড়াতেই হয়, তাহলে অপর পক্ষে থাকা উচিত চারিত্রিক জোর—অর্থাৎ আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার জোর। কিন্তু আমরা সেই চারিত্রিক জোরটাই ইংরেজরাজের কাছেই দাবী করি নিজের কাছে নয় তাতে প্রমাণ হয় যে, মুখে যাই বলি নিজের

ভাবতে পারো, বিনা অপরাধে কেউ কাউকে এত বড় কটূক্তি করতে পারে? এ চিঠি তিনি ছাপাবার জন্যেই দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি ছাপাতে পারিনে এই জন্যে যে কবির এত বড় সার্টিফিকেট তখুনি স্টেট্‌স-ম্যান প্রভৃতি ইংরাজি কাগজওয়ালারা পৃথিবীময় তার করে দেবে। এবং এই যে আমাদের দেশের ছেলেদের বিনা-বিচারে জেলে বন্ধ করে রেখেচে এবং এই নিয়ে যত আন্দোলন হচ্ছে সমস্ত নিষ্ফল হয়ে যাবে। ঠিক বলতে

অগোচরে ইংরেজকে আমরা পূজা করি—ইংরেজকে গাল দিয়ে কোন শাস্তি প্রত্যাশা না করার দ্বারাই সেই পূজার অনুষ্ঠান। শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখলে তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপা দেওয়া প্রায় ক্ষমা। অন্য কোনো প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বিদেশী রাজার দ্বারা এটি হত না। আমরা রাজা হলে যে হতই না সে আমাদের জমিদারের ও ভারতীয় রাজন্যের বহুবিধ ব্যবহারে প্রত্যহই দেখতে পাই। কিন্তু তাই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে? আমি তা বলিনে—শাস্তিকে স্বীকার করেই কলম চলবে। যে কোন দেশেই রাজশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটেচে সেখানে এমনিই ঘটেচে—রাজবিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদে থাকতে পারে না এই কথাটা নিঃসন্দেহ জেনেই ঘটেচে।

তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথা লিখতে তাহলে তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হত—কিন্তু তোমার মত লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে। দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই—অপরিণত বয়সের বালক বালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্য্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে। এমন অবস্থায় ইংরেজ-রাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ করে না দিত তাহলে এই বোঝা যেত যে সাহিতে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তার নিরতিশয় অবজ্ঞা ও অজ্ঞতা শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। এই কারণেই সেই আঘাতের মূল্য,—আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলাপ করলে সেই আঘাতের মূল একেবারেই মাটি করে দেওয়া হয়। ইতি—২৭ মাঘ ১৩৩৩

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পারিনে হয়ত এই কথা আমার মনের মধ্যে অলক্ষ্যে ছিল যখন সাহিত্যের রীতিনীতি লিখি। তাতেই বোধ হয় কোথাও কোন যায়গায় একটু আধটু তীব্রতার ঝাঁঝ এসে গেছে। যাই হোক্ যা হয়ে গেছে তার আর উপায় কি ভাই? তুমি একটু সারলে কি? জ্বর সারলো? ইতি—১০ই অক্টোবর ১৯২৭

বড়দাদা

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া
১১।১১।২৯

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধু, তোমার চিঠি পেলাম। এর মধ্যে তুমি যে বিন্ধ্যাচলে[১] গিয়েছো তা ভাবিনি। বরঞ্চ আমি ভাবছিলাম সেদিন নরেনের ওখান থেকে ফিরে আসতে হ'ল সে ছিল না বলে—আর একদিন এরই মধ্যে গিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে তোমার ওখানে যাবো।

বিন্ধ্যাচলে আমাকে যেতে বলচো এ খবরে মন খুসিতে ভরে উঠলো। কিন্তু এখন আমার কোথাও যাবার একতিল সময় নেই। প্রথমতঃ পল্লী-গ্রামে বাস করতে আসার যথাসাধ্য পুরস্কার পাওয়া গেছে। স্থানীয় অতি ক্ষুদ্র জমিদারের উৎপীড়ন থেকে দরিদ্র প্রজাদের বাঁচাতে গিয়ে ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয়বিধ মামলাতেই জড়িয়ে গেছি। ঠিক আসামী হয়নি বটে, কিন্তু দিদির এক দেবরকে[২] মূল আসামী করার জন্যে আমার অশান্তিও কম হয়নি। লেখা-পড়া দুই-ই ঘোচবার যো হয়েচে।

১। এই সময় রাধারাণী দেবী তাঁর পিতার সহিত বিন্ধ্যাচলে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

২। শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর সেজ দেওর পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়।

দ্বিতীয়তঃ আগামী কংগ্রেসের ভারী গোলযোগ[১] বেধেছে। পরন্তু সুভাষ ধরেছিল যে দিন কতক কলকাতায় থেকে গণ্ডগোলটা যদি সম্ভব হয় মিটিয়ে দিতে। আমি মিটাতে না পারলে মিটবে না বলেই ওদের আশঙ্কা।

শরীরটার সম্বন্ধে ঠিক করেছি আর একটা কথাও বলব না। তুমি কেমন আছ? এইবারে পারো যদি ওটাকে আর একটু মজবুত করে ফিরে এসো।

মাঝে মাঝে ভাবি চোখ কান বুজে যদি একবার কোথাও নিরালায় পালাতে পারি তো বাঁচি। ছিলাম লেখাপড়া নিয়ে—এ আচ্ছা হাঙ্গামায় নিজেকে জড়িয়ে তুলেচি। মনের শান্তি ও দেহের স্বস্তি দুই নষ্ট হতে বসেছে। শুধু একটা বাঁচোয়া যে নিজের কাজের ফর্দ্দ এখনো খবরের কাগজে বার হতে পায় না। এটুকু কোনমতে সামলে যেতে পারচি এই সৌভাগ্য।

তুমি আমার সেবার ভার নিতে যে চেয়েচো সে কেবল তুমি আমাকে চেন না বলে। এ পৃথিবীতে কেউ পারে না। দিন দুই তিন এ কাজে নিযুক্ত হও যদি তো বলবে বড়দা গেলে বাঁচি। পরীক্ষা করে নিতে লোভ হয় বটে, কিন্তু যে স্নেহটুকু এখনও আছে, সে খাটুনিতে পড়লে তার লেশটুকুও আর থাকবে না। ৭।৮ বার চা'ই খাই—নিজে এতবার কি তৈরী করে দিতে পারবে? অন্য খাওয়া দাওয়ার বালাই বেশি নেই; কিন্তু এই বদ্ অভ্যাসটার জ্বালায় কারো বাড়ীতে কখনো থাকতে সাহস করি নে।

(১) এই সময়ে বাঙ্গলা কংগ্রেসে দু'টা দল দেখা দিয়েছিল। একদলের নেতা ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, আর অপর দলে ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

তোমরা কতদিন ও দেশে থাকবে? লাহোর[১] থেকে ডিসেম্বরের শেষে ফিরে আসবার সময়ে কি ওখানে একবার তোমাকে দেখে আসবার সুবিধে পাবো?

ছেলেবয়সে একবার একজনের[২] নিমন্ত্রণ পেয়ে কিছুদিন তাঁর অতিথি হয়েছিলাম—তোমার চিঠিটা পড়ার সময়ে বার বার সেই কথাই মনে হচ্ছিল। এক একটা কথা মানুষে কোনকালেই সম্পূর্ণ ভুলে যেতে পারে না—অথচ ভোলা ছাড়া আর কি?

যাক্ সে কথা। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো।

তোমার—বড়দা

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধু, চিঠির জবাব না দেওয়ায় লজ্জায় তোমাদের কাছে মুখ দেখানো আমার ভার হয়ে উঠেছে। রোজ ভাবি আজই চিঠি লিখবো, অথচ রোজই পড়ে থাকে। আর ক'টা দিনইবা বাঁচবো, দাদার এই মজ্জাগত ত্রুটিটুকু ক্ষমা করে নিয়েই মাঝে মাঝে তোমাদের কুশল সংবাদ দিও। খবর পেলে মনে মনে যে কি আনন্দ পাই সে তোমরা বুঝবে না। আর বুঝলেই বা কি মাপ আছে? মানুষের মন তো। তথ্খুনি ভেবে নেবে

১। লাহোরের প্রবাসী বাঙ্গালীগণ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে এক সাহিত্যসভায় যোগদান করবার জন্য শরৎচন্দ্র এই সময় লাহোর গিয়েছিলেন।

২। শরৎচন্দ্র যৌবন-প্রভাতে তাঁর জনৈকা সাহিত্যানুরাগিণীর আমন্ত্রণে কিছুদিন তাঁর অতিথি হয়েছিলেন।

দাদা বড় বলেই আমাকে অবহেলা করলেন, যাক্, আমিও আর চিঠিপত্র কিছুই লিখব না। এমনি করে এ জীবনে কত পরমাত্মীয়ই না পর হয়ে গেল।

অর্শ নিয়ে প্রায়ই ভুগি, মাঝে মাঝে ভালও থাকি। তখন এক আধবার কলকাতায় যাই। আর অসুস্থ বললেও সব সময়ে রেহাই পাইনে বলেও যেতে হয়। এমনি একটা দিনেই গিয়ে Presidency College এ দু'চারটে কথা[১] বলেছিলাম। তুমি বোধকরি খুসি হ'তে পারোনি, না?

যে বিশ্রী পথ, তাই কেউ আসবে বললে ভাবনা হয় এ রাস্তা পার হবে কি করে? তাছাড়া এখনকার তো কথাই নেই, কাদা এক হাঁটু পর্য্যন্ত না উঠলো তো আর পাড়াগাঁয়ের মর্য্যাদা রইলো কোথায়?

শীতের সময় একবার এসো। তখন কাদাও থাকবে না, মাঠের পথ পড়বে। বেশি হাঁটতে হবে না। পাঁচ ছ'দিন পরে ভাবচি নরেনদের ওখানে একবার যাবো, সেই সময়ে যদি সুযোগ মেলে তো তোমাকেও দেখে আসবো। কাল নরেনের খেলার পুতুল ডাকে এসে পৌঁছল। রাত্রেই ৭০।৮০ পাতা পড়েচি, আজ রাত্রেও পড়বো। সে বেশ লেখে। এমনি যদি কোথায় থামতে হয় এ কৌশলটাও জানতো। তোমার লেখা যেখানেই বার হোক আমার নজরে পড়ে। কারণ সব মাসিকপত্রগুলোই প্রায় বিনা পয়সায় পাই। রাধু, স্বাধীন অভিমতটা যেন কুসংস্কারে গিয়ে না দাঁড়ায়। তারও সীমানা আছে এবং আছে বলেই তার মূল্য।

এখন কেমন আছো? আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি

২রা কার্ত্তিক ১৩৩৬

বড়দা

১। ১৩৩৬ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে বঙ্কিম-শরৎ সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শরৎচন্দ্রের ৫৪তম জন্মবার্ষিকীতে অভিনন্দনের উত্তর।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধু, তোমার বইখানি[১] পাবার পর থেকে প্রায়ই ভাবতাম কবিতা নিয়ে কথা কইবার অধিকার ভগবান যদিবা নাই দিয়ে থাকেন, অন্ততঃ বইখানি পেয়েছি এবং আগাগোড়া পড়েছি এ খবরটাও তো দিতে পারি। তাই কেন না দিই? এমনি ভাবি আর দিন যায়। অবশেষে শিলঙ্[২] থেকে এলো চিঠি—এলো নিমন্ত্রণ। মনে মনে লজ্জার অবধি রইল না—স্থির হ'ল এবার আর দেরি নয়—জবাব একটা দেবই দেব। কিন্তু আবার ভাবি আর দিন যায়—এমনি করে ভাবতে ভাবতে আজ দুপুর রাত্রে আরাম-কেদারা ছেড়ে অকস্মাৎ উঠে বসেছি এবং কাগজ কলম খুঁজে বার করে নিয়ে নিদারুণ প্রতিজ্ঞা করেচি ওপরে যাবার আগে এ চিঠি শেষ কোরবই কোরব। কাল সকালেই যেন ডাকে দিতে পারি।

কিন্তু জানোই ত ভাই বিনয় নয়, সত্যিই কবিতার আমি কিছুই জানিনে। তাই কবিতা যে কেউ লেখে তার পানেই আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। নিজে না পারি দু'ছত্র মেলাতে, না পারি ভালো ভালো কথা খুঁজে বার করতে। একবার বহু চেষ্টায় 'হায়'-এর সঙ্গে 'জলাশয়' মিলিয়ে কবিতা লিখেছিলাম কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বললেন, ও হয়নি।

হয়নি ত বটেই, কিন্তু হয় যে কি কোরে সেও তো বুদ্ধির অতীত, সুতরাং আমার মত সুধীব্যক্তি যত্ন করে এ বই যদি পড়েও থাকেন তাতে তোমাদের মত কবিদের আনন্দ দূরে থাক সান্ত্বনাটাই বা কি?

১। "লীলাকমল" নামক কাব্যগ্রন্থ।

২। রাধারাণী দেবী এই সময় তাঁর পিতার সহিত শিলঙ্ বেড়াতে গিয়েছিলেন।

বুড়ি[১] ছেলেবেলায় কবিতা লিখতো, মন্দ নয়, সে এটা বোঝে; তাকে যদি পাঠাতে বৌধকরিবা—এমনতর অযোগ্যের হাতে তুলে দেওয়ার আক্ষেপ থেকে রক্ষা পেতে।

একটা ঘটনা মনে পড়ে। জলধর দাদার[২] 'অভাগী' বেরিয়েচে; আমাদের বাড়ীর ইনি[৩] পড়েন আর কাঁদেন। চোখমুখ ফুলে উঠলো, আমাকে কাছে পেয়ে ধিক্কার দিয়ে বললেন, কি যে ছাইপাঁশ তুমি লেখো,—এমনি একখানিও যদি লিখতে পারতে!

পারিনে তা মেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেম, ব্যাপারটা কি ওতে?

বললেন—ব্যাপার! এই ছাখো সতীত্বের তেজ!

দেখা গেল—অভাগী তখন কাশীতে। সেখানে দারোগা, কনেষ্টবল, বাড়ীওয়ালা, পাণ্ডা, সন্ন্যাসী সবাই একে একে ব্যর্থ চেষ্টা করে হার মেনেচে। অভাগী অলৌকিক উপায়ে উদ্ধার পেয়ে গেছে। কেউ তার কিছুই করতে পারেনি!

কেউ যে কিছুই করতে পারবেনা সে আমিও জানতাম, তবু তর্কে হারবার ভয়ে বোললাম, বইতো এখনো শেষ হয়নি, এরি মধ্যে অমন নিশ্চিন্ত হোয়োনা। এখনো কাশীর বাবা বিশ্বনাথ স্বয়ং বাকি। তিনি চেষ্টা করলে ঠেকানো শক্ত!

তখনকার মতো মান থাকলো বটে, কিন্তু পড়া সাঙ্গ হবার পরে যে তা আর থাকবেনা এও জানতাম। থাকেও নি!

সে যাক্, আমার মুখ থেকে 'লীলাকমলের' আলোচনা তোমার

১। নিরুপমা দেবী।
২। ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধর সেন।
৩। শরৎচন্দ্রের স্ত্রী শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

কাছেও হয়ত ঐ রকমই ঠেকবে। তাছাড়া বাইরে থেকে যে একটু শিখবো তারই কি যো আছে? কেউ বললেন, এমন বই আর হয়নি। এর ভাষা ভাব ছন্দ ছাপা ছবি—অতুলনীয়। নবশক্তি কাগজে আর এক বিশেষজ্ঞ—কে এক লীলাময়[1] লিখলেন, এমন বিশ্রী বই আর হয়নি। এর সব খারাপ। এমন কি যতীনের[2] ছবিটা পর্য্যন্ত তার কলঙ্ক। এবং তিনি হলে এর নাম রাখতেন 'সূর্য্যমুখী'। একটাও ছবি দিতেন না এবং বালির কাগজে ছেপে প্রকাশ করতেন।

এমনি সব সমালোচনার নমুনা! আমার নিজের কিন্তু সত্যিই খুব ভালো লেগেছে। প্রথম যেদিন তোমার বই এলো, বইয়ের মোড়ক খুলতেই মনে হয়েছিল যেন কোন এক শিক্ষিত, ভদ্র বড়লোকের ঘরে নিমন্ত্রণে এসেছি। ভিতরে ভোজের ব্যবস্থাটি যে খাসা ও পরিপাটি হবে একথা মন যেন আপনি আন্দাজ করে নিলে। তাই বটে। যেমন ভাষা তেমনি বাঁধুনি, তেমনি প্রকাশভঙ্গী। নিখুঁত বললেও অত্যুক্তি হয়না।

✓ তবু একটা কথা যেন মাঝে মাঝে ছুঁচের মত বেঁধে—সে এই যে, ভাবুকতায় এই কাব্যগ্রন্থখানির এত শোভা এত বর্ণচ্ছটা শব্দবিন্যাসের এমন মাধুর্য্য—কিন্তু কোথাও তাদের বনিয়াদ প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। হৃদয়ের সম্পর্কে এদের নিত্যতা নেই। ভালো ত তুমি কখনো কাউকে সত্যিই বাসোনি রাধু! তুমি বলবে—সবাই কি সত্যিই ভালবেসেছে, আর তারপরে কবিতা লিখেছে বড়দা? আমি তার জবাবে বোলবো—যদি না বেসে থাকে সে তার দুর্ভাগ্য! তার হৃদয়ের ব্যাকুলতা বা কামনাকে দোষী করা যায়না। শুধু দুঃখ করে এইটুকুই বলা যায়—

১। লীলাময় রায় (অন্নদাশঙ্কর রায়)।

২। চিত্রশিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন।

বেচারা সংসারে বঞ্চিত হয়েছে, মানুষ পায় নি,—সে ওর দোষ নয়—ভাগ্য।

কিন্তু তোমার ত' তা নয়। সেই লীলাময় লোকটা একটা কথা সত্যি বলেছে যে রাধারাণীর যোগ্য মানুষ দুনিয়ায় নেই, মানুষের প্রতি তার অত্যন্ত বিতৃষ্ণা। তাই "জীবনদেবতা"কে উৎসর্গ।

কিন্তু, ও জিনিসটি কি ভাই? সত্যিই কি কিছু?…

গ্রন্থের প্রথম কবিতাটি কঠিন তিরস্কারের মত শুধু নিরুদ্দিষ্টকেই নয় পাঠককেও আঘাত করে। সমস্ত বইয়ের উপর যেন মুখ ভার করে তাকিয়ে আছে মনে হয়! তাই হয়ত লীলাময়ের বোধ হয়েছে এ গ্রন্থে আনন্দ নেই, আছে শুধু অভিযোগ।

তুমি ভাবো এ জীবনে তোমার মানুষকে ভালোবাসা দুর্নীতি পাপ। তোমাকেও যে কেউ ভালোবাসবে সেও গর্হিত—অপরাধ! কেউ যদি তোমাকে বলে—বড়দা তোমাকে মনে মনে ভয়ানক ভালোবাসে। শুনলে তুমি রাগে ক্ষেপে যাবে। বলবে—কি, এত বড় স্পর্দ্ধা! কারণ, মনে মনে তুমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বসে আছো—এ দুনিয়ায় কাউকে নয়! এ সম্বন্ধে মনটা তোমার একটা নিশ্চয়তায় পৌঁছে একেবারে কঠিন হয়ে গেছে। এইখানেই মস্ত তফাৎ। আর এই তফাৎটাই অতিশয়োক্তির আকারে মাঝে মাঝে ধরা দেয় তোমার কবিতায়।

রাধু, একটা কথা মনে পড়লো, যৌবনে এক কালে ফরাসি সাহিত্যের সখ ছিল! আজ প্রাচীন কালে তার কিছুই মনে নেই, সমস্তই ভুলে গেছি, শুধু দুটো ছত্র মনে পড়ে—

Ah! l'affreaux esclavaga
Qui detre a soi.

ভাবটা এই যে একান্ত স্বাধীনতার মত এত বড় দাসত্ব আর নেই!

যাক এ সব কথা। আমার চেয়ে তুমি ঢের বেশি বুদ্ধি ধরো আমি মনে করি।

বইখানিতে না দেখার দোষে অনেকগুলি বানান ভুল হয়ে গেছে। শব্দের মাথায় বড় বেশি নিরর্থক কমার চিহ্ন পড়েছে—যথা বধূ'র নূতনে'র মাধবী'র এই সব। কবিরা নিরঙ্কুশ বটে, কিন্তু এই দোষগুলো না করাই ভালো, যেমন 'আলোক অমিয় ক্ষরা'। আলোক শব্দটা তো স্ত্রীলিঙ্গ নয়। রবিবাবুর কবিতায় প্রায় কোথাও এসব ভুল পাওয়া যায় না।... ... তবুও এসব অতি তুচ্ছ কথা বোন। আজ ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে তোমাকে মস্ত বড় দেখতে পাচ্চি। আমার এ দেখায় ভুল হয়নি জেনো।

তুমি আমাকে শিলঙেও নিমন্ত্রণ করেছো বটে, কিন্তু যাই কি কোরে! আমার ত সাহিত্যচর্চ্চা একপ্রকার বন্ধই হয়েছে, কিন্তু আর একটা কাজ জুটেছে যে। দেশের এই অতি হাঙ্গামার সময়ে পালাই কি বলে? হাবড়া জেলার আমি আবার কংগ্রেসের President: কিছুই করিনে তবু থাক্‌তে তো হয়। অথচ যাবার লোভও প্রবল। সাহিত্য-চর্চ্চার অভ্যাসটা আমার প্রায় ছেড়েই গেছে! তোমাদের মত সাহিত্যিকের কাছে এলে আবার যদি তার কিছু অংশও ফিরে পাই তো অনেক লাভ। আমার মতো কুড়ে মানুষ সংসারে আর দ্বিতীয় নেই। একান্ত বাধ্য না হলে কখন কোন কাজই আমি করতে পারিনে। তবুও এতগুলো বই লিখেছিলাম কি করে? সেই ইতিহাসটাই বলি।

আমার একজন 'গারজেন' [১] ছিলেন। এঁর পরিচয় জানতে চেয়োনা। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, তাঁর মত কড়া তাগাদাদার পৃথিবীতে বিরল। এবং তিনিই ছিলেন আমার লেখার সব চেয়ে কঠোর

১। জনৈকা মহিলা সাহিত্যিক।

সমালোচক। তাঁর তীক্ষ্ণ তিরস্কারে না ছিল আমার আলস্যের অবকাশ, না ছিল লেখার মধ্যে গোঁজামিলের সাহায্যে ফাঁকি দেবার সুযোগ। এলো-মেলো একটা ছত্রও তাঁর কখনো দৃষ্টি এড়াতো না। কিন্তু, এখন তিনি সব ছেড়ে ধর্ম্ম কর্ম্ম নিয়েই ব্যস্ত। গীতা-উপনিষদ ছাড়া কিছুই আর তাঁর চোখে পড়ে না। কখনো খোঁজও করেন না এবং আমিও বকুনি ও তাড়া খাওয়া থেকে এ জন্মের মত নিস্তার পেয়ে বেঁচে গেছি। মাঝে মাঝে বাইরের ধাক্কায় প্রকৃতিগত জড়তা যদি ক্ষণকালের জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখনি আবার মনে হয়—ঢের ত' লিখেচি—আর কেন? এ জীবনের ছুটিটা যদি এইদিক থেকে এমনি করেই দেখা দিলে তখন মিয়াদের বাকি দু-চারটে বছর ভোগ করেই নিইনা কেন? কি বল রাধু? এই কি ঠিক নয়? অথচ লেখবার কত বড় বৃহৎ অংশই না অলিখিত রয়ে গেল। পরলোকে বাণীর দেবতা যদি এই ত্রুটির জন্যে কৈফিয়ৎ তলব করেন তো তখন আর একজনকে দেখিয়ে দিতে পারবো এই আমার সান্ত্বনা।

কিন্তু, আর না। রাত অনেক ল; তোমারও অনেক সময় নষ্ট করে দিলাম। এদিকে টের পাচ্চি যে ঘুম চোখে যা লিখে গেলাম তার হয়ত অসঙ্গতির সীমা নেই। অথচ এ চিঠি ফিরে পড়বারও সাহস নেই—আশঙ্কা আছে তাহলে বোধকরিবা ছিঁড়ে ফেলে দেবো; আর হয়ত পাঠানোই হবে না। তাই খামের ভেতর বন্ধ করে দিচ্চি। যদি অন্যায় কোথাও কিছু লিখে ফেলে থাকি বড়দা বলে ক্ষমা কোরো। ইতি—

২০শে বৈশাখ ১৩৩৭

তোমার বড়দা

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
হাবড়া

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধু, দিন তিনেক আগে তোমাকে একখানি মস্ত বড় চিঠি লিখেছিলুম, তোমার কবিতার বইয়ের লম্বা সমালোচনা করে। সে চিঠিখানি তোমাকে পাঠিয়েচি না ছিঁড়ে ফেলেচি ঠিক মনে পড়ছে না। রাত্রিবেলায় বসে বসে তোমার 'লীলাকমলের দলগুলি' (তোমার ভাষায়) নাড়তে চাড়তে তার সৌরভে আত্মবিস্মৃত হয়ে অনেক কথাই লিখে ফেলেছিলুম। চিঠিখানা আদৌ পেয়েছ কিনা জানিয়ো। এখন দিনের বেলায় মনে হচ্চে, সে-চিঠি তোমাকে হয় তো দুঃখ দেবে বা! চিঠিখানি যদি না পেয়ে থাকো, তাতে যা লিখেছিলুম তা মোটামুটি জানাচ্চি। কারণ, তুমি হয় তো এখুনি সোজাসুজিই বলে বসবে—

'ও সমস্তই বড়দার চালাকি। দীর্ঘদিন বইখানা পেয়েও নিছক কুড়েমি করে নিরুত্তর থাকার বাজে কৈফিয়ৎ।' অথবা বলবে—'বুঝেচি ওটা আমার রাগের ভয়ে পরিপাটি একটি বানানো গল্প।'

সত্যি বলচি বোন্, এটা কিন্তু একটুও বানানো-গল্প নয়। তবে তোমাদের রাগের ভয়টা যে আমার আজও সত্যিই আছে সেটা কবুল করচি। সংসারে যে দু' চার জায়গায় সত্যিকারের অকৃত্রিম স্নেহ ও নিষ্কলুষ শ্রদ্ধা পেয়েচি বোন্, আমি তার দাম জানি। তাই তাকে হারাতে আমার সত্যিই ভয়।'

তুমি হয়তো এখুনি হেসে উঠবে। বলবে—'অকৃত্রিম স্নেহ অত সহজে হারিয়ে যায় না বড়দা!' সে কথা সত্যি দিদি! তবুও কি-জানো— অতি অকৃত্রিম গভীর স্নেহও সংসারের অনেক রকম কারণ অকারণের চাপে আচ্ছন্ন হয়ে বা আপনাকে আবৃত করে রাখতে বাধ্য হয়। এমন

কি, অনেক সময়ে সে আপনাকে আপনারই কাছে স্বীকার করতে রাজী হয়না, যদিও বা নিজের কাছে নিজেকে মানেও—অন্যের কাছে প্রকাশ করতে চায়না, বিশ্বের কাছে তো নয়ই। তারপরে আছে ভুল-বোঝা। স্নেহ-ভালবাসা শ্রদ্ধা প্রীতি সম্পর্কের মধ্যে যত কিছু অঘটন ঘটে, তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সত্যকার অপরাধ বা ত্রুটির চেয়ে ভুল-বোঝাটাই শতকরা আশি ভাগেরও উপরে বর্ত্তমান। ঐ ভুল বোঝাটাকেই আমি বেজায় ভয় করি। আমার বেশির ভাগ বইয়েই তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেচ এটা।...

ঐ দেখ, কি লিখতে বসে কি সব বকতে সুরু করেচি। বুড়ো হওয়ার পুরোপুরি লক্ষণই হচ্চে এই বকা। বাজে বকা। ধান ভান্‌তে দিয়েচ কি, তান ধরবে সেই সময়ে শিবঠাকুরের গানের। দেখচ না তোমার গুরুদেবের[1] কলমের কাণ্ড! একটা পয়েণ্টে কথা সুরু করে কোথায় কোন্‌দিকে কোন পথে যে চলে যান্ তার আর হাল্‌হদিশ, খুঁজে মেলা দায় হয়। এইটাই হোলো বুড়ো হওয়ার সবচেয়ে নিঃসন্দেহ-লক্ষণ। যদিও তোমরা (তার সঙ্গে উনিও[2]) তা কিছুতেই মানতে চাওনা। আমারও আজকাল ঐ দোষটা পূরো মাত্রায় এসেচে যেন অনুভব করচি। বাজে বকতে পেলে আর যেন কিছুই চাইনে।

এই দেখ, তুমি যাতে রাগ না কর আর ভুল না বোঝো বলে চিঠি লিখতে বসে' তোমাকে রাগিয়েই দিলুম বুঝি বা! দোহাই, বড়দাকে ভুল বুঝোনা ভাই, লক্ষীটি।

১। রবীন্দ্রনাথ

২। রবীন্দ্রনাথ

যে-চিঠিখানা লিখেও তোমাকে পাঠাইনি মনে হচ্ছে, তাতে তোমার বইয়ের সমালোচনায় যা লিখেছিলুম জানাচ্ছি। লিখেছিলুম—"রাধু, তোমার লীলাকমলের কবিতাগুলি এতই অন্তস্পর্শী, এতই emotional যে পড়তে পড়তে বার বার ভুল হয়ে যায়, এ তোমার অন্তর থেকে বাস্তবিকই উৎসারিত হয়ে আসছে বুঝিবা! কিন্তু আমি তো তোমাকে ভাল করে চিনি দিদি। আর যাই হোক এ তোমার জীবনের বাস্তব উপলব্ধি থেকে লেখা নয়। কবিতাগুলি অন্য যে কোনও কারুর কাছে জীবন্ত সত্য হয়ে উঠলেও, লেখিকার কাছে কিন্তু এরা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। নিছক কাল্পনিক বিষয়কে এমন গভীর সত্যিকথার মতন করে কী করে লিখতে পারলে ভেবে অবাক্ হচ্চি। যে-বেদনা তোমার অকৃত্রিম উপলব্ধির বস্তু নয়, কল্পনার সাহায্যে যাকে আয়ত্ত করেছো, তাকে এমন করে প্রকাশ করার মধ্যে তোমার কলমের বাহাদুরী যতই থাক্, আমি বলবো তোমার নিজের বাহাদুরী নেই ভাই!

তোমরা—এই মেয়েরা—তোমাদের আজও ঠিক চিনে উঠতে পারলুম না। নিজের জীবনের অতি কঠিন ও গভীর বেদনায় এই অভিজ্ঞতাই মাত্র সঞ্চয় করতে পেরেচি রাধু! তোমাদের মত কবি-কল্পনা দিয়ে নয়, নিজের জীবনকে ফোঁটায় ফোঁটায় গলিয়ে নিঃশেষে নীরবে দগ্ধ করে যে-অভিজ্ঞতা বাস্তব থেকে আহরণ করেচি; এখন মনে হয়, আমার সাহিত্যেও হয় তো সেইটাই ফুটে উঠেছে বারংবার, আমার জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারেও। আর এটা অত্যন্ত অকৃত্রিম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই বোধ হয় এত সহজে ছোট বড় সবাইকার কাছে আবেদন পেয়েছে।

আমার কি মনে হয় জানো? আমরাই যে শুধু তোমাদের চিনে উঠতে পারলুম না তা' নয়, তোমরা নিজেরাও বোধ হয় নিজেদের

ঠিক চিনে উঠতে পারো না, অথবা নিজেকে চিনতে ভয় পাও। হয়তো এমনও হতে পারে, চিনেও সহজে তাকে স্বীকার করে নিতে চাও না। এও কিন্তু আমার কাল্পনিক ধারণা নয়, সত্যিকারের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত ধারণা, সুতরাং এর মূল্য উড়িয়ে দেবার নয়।

আজ এই পর্য্যন্ত। সাক্ষাতে বিষয়ে আলোচনার ইচ্ছা রইল। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ নিয়ো। ইতি ২৩শে বৈশাখ, ১৩৩৭

তোমার বড়দা

পুনশ্চ—

তোমার বইখানির ছাপা বাঁধাই সাজসজ্জা অতি পরিপাটী চমৎকার হয়েছে। যারা ওর নিন্দে করেছে, তারা অমনটি পারে নি বা পারে না বলেই নিন্দে করেছে। তুমি ক্ষুণ্ণ হোয়ো না, বরং হেসো একটু বেশি করে।

সামতাবেড়, পানিত্রাস
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধু, কুমিল্লায়[১] হঠাৎ লোকে আমা চালান্ করে দিয়েছিলো ফিরে এসে তোমার চিঠি পেলাম।

'শেষপ্রশ্ন' তোমার ভাল লেগেছে শু ভারি আনন্দ পেলাম ভেবেছিলাম এ বই ভালো লাগবার মানুষ না দেশে হয়ত পাবো না

১। শরৎচন্দ্র এই সময় কুমিল্লায় এক রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব কর গিয়েছিলেন। এই সময় বাঙ্গলা কংগ্রেসে দুটি দল ছিল। দুটি দলের একদিকে ছি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, আর অপরদিকে ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র ব শরৎচন্দ্র সুভাষচন্দ্রের দলে ছিলেন। তাই সুভাষচন্দ্রই শরৎচন্দ্রকে কুমিল্লায় পাঠিয়েছিলে

শুধু গালি-গালাজই অদৃষ্টে জুটবে, কিন্তু, দেখচি ভয়ের কারণ অত গুরুতর নয়। মরুভূমির মাঝে মাঝে ওয়েসিসের দেখাও মিলচে। কয়েকখানি চিঠি পড়লাম, একটি মেয়ে লিখচেন তাঁর যথেষ্ট টাকা থাকলে এই বইটা ছাপিয়ে বিনামূল্যে বাইবেলের মত বিতরণ করতেন। এ হোলো একটা দিক, অপর দিকটা এখনো চোখের আড়ালে আছে, ঝড় বইতে সুরু হ'লেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

অতি-আধুনিক-সাহিত্য কি হওয়া উচিত এ তারই একটুখানি ইঙ্গিত; বুড়ো হয়ে এসেচি, শক্তি-সামর্থ্য পশ্চিমের আড়ালে ডুব দেবার আভাস অহরহ নিজের মধ্যে অনুভব করি, এখন যাঁরা শক্তিমান নবীন সাহিত্যিক, তাঁদের কাছে হেঁট হয়ে এইটুকু মাত্র বলে গেলাম। এখন তাঁদেরই কাজ—ফুলে ফলে শোভায় সম্পদে বড় করে তোলার দায়িত্ব তাঁদেরই বাকি রইলো। ভাষার ওপরে দখল আমার চিরদিনই কম; শব্দসম্পদ কত যে সামান্য এ সম্বাদ আর যার কাছেই লুকনো থাক, তোমাদের কাছে থাকবার কথা নয়। অথচ মনের মধ্যে বলবার জিনিস অনেক রয়ে গেলো—সময় হ'ল না দিয়ে যাবার—তারই একটুখানি প্রকাশের চেষ্টা শেষপ্রশ্নে করেচি।

তুমি চেয়েচো আমার কাছে সৎ-পরামর্শ।[১] কিন্তু চিঠির মধ্যে তো সৎ-অসৎ কোনো পরামর্শই পাঠাতে পারিনে ভাই; পারি শুধু পাঠাতে আমার অকুণ্ঠ কল্যাণ কামনা। যেদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে—

১। রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেব উভয়ের মধ্যে শরৎচন্দ্র শ্রদ্ধা ও স্নেহের গভীরতা লক্ষ্য করেছিলেন। শরৎচন্দ্র এঁদের প্রায়ই বলতেন—তোমরা যদি বিবাহের মধ্য দিয়ে পরস্পরের দায়িত্ব গ্রহণের অধিকার নাও, তাহলে তোমাদের জীবন আরও সহজ ও সুন্দর হয়ে উঠবে। রাধারাণী দেবী এই সম্পর্কেই শরৎচন্দ্রের কাছে সৎ-পরামর্শ চেয়েছিলেন।

সব কথা জেনে নেবো। আজ কেবল এইটুকুই জানাবো যে, দুঃখ যারা সইতে ভয় পায় না এ পথ তাদের জন্যেই।

ইতিমধ্যে যদি ধৈর্য্য থাকে 'শেষপ্রশ্ন'খানা আরও একবার পড়ে দেখো। তোমার অনেক প্রশ্নের জবাব পাবে। যে সব কথা হয়ত চোখ এড়িয়ে গেছে তাদেরও দেখা পাবে। কোনো বই বার দুই না পড়ে দেখলে তার সবটুকু চোখে পড়ে না।

অনেকদিন তোমাকে দেখিনি, এক একবার দেখবার ইচ্ছেও হয়। কবে দেখা হতে পারে যদি একটু জানাও ভাল হয়। আরও একটা কথা। বামুন মানুষ, বিশেষতঃ বুড়োমানুষ, যত্ন করে খাওয়ানোটা যে একটু বেশি রকম পছন্দ করি, আমার লেখার মধ্যে এ ইঙ্গিতটুকু অনেকেই আমার নিজের ব'লে অনুমান করে। ভাবে মনে হয় তোমারও আন্দাজ যেন ঐ রকম। ঠিক না?

আমার অন্তরের গভীর স্নেহাশীর্ব্বাদ রইলো। ইতি ৩০শে বৈশাখ '৩৮

বড়দা

সামতাবেড়, পানিত্রাস
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধু, তোমার আগেকার চিঠি যথাসময়েই পেয়েছিলাম এবং নূতন বছরের আরম্ভে যে আশীর্ব্বাদ চেয়েছিলে তা মনে মনে দিতে কোন কৃপণতা করি নি, শুধু প্রকাশ্যে জানানোটা ঘটে ওঠে নি ভাই। "এই কালই জবাব দেবো" এই একটা প্রতিজ্ঞা প্রত্যহ সকালে উঠেই করেচি এবং করতে করতে মাস দেড়েক কেটে গেলো। এমনি স্বভাব। অথচ তোমাদের আজও এ জ্ঞান আর জন্মালো না যে ভাবো—'দাদাটি

তোমাদের স্বর্গে গেছেন—আর তাকে স্মরণ করাই বা কেন, আর তার আশীর্ব্বাদ চাওয়াই বা কিসের জন্যে।' আর কদিনই বা বাকি আছে বোন—একটু আগে থেকেই না হয় ভাবলে। কি এমন ক্ষতি? আরও তো কেউ কেউ এইটাই স্বীকার করে নিয়ে একেবারে নিরুদ্দেশের আড়ালে মিলিয়ে গেচেন।[১] তোমরা পারো না?

একটা কথা লিখেচো দেখলাম যে—কমলের স্রষ্টা রমার স্রষ্টা তো নয় যে—ইত্যাদি। তার মানে যে রমার স্রষ্টাই তোমাদের বুঝতেন—তোমাকে আদর করতে পারতেন, কিন্তু কমলের কথা যিনি লিখতে আরম্ভ করেছেন তাঁর কাছে আর ভরসা করবার কি আছে? এই না কি?

কিন্তু একটা কথা ভুলে গেলে যে পল্লী-সমাজের রমা পল্লী-সমাজেরই মানুষ। যাদের অস্তিত্ব নিত্য নিয়ত আমরা অনুভব করি। সুখে দুঃখে ভালোতে মন্দতে যাদের আমরা কাছে পাই। কিন্তু শেষপ্রশ্নের কমলের কাছে সে প্রত্যাশা করা চলে কি কোরে?

আরও একটা কথা রাধু! লোকে লিখতে বলে—না লিখলেও দেখি চলে না—কিন্তু এই প্রাচীনকালে আগেকার দিনের অর্থাৎ যৌবনের সে শক্তি পাবো কোথায়? তাই এখন এই শেষ বয়সের জোর করে লেখার শতেক ত্রুটি শতেক অভাব লোকের চোখে পড়ে। লেখার দৈন্য এখন নিজেই অনুভব করি। ভাষার সে শ্রীও নেই, বাঁধুনিও গেছে। সব যেন এলো-মেলো শিথিল হয়ে দেখা দিচ্চে—না? দেবার কথাও। আসলে আমি ত সাহিত্যিক নই দিদি। এ যেন আমার এম্-এস্-সি পাশ করে ওকালতি পেশা ধরা সাহিত্যের মধ্যে আমি কোনোদিন তেমন

১। শরৎচন্দ্রের জীবনে একটা গোপন বেদনা ছিল। তাঁর এই বেদনার কথা রাধারাণী দেবী জানতেন। তাই রাধারাণী দেবীকে লেখা বহু পত্রেই তাঁর এই বেদনার আভাষ পাওয়া যায়। এখানেও সেই আভাষই ব্যক্ত হয়েছে।

আনন্দও পাই নে, যেমন পাই বিজ্ঞানের মধ্যে।[১] এর জন্যেই হয়ত আমি তৈরি হয়েছিলাম, কিন্তু গ্রহের ফেরে হয়ে গেলো ঠিক উল্টো। ভাবি, আবার যদি কখনো জন্ম হয়, সেবার যেন না এত বড় ভুল আর ঘটে।

কেমন আছ? দেখা সাক্ষাৎ হবারও যো নেই—যখন ফিরবে আমাকে চিঠি লিখে জানিয়ো। ইতি ৬ই জ্যৈষ্ঠ, '৩৮

বড়দা

১। "সাহিত্যের মধ্যে আমি কোনদিন তেমন আনন্দও পাইনে—" একথা শরৎচন্দ্রের নিছক রসিকতা মাত্র। অবশ্য বিজ্ঞানেও যে তিনি যথেষ্ট আনন্দ পেতেন একথাও ঠিক। কারণ তিনি এক সময় বহু বিজ্ঞানের গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন। তাছাড়া সব সময়েই বহু বিজ্ঞান-গ্রন্থ তাঁর শেল্‌ফে সাজানো থাক্‌তো। খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র শরৎচন্দ্রের কথা বলতে গিয়ে এ সম্বন্ধে এক জায়গায় বলেছেন—"সুদূর ব্রহ্মদেশ হইতে আসিয়া এই যে কাহিনীর যাদুকর হঠাৎ এক শুভপ্রভাতে সমস্ত বাঙ্গালা দেশকে চকিত, চমৎকৃত করিয়া দিলেন, তাঁহারই সৃষ্ট চরিত্রগুলির সঙ্কেত অনুসরণ করিয়া মুগ্ধ বাঙ্গালী সেদিন তাঁহাকে চিনিবার চেষ্টা করিয়াছে। সতীশ, উপীন, রমেশ এমন কি দেবদাসের মধ্যেও আমরা সেদিন তাঁহাকে সন্ধান করিয়াছি, সেই সঙ্গেই তাঁহার ভেলো কুকুরের কথা শুনিয়াছিলাম। তাঁহার ঘরের মধ্যে টাঙ্গান বন্দুকের পাশে রুদ্রাক্ষের মালার কথা, তাঁহার শেল্‌ফে সাজানো অজস্র বিজ্ঞান-গ্রন্থের কথা।" (শরৎ-বন্দনা পৃঃ২১৭-১৮)

শরৎচন্দ্র বিজ্ঞান সম্বন্ধে এত বেশি পড়াশুনা করেছিলেন যে, একবার তিনি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও লেখক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভারতবর্ষে প্রকাশিত "জড়-জগৎ" নামক একটি প্রবন্ধের সমালোচনা করে তাঁর দিদির নাম দিয়ে (শরৎচন্দ্র তাঁর দিদি অনিলা দেবীর ছদ্মনামে সমালোচনা লিখতেন) একটা প্রতিবাদ লিখতে চেয়েছিলেন। তাই তখন তিনি ভারতবর্ষের অন্যতম সত্ত্বাধিকারী, তাঁর বন্ধু শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে রেঙ্গুন থেকে ২৫. ১২. ১৫ তারিখে একটি চিঠিও লিখেছিলেন। সেই চিঠিখানি এই গ্রন্থের ১৩০পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে।

[শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা]

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট

জেলা হাবড়া

কল্যাণবরেষু—তোমার চিঠি পাইলাম। আমি শয্যাগত হইয়াই পড়িয়াছিলাম। এখন ভাল হইয়াছি। পথের দাবীর শেষ অধ্যায়টা[১] যদি দেখানো প্রয়োজন জ্ঞান কর ত দেখাইয়ো। এখানে আমার ত নিমন্ত্রণের আবশ্যকতা নেই—এতদূরে যে কোন প্রিয়জন কষ্ট স্বীকার করিয়া যদি আসেন সত্যই খুসি হই।

খবরের কাগজ ত পড়ি না, তবে শুনিয়াছি, কলিকাতায় নাকি হিন্দু-মুসলমানে ঝগড়া-ঝাঁটি হইতেছে,—সে ত এতদিনে নিশ্চয় থামিয়া গিয়াছে।

সুধীর সরকার[২] আজও বই ছাপানো সম্বন্ধে তাহার অভিমত দিল না। আমার বিশ্বাস যে সে ছাপাইবে না।

রমাপ্রসাদ[৩] কেমন আছেন?

আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিয়ো—ইতি ২৮শে চৈত্র ১৩৩২

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১। এই সময় উমাপ্রসাদ বাবুদের বাড়ী থেকে "বঙ্গবাণী" নামে একটি মাসিক পত্রিকা বার হ'ত। এই বঙ্গবাণী পত্রিকাতেই শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী" উপন্যাসটি প্রথম ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

২। কলকাতার এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স নামক পুস্তক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সত্ত্বাধিকারী। ইনি প্রথমে "পথের দাবী" পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরে রাজদ্রোহিতার ভয়ে প্রকাশ করতে রাজী হন নি।

৩। উমাপ্রসাদবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া। ২৫শে আষাঢ় ১৩৩৩।

পরম কল্যাণীয়েষু,—উমাপ্রসাদ, পরশু তোমার চিঠি পেলাম। আমার যথার্থই ভারি ইচ্ছে তুমি চিরদিনের মত এবারও এবং শুধু এবার নয়, সমস্ত ভবিষ্যতেই সকলের আগে আগে চল। পড়াশুনা যে ভাল হয় নি সে আমি জানি, তবু আশা যে কেউ তোমাকে সহজে পেছিয়ে রেখে যেতে পারবে না।

আমি কলকাতায় তারপরে আর যাই নি। এদিকে ছোট্ট পরিসরের মধ্যে যেমন ভাবে হোক্ দিন কাটে, কিন্তু একবার সহরের মুখ দেখে এসে সামলাতে যায় ৫।৭ দিন।

তার মাঝে বৃষ্টি বাদল, কাদায় পথ চলা কঠিন,—সে শক্তিও নেই, উদ্যমও নেই। কিছু দিন পূর্ব্বে অন্ধকার রাতে দুটো সিঁড়িকে একটা সিঁড়ি ভেবে নাম্‌লে যা হয় তাই হয়েছিল। অবশ্য বাইরে তার প্রকাশ নেই, কিন্তু পিঠ আর কোমরের ব্যথা আজও সম্পূর্ণ মিলোয় নি।

একজামিনটা মন দিয়ে দেওয়াই চাই। কুমুদবাবুর[১] সঙ্গে দেখা হ'লে বোলো তাঁর পত্র পেয়েছি। প্রবন্ধ যে কি হ'ল আমার কোন ধারণাই নেই। সম্ভবতঃ, হারিয়েছে।

তোমার বইটা আছে। শেষের chapter ক'টা দেখে রেখেছি। কিন্তু তার আগে পরীক্ষা শেষ হোক্।

সবাই বলে আমাকে লিখতে। কিন্তু কি যে লখি ঠাউরে পাই নে; সবই অর্থহীন এবং অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। আরও পাঁচ জন গ্রন্থকারের মত নিজের মনটাকে যদি সাবেক দিনের সেই পুরানো

১। "বঙ্গবাণীর" অন্যতম কর্মকর্তা।

"সাহিত্য-সেবা"র ভিতরে আর একবার টেনে নিয়ে যেতে পারতাম ত হয়ত আরও কত-কি বিন্দুর-ছেলে চরিত্রহীন লিখে দিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু সে যে এ জীবনে আর ফিরবে এ ভরসা ত হয় না। কেবলই ভাবি কি হবে লিখে? লোক আনন্দ পায়? না-ই পেলে আনন্দ। পাবার অধিকার আগে অর্জ্জন করুক তার পরে অনেক লোক জন্মাবে বিন্দুর ছেলে রামের সুমতি লিখে স্তূপাকার করবার।

নির্ম্মল[১] কি এখনো ভবানীপুরে আছেন? হাত-দেখা শেখবার বড় ইচ্ছে হয়েছে।

আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সামতাবেড়। পানিত্রাস পোষ্ট,
জেলা হাবড়া। ১২ই শ্রাবণ ১৩৩৩।

পরম কল্যাণীয়েষু,—উমাপ্রসাদ, কাল তোমার চিঠি পেলাম। পূর্ব্বেও একখানা পেয়েছিলাম, কিন্তু যথা রীতি জবাব দিতে পারি নি।

এইমাত্র একজন নৌকোর মাঝির চিকিৎসা ক'রে এলাম। সর্ব্বাঙ্গে tincture iodine মাখিয়ে arnica খাবার ব্যবস্থা ক'রে, তাপ সেকের বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে ফিরেছি। কাল রাত্রে তার নৌকো ডুবে, তার ওপর দিয়ে নৌকো ভেসে গিয়েছিল।

যাক্, একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে। এ বাড়ী রূপনারাণকে উৎসর্গ ক'রে দিয়ে বেঁচেছি। বান ও বন্যায় ঐ নদী যে কি ভীষণ হ'তে পারে এবারে ভাল ক'রে দেখ্‌লাম। যে নদীর ধারের বাঁধ দিয়ে তোমরা আমাদের এখানে আস্‌তে সে নেই। বোধ হয় আজকের

১। উমাপ্রসাদবাবুর জনৈক আত্মীয়।

জোয়ারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তার পরে জল আর জল! বাঙ্‌লা দেশের ষড়ঋতুর অর্থ যে সত্য সত্যই কি বস্তু তা এখানে বছর খানেক না থাক্‌লে বোধ করি জানাই যায় না। এও একটা পরম লাভ।

তার সম্বন্ধে কৌতূহল আছে বই কি, তবে জানি ঠিক হাতেই আছে। উপায় যদি থাকে ত হবেই,—তার জন্যে আমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তবে শেষে যা হবে সে তো জানাই আছে। দিন দশ পনেরো বান আর জোয়ার, এখানে মাটি দেওয়া আর ওখানে গর্ত্ত বোজানো এই নিয়েই কেটে যাচ্ছে। আমার যাওয়া যে শীঘ্র হবে আশা হয় না।

Fountain penটা পড়েই আছে। সেই torch lightটাও ভেঙ্গেছে

তোমার B. L. পাসের কি result বেরিয়েছে? আমার আশীর্ব্বাদ জেনো। দেহ নিতান্ত মন্দ নেই।—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণবরেষু,

বিজু[১], কাল রাত্রে তোমার চিঠি পেলাম। বোধকরি ৩১শে ভাদ্রই এই লিপিটুকু তোমার হাতে গিয়ে পড়বে—আর সেদিন আমার জন্মদিন, বয়স পঞ্চাশ পূর্ণ হবে। নিশ্চয় জানতাম এর আগে আর কিছু হবে না, কিন্তু একান্ন বছরে আর বিশ্বাস নেই। বলি, ভগবান এই যেন করেন। আমাদের বংশে পঞ্চাশ কেউ পূর্ণ করে নি, আমিই প্রথম।

১। উমাপ্রসাদবাবুর ডাকনাম।

কলকাতা থেকে এসে পর্য্যন্ত একপ্রকার যেন শয্যাগত হয়ে পড়েছিলাম। অর্শ থেকে ভয়ানক রক্ত পড়তে সুরু হয়েছিল। এমেটিন ইন্‌জেক্‌মন নিয়ে তরসু একটা আর কাল একটা—আজ দেখ্‌চি আর রক্ত পড়ে নি।

তোমাদের বাড়ীর খবর কি? বেরিবেরি ভাল হল কি? কবে নাগাদ কলকাতায় ফিরবে? কাল ভাব্‌চি কলকাতায় খাবো। মন্টু[১] নেমন্তন্ন করেছে।

বইটার সম্বন্ধে নানা গুজব যে বাজেয়াপ্ত হবেই কিম্বা হয়েই গেছে। কিছু জানো?

আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ রইল। ইতি—১৯শে ভাদ্র ১৩৩৩ দাদা

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট,
হাবড়া জেলা। ১৮ই আশ্বিন '৩৩।

পরম কল্যাণবরেষু,—বিজু, বহু দিন তোমার চিঠিপত্র পাই নি। কোথায় যে আছো তাও ঠিক জানি নে। আমার শরীর আগেকার চেয়ে অনেক ভালো। দুটো এমেটিন্ ইন্‌জেক্‌শনের বোধ করি ফল হয়েছে। ঝর্ ঝর্ ক'রে রক্ত পড়াটা একেবারে বন্ধ আছে।[২] স্যানাটো-জেন, ডিম, বাতাপি নেবু—এই সব নিয়মিত খাবার ফলে মাথার খালি-খালি ভাব্‌টাও কমেছে। কিন্তু বাহিরের চেহারাটা শীর্ণ, শীর্ণতর হয়েই আস্‌ছে। আস্‌বেও। ভারতলক্ষ্মী অর্থাৎ নূতন একখানা মাসিকের সম্পাদক হ'তে রাজী হয়েছি, অন্ততঃ, শেষ পর্য্যন্ত হ'তে

১। শ্রীদিলীপকুমার রায়

২। শরৎচন্দ্র অর্শে ভুগতেন। এখানে অর্শের রক্তপাতের কথাই বলছেন।

হবে। আজ একখানা চিঠি লিখে দিলাম, যদি সে সর্ত্তে তাঁরা সম্মত হন ত সম্পাদকের ভার নিতে পারি। তার কারণ, সংসারে বহু লোকেরই যা হয় আমারও তাই হয়েছে, অর্থাৎ, সংসারে বুদ্ধিমান এবং নির্বোধ আছে এবং এক পক্ষের জয় হয়। বেশি টাকা না হলেও ৫।৬ হাজার টাকার দায়ী হয়েছি। ভেবেছি এইটে শোধ কোরব ভারত-লক্ষ্মীতে যোগ দিয়ে। তাঁরা আমাকে সিকি অংশ দেবেন। এবার কিন্তু সংসারী বুদ্ধিমান লোকেরা যেরূপ আচরণ করে আমিও তাই কোরব। অর্থাৎ ঠক্‌বো না। পূজোর পরেই সব detailগুলো স্থির হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে সাহিত্যিক পরিচিত অপরিচিতের অনেকেই লিখ্‌চেন তাঁদের রচনা নিয়ে আগাম টাকা যেন পাঠিয়ে দিই। হায় রে,—এ শক্তি যদি থাক্‌তো। কিন্তু এই শক্তিটারই আমার বড় প্রয়োজন।…

অনেক দিন তোমাকে দেখি নি। তোমাদের অসুখ বিসুখ যদি আরাম হয়ে থাকে ত এবার চলে এসো না? আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো।—দাদা।

সোমবার, ৩১শে জানুয়ারী '২৭

পানিত্রাস পোষ্ট

জেলা—হাবড়া

বিজু, এবার দেখ্‌চি injectionএ কোনও সুবিধে হচ্ছে না। রক্ত-পাত হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রের মত।

হরিদাসকে[১] লিখে দাও আমি এ সময় কোথাও যেতে পারব না।

১। রাজনীতিক শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়। হরিপদবাবু শরৎচন্দ্রকে নদীয়া জেলার একটি রাজনৈতিক সম্মেলনে নয়ে যাবার কথা বলেছিলেন।

আমাকে দিয়ে আর কোন কাজ হবে না। বোধ হয় আর এ অসুখ ভাল হবে না, স্থগিতও থাকবে না। দাদা

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা—হাবড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

বিজু, তোমার চিঠি পেলাম। রক্ত বন্ধ ত হয়ই নি, বরঞ্চ যেন বেশী বেশী পড়চে। যাক্, এ প্রসঙ্গ আর না।

শ্রীযুক্ত রবিবাবুর চিঠি[১] পেলাম। তাঁর অভিমত মোটের উপর

১। গবর্ণমেন্ট "পথের দাবী" বাজেয়াপ্ত করলে শরৎচন্দ্র এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে শরৎচন্দ্রকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটি এই গ্রন্থের ২৭১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা হয়েছে।

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের এই চিঠির একটি উত্তর লিখেছিলেন, কিন্তু বন্ধুবান্ধবরা নিষেধ করায় চিঠিখানি আর রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠানো হয়নি। শরৎচন্দ্রের এই চিঠিখানি শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে আজও রয়েছে। চিঠিখানি এইরূপ—

সামতাবেড়, পাণিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

শ্রীচরণেষু,

আপনার পত্র পেলাম। বেশ, তাই হোক। বইখানা আমার নিজের বলে একটুখানি দুঃখ হবারই কথা, কিন্তু সে কিছুই নয়। আপনি যা কর্ত্তব্য এবং উচিত বিবেচনা করেছেন তার বিরুদ্ধে আমার অভিমানও নেই অভিযোগও নেই। কিন্তু আপনার চিঠির মধ্যে অন্যান্য কথা যা' আছে সে সম্বন্ধে আমার দুই একটা প্রশ্নও আছে, বক্তব্যও আছে। কৈফিয়তের মত যদি শোনায় সে শুধু আপনাকেই দিতে পারি।

আপনি লিখেছেন ইংরাজরাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। ওঠ্‌বারই

এই যে, বইখানি পড়লে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। এবং তাঁর অভিজ্ঞতা এই যে স্বদেশে বিদেশে যত রাজশক্তি আছে, ইংরাজের মত ক্ষমাশীল আর কেউ নয়। মাত্র

কথা। কিন্তু এ যদি আমি অসত্য প্রচারের মধ্যে দিয়ে করবার চেষ্টা ক'রতাম লেখক হিসেবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ দুইই ছিল। কিন্তু জ্ঞানতঃ তা আমি করিনি। করলে politicianদের propaganda হ'ত, কিন্তু বই হত না। নানা কারণে বাঙলা ভাষায় এ ধরণের বই কেউ লেখে না। আমি যখন লিখি এবং ছাপাই তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করেছিলাম। সামান্য সামান্য অজুহাতে ভারতের সর্ব্বত্রই যখন বিনা বিচারে অবিচারে অথবা বিচারের ভান ক'রে কয়েদ নির্ব্বাসন প্রভৃতি লেগেই আছে তখন আমিই যে অব্যাহতি পাবো, অর্থাৎ, রাজপুরুষেরা আমাকেই ক্ষমা করে চল্‌বেন এ দুরাশা আমার ছিল না। আজও নেই। তাঁদের হাতে সময়ের টানাটানি নেই, সুতরাং, দুদিন আগে পাছের জন্য কিছুই যায় আসে না। এ আমি জানি, এবং জানার হেতুও আছে। কিন্তু এ থাক্। এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু বাঙলা দেশের গ্রন্থকার হিসেবে গ্রন্থের মধ্যে যদি মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে থাকি, এবং তৎসত্ত্বেও যদি রাজরোষে শাস্তি ভোগ করতে হয় ত করতেই হবে—তা' মুখ বুজেই করি, বা অশ্রুপাত করেই করি, কিন্তু প্রতিবাদ করা কি প্রয়োজন নয়? প্রতিবাদেরও দণ্ড আছে, এবং মনে করি তারও পুনরায় প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক। নইলে, গায়ের জোরকেই প্রকারান্তরে ন্যায্য বলে স্বীকার করা হয়। এই জন্যেই প্রতিবাদ চেয়েছিলাম। শাস্তির কথাও ভাবিনি এবং প্রতিবাদের জোরেই যে এ বই আবার ছাপা হবে এ সম্ভাবনার কল্পনাও করিনি।

চুরি ডাকাতির অপরাধে যদি জেল হয় তার জন্যে হাইকোর্টে আপিল করা চলে, কিন্তু আবেদন যদি অগ্রাহ্যই হয়, তখন দুবছর না হয়ে তিন বছর হল কেন এ নিয়ে বিলাপ করা সাজে না। রাজবন্দীরা জেলের মধ্যে দুধ ছানা মাখন পায় না ব'লে কিম্বা, মুসলমান কয়েদীরা মোহরমের তাজিয়ার পয়সা পাচ্চে, আমরা দুর্গোৎসবের খরচ পাই না কেন এই বলে চিঠি লিখে কাগজে কাগজে রোদন করায় আমি লজ্জা বোধ করি, কিন্তু মোটা ভাতের বদলে যদি Jail authorityরা ঘাসের ব্যবস্থা

বইখানি চাপা দিয়ে আমাকে কিছু না বলা আমাকে ক্ষমা করা। অর্থাৎ এটুকু বোঝা গেল এ বই পড়ে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন।

তোমার গল্প পাতা খানেক লিখে থেমে আছে। আজ আবার আরম্ভ কোরব। কিন্তু কোন কিছুতেই যেন আর মনঃসংযোগ করতে পারচি নে।

করে, তখন হয়ত তাদের লাঠির চোটে তা চিবোতে পারি, কিন্তু ঘাসের ড্যালা কণ্ঠরোধ না করা পর্য্যন্ত অন্যায় বলে প্রতিবাদ করাও আমি কর্ত্তব্য মনে করি।

কিন্তু বইখানা আমার একার লেখা, সুতরাং দায়িত্বও একার। যা' বলা উচিত বলে মনে করি, তা বলতে পেরেছি কিনা এইটেই আসল কথা। নইলে ইংরাজ সরকারের ক্ষমাশীলতার প্রতি আমার কোন নির্ভরতা ছিল না। আমার সমস্ত সাহিত্য সেবাটাই এই ধরণের। যা উচিত মনে করেছি তাই লিখে গেছি।

আপনি লিখেছেন আমাদের দেশের রাজারা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অন্যান্য রাজশক্তির কারও ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের মত সহিষ্ণুতা নেই। এ কথা অস্বীকার করবার অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু এ আমার প্রশ্নই নয়। আমার প্রশ্ন ইংরাজ রাজশক্তির এ বই বাজেয়াপ্ত করবার justification যদি থাকে, পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে protest করার justificationও তেম্‌নি আছে।

আমার প্রতি আপনি এই অবিচার করেছেন যে, আমি যেন শাস্তি এড়াবার ভয়েই প্রতিবাদের ঝড় তুলতে চেয়েছি এবং সেই ফাঁকে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করেচি। কিন্তু বাস্তবিক তা' নয়। দেশের লোকে যদি প্রতিবাদ না করে আমাকে করতেই হবে। কিন্তু সে হৈ চৈ করে নয়, আর একখানা বই লিখে।

আপনি নিজে বহুদিন যাবৎ দেশের কাজে লিপ্ত আছেন, দেশের বাহিরের অভিজ্ঞতাও আপনার অত্যন্ত বেশি, আপনি যদি শুধু আমাকে এইটুকু আদেশ দিতেন যে এ বই প্রচারে দেশের সত্যকার মঙ্গল নেই, সেই আমার সান্ত্বনা হোতো। মানুষের ভুল হয়, আমারও ভুল হয়েছে মনে করতাম।

আমি কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাব নিয়ে এ চিঠি আপনাকে লিখি নি, যা মনে এসেছে তাই অকপটে আপনাকে জানালাম। মনের মধ্যে যদি কোন ময়লা আমার থাক্‌তো আমি

B. N. Ry স্ট্রাইক তেমনিই চলেছে,—কলকাতায় পৌছতে প্রায় ৬।৭ ঘণ্টা লাগে এবং ফেরা সুকঠিন।

আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি ৬ই ফাল্গুন ১৩৩৩

সামতাবেড়, পানিত্রাস
জেলা—হাবড়া

বিজু, তোমার পাঠানো বইখানা[১] পেয়েছি। ধন্যবাদ।

এই চিঠিখানা[২] তোমাকে পাঠালাম কারণ আত্মশক্তির বর্ত্তমান

চুপ করেই যেতাম। আমি সত্যকার রাস্তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি, তাই সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে নির্ব্বাসনে বসে আছি। অর্থে সামর্থ্যে সময়ে কত যে গেছে সে কাউকে জানাবার নয়। দিনও ফুরিয়ে এলো, এখন সত্যিকার কিছু একটা করবার ভারি ইচ্ছে হয়।

উত্তেজনা অথবা অজ্ঞতা বশতঃ এ পত্রের ভাষা যদি কোথাও রূঢ় হয়ে থাকে আমাকে মার্জ্জনা করবেন। আপনার অনেক ভক্তের মাঝে আমিও একজন, সুতরাং কথায় বা আচরণে আপনাকে লেশমাত্র ব্যথা দেবার কথা আমি ভাবতেও পারি নে। ইতি ২রা ফাল্গুন ১৩৩৩।

সেবক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১। শরৎচন্দ্র ফরাস ভাষা কুছু কিছু জানতেন। তাই তিনি পড়বার জন্য মূল ফরাসী ভাষায় লেখা মোঁপাসার "লে কুঁজে দলা করনেল" (The cousins of the colonelle) এবং "বেলামি" (Bel-Ami) বই দুখানি কিনে উমাপ্রসাদবাবুকে পাঠিয়ে দেবার জন্য বলেছিলেন। উমাপ্রসাদবাবু তখন মোঁপাসার "লে কুঁজে দলা করনেল" বইখানি পাননি, মাত্র "বেলামি" বইখানি পেয়েছিলেন এবং এই বইখানিই তিনি সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

২। "আত্মশক্তি" পত্রিকার সম্পাদককে লেখা চিঠি। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৩৩৪ সালের ৩০শে ভাদ্র তারিখের "আত্মশক্তি" পত্রিকায় মুসাফির লেখা "সাহিত্যের মামলা" নামক প্রবন্ধের পত্রাকারে প্রতিবাদ।

সম্পাদকের[১] সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। তুমি যদি তাঁকে বলে কিম্বা উপীনকে[২] বলে কয়ে এটা আত্মশক্তিতে ছাপানোর ব্যবস্থা করতে পারো ত বড় ভাল হয়। আমার হাতের লেখা M. SSটা তুমি চেয়ে নিয়ে নিজের কাছে রেখো।

আর যদি ছাপাতে তাঁরা সম্মত না হন ত লেখাটা তোমার কাছেই রেখো, পরে দেখা যাবে। ৫ই আশ্বিন, '৩৪—দাদা

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণবরেষু,

বিজু, তোমার চিঠি পেলাম। বঙ্গবাণীতে গিরিজাবাবুর প্রতিবাদ, বিচিত্রায় নরেশবাবুর জবাব এবং শনিবারের চিঠিতে সজনীকান্তর মন্তব্য সবই পড়েছি[৩]। নরেশবাবু পণ্ডিত মানুষ, বেশ গুছিয়ে অনেক কথারই

১। গোপাললাল সান্যাল।

২। বিপ্লবী ও সাংবাদিক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি শরৎচন্দ্র ও গোপাললাল সান্যাল—উভয়েরই বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

৩। ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ মাসের "বিচিত্রা" পত্রিকায় "সাহিত্যের ধর্ম" নামে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি আধুনিক সাহিত্যের আব্রুতা ও বে-আব্রুতার কথা আলোচনা করে কয়েকজন আধুনিক সাহিত্যিকের প্রতি কটাক্ষ করেছিলেন। যদিও রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে কোনও ব্যক্তি বিশেষের নাম ছিল না, তবুও শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত "সাহিত্য-ধর্মের সীমানা" নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্ত প্রবন্ধের একটি প্রতিবাদ লেখেন। নরেশবাবুর এই প্রতিবাদটি বিচিত্রার পরবর্তী সংখ্যা অর্থাৎ ভাদ্র সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ও নরেশচন্দ্রের এই বাদপ্রতিবাদের সময় কেউ কেউ শরৎচন্দ্রকে এ সম্বন্ধে তাঁর কি মত তা প্রকাশ করতে বলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র প্রথমে এই বাদানুবাদের

জবাব দিয়েছেন। আমার আর ২।১টা কথা বলবার ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোন সম্পর্কেই আর থাকতে ইচ্ছে হয় না। এমন কি ভয় হয়। আমাকে অযাচিত তিনি যত অপমান করেছেন পাছে তারই একটা উল্টো ছায়া আমার লেখার মধ্যে দেখা দেয়। নরেশবাবু যে সম্মান রক্ষা করে তাঁর প্রতিবাদ করেছেন পাছে আমি ততটা না পেরে উঠি। রবিবাবুর সে চিঠি আমি ভুলতে পারি নি, কোনদিন পারবো বলেও ভরসা হয় না[১]।

তবুও এ কথা তোমার সত্য যে আমারও একটা স্পষ্ট মতামত প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক, বিশেষতঃ, এই শনিবারের চিঠির পরে। সজনীকান্ত আমার ও তাঁর নিজের মতামতের সঙ্গে অনেকটা জড়িয়ে তুলে যে কথাগুলো লিখেচেন আমি ঠিক ঐ কথাগুলোই বলেছি কিনা স্মরণ করতে পারিনে কিন্তু আমার বাস্তবিক অভিমতের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। এবং একটু বেশি রকমই আছে। আচ্ছা, আমি নিজের একটা অভিমত লিখে তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। প্রকাশ কোরো। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। শ্যামাপ্রসাদ কেমন আছে?

ইতি—১০ই ভাদ্র, '৩৪

দাদা

মধ্যে প্রবেশ করতে রাজী হন নি। তবে ঐ সময় শনিবারের চিঠির ভাদ্র সংখ্যায় শ্রীসজনীকান্ত দাস আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের কি মত তা প্রকাশ করেছিলেন। সজনীবাবু একসময় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর এই অভিমতটি জেনে নিয়েছিলেন। সজনীবাবু শনিবারের চিঠিতে শরৎচন্দ্রের কি মত প্রকাশ করে দিলে, তখন শরৎচন্দ্র একরূপ বাধ্য হয়েই "সাহিত্যের রীতি ও নীতি" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই লেখাটি ১৩৩৪ সালের আশ্বিন সংখ্যা "বঙ্গবাণী"তে প্রকাশিত হয়েছিল।

১। রবীন্দ্রনাথ "পথের দাবী" পড়ে শরৎচন্দ্রকে যে চিঠিখানি দিয়েছিলেন।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণবরেষু,

সেই জন্যেই তোমার নাম বুঝি বিজু? বিজয়ার দিনে জন্ম বলে? আমার আশীর্ব্বাদ জেনো। ২১শে আশ্বিন '৩৪

দাদা

পুঃ—

কেউ কেউ অতিশয় দুঃখিত হয়ে জানিয়েছেন রবিবাবুকে আমার ও রকম কঠিন কথা লেখা উচিত হয়নি। আমার লেখার মধ্যে নাকি শ্লেষ পর্য্যন্ত আছে, তাঁর অতি ভক্তদের প্রতি হয়ত আছে, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কোথায়—অযথা বিদ্রূপ বা আক্রমণ আছে আমি ত আরও একবার পড়েও খুঁজে পেলাম না। তুমি পেয়েছ? মানুষগুলো কি নির্ব্বোধ। তাই ভাবি।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

বিজু, তোমার কাছ থেকে বহুকাল পরে চিঠি পেয়ে বড় আনন্দ লাভ করেছিলাম। যাবার সময়ে যদি একবার দেখা করে যেতে কি জানি, হয়তো বা সত্যিই যাবার চেষ্টা কোরতাম। বহুদিন থেকে আমার বদরীকাশ্রম দেখবার সাধ ছিল, কিন্তু হয়ে উঠ্‌লো না। এবারের মত এ ইচ্ছে স্থগিত রইল! কারণ ইচ্ছে করবার বয়সটাও পার হয়ে গেছি।

তুমি লিখেছিলে ১৬ই মের আগে চিঠির জবাব দিতে। আজ ১৫ই মে। আশা করি এ চিঠি তোমার হাতে পৌঁছুবে। তোমার

চিঠি পাবার পরে থেকে অনেকবার মনে হয়েছে তোমার মা সঙ্গে ছিলেন, আমাদের কারও খাবার অভাবটা হোতো না। মস্ত সুযোগ বয়ে গেল।

আমার শরীর তেম্‌নিই চলচে। এ আর ভালো হোল না। আজকাল ডাক্তাররা বল্‌চেন এ হয়েছে আপনার শাপে বর। প্রাচীনকালে এ একটা Safety valve.

জ্বালা-যন্ত্রণা তো নেই, এখন আমিও ভাব্‌তে সুরু করেছি এ একপ্রকার সুবিধেই হয়েছে।

তুমি বাড়ী আসার পরে যদি সময় পাও একবার এদিকে এসো। তোমার কাছে গল্প শোনা যাবে।

শুনেচি, ওদিকে নাকি চমৎকার লাঠি পাওয়া যায়। যদি মনে থাকে একটা আমার জন্যে এনো।

আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। প্রার্থনা করি তোমাদের যাওয়া-আসা যেন নির্ব্বিঘ্ন হয়। ইতি—১৫ই মে। ১৯২৮

দাদা

পরম কল্যাণবরেষু,

বিজু তোমার চিঠি পেলাম। আমার স্নেহ এবং আশীর্ব্বাদ জেনো।

কালিয়া (যশোর) থেকে পরশু রাত্রে ফিরেচি, আজ বাড়ী যাচ্চি। কাল আমার লোকান্তরিত মেজ ভাই বেদানন্দর মৃত্যুর দিন। তার সমাধির কাছে দু-পাঁচ জনকে নিয়ে বসতে হয়। দেশের দশজন খায়দায়, কীর্ত্তন করে। এই জন্যে যাওয়া। ৮।১০ দিন পরে ফিরবো। ৯ই কার্ত্তিক ১৩৪১

তোমাদের শুভার্থী

দাদা

২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড, কালীঘাট
২রা আশ্বিন ১৩৪৩

পরম কল্যাণীয়েষু,

বিজু, কাল বিধান ডাক্তার কুইনিন injection দিয়েছেন। শরীরের যে অংশে ভার দিয়ে মানুষে বেশ সুস্থ হয়ে বসে ঠিক সেই যায়গায়। উঃ কি এর ব্যথা। নুনের পুঁটুলি এবং ভাঙা একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন নিয়ে সকাল থেকে বসে আছি। বেশিদিন ওখানে থেকো না, নইলে ফিরে এসে তোমার জন্যেও হয়ত এম্‌নি ব্যবস্থা করতে হবে! মুর্শিদাবাদে[১] যাবার দুর্বুদ্ধি যে তোমার মাথায় কে দিলে তাই ভাবি। অন্যান্য কুশল।

শুভার্থী—দাদা

২৪ আশ্বিন দত্ত রোড, কালীঘাট
কলিকাতা। ১১ই কার্ত্তিক ১৩৪৩

কল্যাণীয়েষু,—বিজু, কাল বাড়ী থেকে এখানে এসে তোমার চিঠি পেলুম। তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হলো তার কারণ বড় বৌ[২] নিওমোনিয়ায় শয্যাগত হয়েছেন সেখানে খবর গিয়ে পৌঁছলো। তবে বাড়াবাড়ি ব্যাপার নয়,—আশা হয় শীঘ্রই সেরে উঠবেন। নইলে গরীব মানুষ, কলকাতার চিকিৎসার বিরাট ব্যয়ভার বইতে পারব না।

আমার একষট্টি বছরের প্রারম্ভকে কবি আশীর্ব্বাদ[৩] করেছেন।

১। মুর্শিদাবাদে উমাপ্রসাদবাবুর আত্মীয়-বাড়ী।

২। শরৎচন্দ্রের স্ত্রী শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

৩। রবিবাসরের উদ্যোগে উদয়ন-সম্পাদক অনিলকুমার দে সাহিত্যবন্ধুর বেলিয়াঘাটাস্থ "প্রফুল্লকানন" নামক উদ্যানবাটীতে শরৎচন্দ্রের ৬১তম জন্মতিথি উদ্‌যাপিত

অকৃপণ ভাষায়, মন খুলে মঙ্গল কামনা করেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় যেটুকু প্রকাশিত হয়েছিল সেটা তোমাকে পাঠালাম। তাঁর নিজের হাতের লেখাটি আমাকে দিয়েছেন, তুমি এলে তাঁর অন্যান্য

হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই সভায় উপস্থিত ক সদি এক লিখিত অভিভাষণে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সুবিধামত ৩১শে ভাদ্র সভা না হয়ে ২৫শে আশ্বিন তারিখে সভার অনুষ্ঠান হয়েছিল। কবির সেই অভিনন্দনবাণীটি এই সঙ্গে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা গেল—

কল্যাণীয় শরৎচন্দ্র,

তুমি জীবনের নির্দ্দিষ্ট পথের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উত্তীর্ণ হয়েছো। এই উপলক্ষে তোমাকে অভিনন্দিত করবার জন্যে তোমার বন্ধুবর্গের এই আমন্ত্রণ সভা।

বয়স বাড়ে, আয়ুর সঞ্চয় ক্ষয় হয়, তা নিয়ে আনন্দ করবার কারণ নেই। আনন্দ করি যখন দেখি জীবনের পরিণতির সঙ্গে জীবনের দানের পরিমাণ ক্ষয় হয়নি, তোমার সাহিত্যরস-সত্রের নিমন্ত্রণ আজও রয়েছে উন্মুক্ত, অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ভরে উঠবে তোমার পরিবেশনপাত্র, তাই জয়ধ্বনি করতে এসেছে তোমার দেশের লোক তোমার দ্বারে।

সাহিত্যের দান যারা গ্রহণ করতে আসে তারা নির্ম্মম! তারা কাল যা পেয়েছে তার মূল্য প্রভূত হলেও আজকের মুঠোয় কিছু কম পড়লেই ভ্রূকুটি করতে কুণ্ঠিত হয় না। পূর্ব্বে যা ভোগ করেছে তার কৃতজ্ঞতার দেয় থেকে দান কেটে নেয় আজ যেটুকু কম পড়েছে তার হিসাব করে। তারা লোভী, তাই ভুলে যায় রসতৃপ্তির প্রমাণ-ভরা পেট দিয়ে নয়, আনন্দিত রসনা দিয়ে; নতুন মাল বোঝাই দিয়ে নয়, স্বাদের চিরন্তনত্ব দিয়ে; তারা মানতে চায় না রসের ভোজে স্বল্প যা তাও বেশী; এক যা তাও অনেক।

এটা জানা কথা যে, পাঠকদের চোখের সামনে সর্ব্বদা নিজেকে জানান্ না দিলে পুরোনো ফটোগ্রাফের মত জানার রেখা হলদে হয়ে মিলিয়ে আসে। অবকাশের ছেদটা একটু লম্বা হলেই লোকে সন্দেহ করে যেটা পেয়েছিল সেটাই ফাঁকি, যেটা পায়নি সেটাই খাঁটি সত্য। একবার আলো জ্বলেছিল, তারপরে তেল ফুরিয়েছে—অনেক

পত্রের মতো এখানিও তোমাকে রাখতে দেবো। তখন কিন্তু এই পত্রাংশটুকু আমাকে ফিরিয়ে দিও। আমি ভালো নই বটে, তবে পূর্ব্বের চেয়ে অনেক সেরে গেছি। জ্বরটা গেছে। তুমি আমার

লেখকের পক্ষে এইটেই সব চেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি। কেননা আলো জ্বালাটাকে মানুষ অশ্রদ্ধা করতে থাকে তেল ফুরোনোর নালিশ নিয়ে।

তাই বলি, মানুষের মাঝ-বয়স যখন পেরিয়ে গেছে তখনো যারা তার অভিনন্দন করে তারা কেবল অতীতের প্রাপ্তি স্বীকার করে না, তারা অনাগতের পরেও প্রত্যাশা জানায়। তারা শরতের আউষ ধান ঘরে বোঝাই করেও সেই সঙ্গে হেমন্তের আমন-ধানের পরেও আগাম দাবী রাখে। খুসি হয়ে বলে, মানুষটা এক-ফসলা নয়।

আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনের মূল্য এই যে, দেশের লোক কেবল যে তাঁর দানের মনোহারিতা ভোগ করেছে তা নয়, তার অক্ষয়তাও মেনে নিয়েছে। ইতস্ততঃ যদি কিছু প্রতিবাদ থাকে তো ভালোই, না থাকলেই ভাবনার কারণ—এই সহজ কথাটা লেখকেরা অনেক সময়ে মনের খেদে ভুলে যায়। ভালো লাগতে স্বভাবতই ভালো লাগে না এমন লোককে সৃষ্টিকর্ত্তা যে সৃজন করেছেন। সেলাম করে তাদেরও তো মেনে নিতে হবে—তাদের সংখ্যাও তো কম নয়। তাদের কাজও আছে নিশ্চয়ই। কোনো রচনার উপরে তাদের খর কটাক্ষ যদি না পড়ে তবে সেটাকে ভাগ্যের অনাদর বলেই ধরে নিতে হবে। নিন্দার কুগ্রহ যাকে পাশ কাটিয়ে যায়, জানব প্রশংসার দাম বেশি নয়। আমাদের দেশে যমের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে বাপ মা ছেলের নাম রাখে এককড়ি দুকড়ি। সাহিত্যেও এককড়ি দুকড়ি যারা তারা নিরাপদ। যে লেখায় প্রাণ আছে প্রতিপক্ষতার দ্বারা তার যশের মূল্য বাড়িয়ে তোলে তার বাস্তবতার মূল্য। এই বিরোধের কাজটা যাদের তারা বিপরীত-পন্থার ভক্ত। রামের ভয়ঙ্কর ভক্ত যেমন রাবণ।

জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মিসমবায়ে গড়া, নানা কক্ষ পথে নানা বেগে আবর্ত্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয় রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন

আশীর্ব্বাদ নিও এবং দাদারা যদি কেউ থাকেন আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা দিও।

শুভার্থী—

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

করে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরান আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুসি হয়েছে এমন আর কারো লেখায় তারা হয়নি। অন্য লেখকেরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে কিন্তু সর্ব্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায়নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।

আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনে বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করতে পারতুম যদি তাঁকে বলতে পারতুম তিনি একান্ত আমারি আবিষ্কার, কিন্তু তিনি কারো স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞানপত্রের জন্যে অপেক্ষা করেন নি। আজ তাঁর অভিনন্দন বাংলা দেশের ঘরে ঘরে স্বত-উচ্ছ্বসিত। শুধু কথা-সাহিত্যের পথে নয়, নাট্যাভিনয়ে চিত্রাভিনয়ে তাঁর প্রতিভার সংস্রবে আসবার জন্যে বাঙালীর ঔৎসুক্য বেড়ে চলেছে। তিনি বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।

সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে। চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয়, কল্পনাশক্তির পূর্ণ দৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্য্যাদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই স্রষ্টা সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি। তিনি শতায়ু হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করুন—তাঁর পাঠকের দৃষ্টিকে শিক্ষা দিন মানুষকে সত্য করে দেখতে, স্পষ্ট করে মানুষকে প্রকাশ করুন তার দোষে-গুণে ভালোয়-মন্দয়,—চমৎকারজনক শিক্ষাজনক কোনো দৃষ্টান্তকে নয়—মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠিত করুন তাঁর স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায়।

২৫শে আশ্বিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৪৩

[শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লেখা]

পানিত্রাস পোষ্ট, গ্রাম সামতাবেড়,
হাবড়া জেলা। ২২শে ভাদ্র ১৩৩৩

মণ্টুরাম,—তোমার বই এবং ছোট্ট চিঠিখানি পেলাম। কাল দিনে রেতে বইখানি প'ড়ে শেষ করলাম। চমৎকার লাগ্‌লো। তবে দু'-একটা ক্রটিও আছে। ভারতের বড় বড় গাইয়ে বাজিয়ের মধ্যে আমার নাম না দেখতে পেয়ে কিছু ক্ষুণ্ণ হোলাম। তবে নিশ্চয় জানি এ তোমার ইচ্ছাকৃত নয়, অনবধানতাবশতঃই হয়ে গেছে, এবং ভবিষ্যতে এ ভ্রম যে তুমি শুধ্‌রে দেবে তাতেও আমার লেশমাত্র সংশয় নেই। ওটা দিয়ো, ভুলো না। রায় বাহাদুর মজুমদার মশায়ের রাঙা জবা মুটো মুটো মুটোর উল্লেখ কই? ওটাও চাই। কারণ, তিনিও ক্ষুণ্ণ হয়েছেন ব'লেই আমার বিশ্বাস। এ তো গেল বইয়ের ক্রটির কথা, একটা মত-ভেদের বিষয়ও আছে। তুমি পূজনীয় রবিবাবুর একটা উক্তি তুলে দিয়েছ যে "আমরা সর্ব্বসাধারণকে অশ্রদ্ধা করি ব'লেই তাদের চিঁড়ে মুড়কির বরাদ্দ করি বাইরের প্রাঙ্গণে আর সন্দেশগুলো বাঁচিয়ে রাখি" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই কথাটা শুনতে ভালো এবং যিনি লেখেন তাঁরও মানসিক ঔদার্য্য এবং নিরপেক্ষতাও প্রকাশ পায় সত্য, কিন্তু আসলে এতবড় ভুল বাক্যও আর নেই। শিক্ষা সভ্যতা এবং কালচারের জন্য সন্দেশই চাই, চিঁড়ে মুড়কি খাওয়াবার চেষ্টা করলে তারা পেট কামড়ানিতে সারা হয়। আর সর্ব্বসাধারণ মানেই ছোটলোক। তারা চিঁড়ে মুড়কিতেই thrive করে। একটা concrete দৃষ্টান্ত নাও। সাধারণ মানে ছোটলোক, মা—ও ছোটলোক। এই মা—র

পয়সা হওয়ায় ও তোমাদের মত দু'চার জনের প্রশ্রয় পাওয়ায় আজকাল তারা 3rd class ছেড়ে 2nd class compartmentএ উঠতে আরম্ভ করেছে। (1st classএ সাহেবের ভয়ে ওঠে না এই যা কতক রক্ষে) আচ্ছা, কোন compartmentএ জন দুই তিন মা—কে ঘণ্টা ৩।৪ ঢুকিয়ে রাখবার পরে আর সাধ্য নাই কারও যে সে ঘর ব্যবহার করে। হাতে-মাটির জন্যে এক ঝুড়ি মাটি থেকে সুরু ক'রে ছোলাসেদ্ধ, পকোড়া, থুথু, গয়ার এবং হেগে মুতে এমন কাণ্ড ক'রে রেখে বেরিয়ে যাবে যে সে দৃশ্য যে দেখেচে সে আর ভুলবে না। আসল কথা, অন্দরে শোবার ঘরে ব'সে সন্দেশ ভোজন করার যোগ্যতা আগে অর্জ্জন করা চাই। নইলে অন্দরের দোর খোলা পেয়ে একবার তারা জিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ ক'রে ঢুকে পড়লে আমরা আর বাঁচবো না। অতএব এরূপ অশ্রদ্ধেয় বাক্য আর কখনো বোলো না।

তোমার concertএ যেতে পারি নি শরীর একটু অসুস্থ ছিল বলে। আরও একটা হেতু এই যে, মেদিনীপুরের···প্রতি বৎসরেই কোথাও-না-কোথাও বন্যা হবেই। হ'তে বাধ্য। Govt. তার কোন উপায় করে না করবে না। এ হয়েছে দেশের উপরে একটা স্থায়ী tax, এমন কোরে বছর বছর বন্যাপীড়িতের সাহায্য করার সার্থকতা কি? Govt.কে তারা একটা কথা জোর ক'রে বলবে না, এক কোদাল মাটি কেটে রেলের রাস্তা ভেঙে যে জল বার ক'রে দেবে তা দেবে না, পাছে সাহেবরা ধ'রে জেলে দেয়। তারা জানে কলকাতার ভদ্র লোকের মহাকর্ত্তব্য হচ্চে তাদের খাওয়া পরা দেওয়া, যেহেতু তাদের ঘরে দোরে জল উঠেছে। তাছাড়া পদ্মার চরে মো—রা কেন দল বেঁধে বাস করে জানো? শুধু এই জন্যে যে বর্ষায় তাদের ঘর দোর ভেসে গেলেই পশ্চিমবঙ্গের ভদ্রলোকদের টাকা দিতে হবে। শুধু out

of malice এবং spite তারা গিয়ে ঐ রকম ভয়ানক যায়গায় বাস করেছে। এ ছাড়া তাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। আমি নিশ্চয় জানি এ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমার কোনপ্রকার মতভেদ হবার আশঙ্কা নেই! কারণ, তুমি বুদ্ধিমান, যা সত্যি কথা তা বুঝবেই।

তুমি বিলেত যাচ্চো খবরের কাগজে দেখলাম। আশীর্ব্বাদ করি তোমার যাত্রা নির্ব্বিঘ্ন হোক্, উদ্দেশ্য সফল হোক্। আমার বয়স হয়েছে, ফিরে এসে যদি আর দেখা না হয় এই কথাটি মনে রেখো আমি চিরদিন তোমার শুভকামনা ক'রে গেছি। আশা করি তোমার কুশল।—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুঃ—আগামী ৩১শে ভাদ্র আমার বয়স পঞ্চাশ হবে। ১লা আশ্বিন যাবো কলকাতায় তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট,
জেলা হাবড়া। ৬ই ফাল্গুন ১৩৩৩

পরম কল্যাণীয়েষু,—মণ্টু, তোমার চিঠি এবং টিকিট দুইই পেয়েছি। Concertএ যাবার সময় ছিল না, কারণ, চিঠি যখন পেলাম তখন যাবার উপায় নেই। কিন্তু ভারি ইচ্ছে ছিল বৃহস্পতিবারে তোমার বিদায়-উৎসবে যোগ দেবার। কিন্তু এদিকে B. N. Ry. ষ্ট্রাইক, গাড়ী নেই বললেই হয়! যাও বা আছে ৭।৮ ঘণ্টার কমে হাবড়ায় পৌছয় না। আর নাই-ই গেলাম। চোখের দেখা-শোনার এমনিই কি দরকার? এখান থেকেই সমস্ত মন দিয়ে আশীর্ব্বাদ করচি তোমার পথ যেন নির্ব্বিঘ্ন হয়, তোমার যাওয়া যেন সার্থক হয়।

আমি বিশেষ ভাল নেই, দেহটা নিয়তই ক্ষীণ এবং অপটু হয়ে আস্‌চে। তবু আশা আছে তুমি ফিরে এলে আবার দেখা হবে। তোমার

দুখানি বইই বড় মন দিয়ে পড়েছি। মনের পরশের শেষটি বড় মধুর। বুকের দরদ দিয়ে যে সংসারটা দেখতে শিখেচে তার লেখার ভিতরে যে কত ব্যথা, কত আনন্দ সঞ্চিত হয়ে ওঠে এ বইখানি পড়লে তা জানা যায়।

✓ তুমি সদাই ব্যস্ত, তোমার সময় কম; কিন্তু এবার ফিরে এসে তোমাকে লেখার দিকে একটু মন দিতে হবে। রচনার যে শিল্প বল, কৌশল বল, টেকনিক বল—এই বস্তুটা যা আছে তা আর একটুখানি যত্ন নিয়ে তোমাকে আয়ত্ত করতে হবে। কেবল লেখাই ত নয় ভাই, না-লেখার বিদ্যেটাও যে শিখতে হয়। তখন উচ্ছ্বসিত হৃদয় যে কথা শতমুখে বল্‌তে চায়, তাই শান্ত সংযত হয়ে একটুখানি গভীর ইঙ্গিতেই সম্পূর্ণ হয়ে আসে। মাঝে মাঝে এ চেতনা তোমার এসেছে, আবার মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হয়েছ। অর্থাৎ, পাঠকের দল এমনি কুড়ে যে তারা শত যোজন সিঁড়ি ভেঙ্গে স্বর্গে যেতেও চায় না যদি একটুখানি মাত্র ডিগবাজী খেয়ে নরকে গিয়েও পৌঁছতে পারে। এই হদিসটুকুই মনে রাখা রচনার সবচেয়ে বড় কৌশল।

আমার সস্নেহ আশীর্ব্বাদ রইল—তোমাদের শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট,
জেলা হাবড়া। ১৩ ফাল্গুন '৩৩

পরম কল্যাণবরেষু,—মণ্টু, তোমার চিঠি পেয়ে যে কত আনন্দ পেলাম তা তোমাকেও জানানো শক্ত। তুমি যে আমাকে শ্রদ্ধা কর, ভালবাসো এও যদি না বুঝ্‌বো ত বুঝবো সংসারে কি?

তোমার বিদায়-অভিনন্দনে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মুখে কি

কি হয়েছিল সব শুনেছি। তুমি বিদেশে যাচ্ছো, কিন্তু একটু শীঘ্র ক'রে ফিরে এসো! তুমি কাছাকাছি নেই মনে হ'লে কষ্ট হয়।

মনের পরশের শেষ অংশ অর্থাৎ তৃতীয় অংশটা যে আমার কত ভাল লেগেছিল তা বল্‌তে পারি নে। সত্যকার ব্যথা ও দুঃখের মধ্য দিয়ে সমস্ত পৃথিবীময় মানুষে যে মানুষের কত আপনার এই কথাটি কত সহজেই না তোমার বইয়ের শেষটুকুতে ফুটে উঠেছে। তাই আমার কেবলি মনে হয়েছিল তুমি বুঝি কার যথার্থ জীবনের দুঃখের কাহিনীটি লিপিবদ্ধ ক'রে গেছ। কিন্তু এই লিপিবদ্ধ করার প্রণালীটি তোমাকে আর একটুখানি যত্ন নিয়ে শিখতে হবে। তোমার বাবাকে আমি জানতাম না, তাঁর অন্তরঙ্গদের মুখে শুনি তাঁর মানুষের বেদনা বোঝবার অনুভূতি খুব বড় রকমের ছিল। এইটি হয়ত তুমি উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছ। তোমাকে এই বস্তুটিকে মনের মধ্যে দিবারাত্রি লালন ক'রে পূর্ণ মানুষ ক'রে তুল্‌তে হবে; তবেই ত হবে।

বেশ, আমার চিঠির মধ্যে থেকে যা ইচ্ছে তুমি প্রকাশ করতে পারো। অনুমতি দিলাম।

তুমি আমার অতিশয় স্নেহের জিনিস। আজ ব'লে নয়, অনেক দিন থেকে। বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আমার বাড়িতে এসে হৈ হৈ ক'রে লুচি খেয়ে যেতে, তখন থেকে।

তোমাকে আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে আশীর্ব্বাদ করি এ জীবনে তুমি সফল হও, নীরোগ হও, দীর্ঘজীবী হও। আশীর্ব্বাদক

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট,
জেলা হাবড়া। [আষাঢ় ১৩৩৫]

পরম কল্যাণীয়েষু,—মন্টু, কত দিন থেকে তোমার চিঠির জবাব দিতে পারি নি। না জানি কত রাগই তুমি কোরেছ। সেদিন তোমাদের থিয়েটার রোডের বাড়িতে গিয়েছিলাম। কিন্তু না ছিলে তুমি, না ছিলেন তোমার মাতুল তকু। সাহেবের বাড়ি, অপেক্ষা করা রীতি-বিরুদ্ধ কি না স্থির হোলো না। আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি পাকা লোক। দালালি কাজে সাহেবের বাড়িতে তাঁর যাতায়াত আছে। তিনি বললেন card রেখে যাওয়াই etiquette,—হাঁ ক'রে ব'সে থাক্‌লে এরা রাগ করে। কিন্তু card না থাকায় আমরা নিঃশব্দে ফিরে এলাম।

কালও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তোমার দুধারার অনেক জায়গা আর একবার পড়ে গেলাম। বাস্তবিকই বইখানি ভালো। অবহেলা কোরে যেমন-তেমন ভাবে প'ড়ে যাবার জিনিস নয়, মন দিয়ে পড়বার মতই বই। কিন্তু জান ত আজকাল প্রশংসাপত্রের দাম নেই। কারণ, কথার দাম যাঁদের আছে তাঁরা নিজেরাই তার অমর্য্যাদা করেন। তাই সহজে আমি কথা কই নে। কিন্তু আমার কথায় যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁদের সকলকেই বলি মন্টুর এ বইখানি যেন তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে আদ্যোপান্ত একবার প'ড়ে দেখেন। আমার নিজের তো পেশাই এই, তবুও এতে এমন ঢের কথা আছে যা আমিও ইতিপূর্ব্বে চিন্তা ক'রে দেখি নি।

'ভারতবর্ষে' [জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫] তোমার চাকর গল্পটা পড়লাম। গল্পের দিক দিয়ে এ তেমন ভালো হয় নি, কিন্তু একটা জিনিস দেখচি তোমার চমৎকার develope ক'রে উঠ্‌ছে সে তোমার dialogue। গল্প লেখবার কৌশল অথবা পদ্ধতি এবং এই dialogueএর ধারা,—

তোমার লেখায় যেদিন এ দুটোর একটা মিল হয়ে উঠ্‌বে সেদিন তুমি সত্যিই বড় সাহিত্যিক হবে। একটা কথা ভুলো না মন্টু, ✓ লেখার মধ্যে লিখে যাওয়াও যেমন শক্ত, লেখার মধ্যে না-লিখে থেমে থাকাও তেমনি শক্ত। কিন্তু এ বস্তুটা কাউকে শেখানো যায় না, আপনি শিখ্‌তে হয়। আমি নিশ্চয় জানি এ শিখে নিতে তোমার বাধবে না। আজ তোমাকে যারা বিদ্রূপ করে, তারাই এক দিন প্রকাশ্যে না হোক্ মনে মনেও এ সত্য স্বীকার করবে। আমাদের যাবার দিন নিকটবর্ত্তী হয়ে আস্‌চে, আমরা হয়ত এ চোখে দেখে যেতে পাবো না, কিন্তু তত দিন পরেও আমাকে যদি তোমার মনে থাকে তো আমার এই কথাটা তোমার স্মরণ হবে।

আ—র প্রবন্ধগুলো পড়লাম। ছেলেমানুষের লেখা,—এর ভাল মন্দ এখনো বিচার করবার সময় আসে নি। বয়সের সঙ্গে আড়ম্বরের আতিশয্যগুলো কেটে গেলে লেখা হয়ত এর ভালোই হবে। ছেলে বয়সের একটা মস্ত দোষ এই যে অনেক-বই-পড়ার অভিমানটা এদের পেয়ে বসে। তাই নিজের লেখার মধ্যে নিজের কিছুই থাকে না, থাকে শুধু মুখস্ত-করা পরের কথা। থাকে কারণে-অকারণে যেখানে-সেখানে গুঁজে দেওয়া বিদ্যের বাচালতা। মেয়েটিকে[১] তুমি অতো দ্রুতবেগে লিখ্‌তে বারণ কোরো। ✓ লেখার দ্রুতগতি কেরাণীর qualification—লেখকের নয়। এ কথা ভোলা উচিত নয়। অল্প বয়সে গল্প লেখা ভালো, কবিতা লেখা আরো ভালো, কিন্তু সমালোচনা লিখতে যাওয়া অন্যায়। তা উপন্যাসের ওপরেই হোক্, বা নারীর ওপরেই হোক্।

১। আশালতা সিংহ

"শরৎচন্দ্র ও গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি" প্রবন্ধ পড়লাম। গল্‌সওয়ার্দ্দি নামটাই শুধু শুনেচি, তাঁর কোন বই আমি পড়ি নি। সুতরাং তাঁর সঙ্গে কোথায় আমার মিল কোথায় গরমিল কিছুই জানি নে। প্রবন্ধের মধ্যে আমার সুখ্যাতি আছে আর আছে গল্‌সওয়ার্দ্দির রাশি রাশি কোটেশন্। তার থেকে কোন অর্থই আমার আদায় হোলো না। এইটুকুই বুঝলাম আ—তাঁর বই পড়েচেন এবং গল্‌সওয়ার্দ্দি ভদ্রলোক যেই হোন্ অনেক ভালো ভালো বচন দিয়ে গেছেন। এবং সে-সব পড়লে জ্ঞান জন্মায়।

মেয়েটি যে জীবনে সুখী নয় এ-কথা শুনে ক্লেশ বোধ হয়। কিন্তু এ সমাজে মেয়ে-জন্মের এম্‌নি অভিশাপ যে এর থেকে নিষ্কৃতিরও পথ নেই। মেয়েটির লেখা প'ড়ে মনে হয় ভারি বুদ্ধিমতী। কিন্তু জীবনে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে বস্তু পাওয়া যায় তার নাম অভিজ্ঞতা। শুধু বই প'ড়ে একে পাওয়া যায় না, এবং না-পাওয়া পর্য্যন্ত জানাও যায় না এর মূল্য কত। কিন্তু এ-কথাও মনে রাখা উচিত যে অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা প্রভৃতি কেবল শক্তি দেয়ই না, শক্তি হরণও করে। তাই বয়স কম থাক্‌তেই কতকগুলো কাজ সেরে নেওয়া উচিত। এই যেমন গল্প লেখা। আমি অনেক সময়ে দেখেচি কম বয়সে যা লেখা যায় তার অনেক অংশই আবার বয়স বাড়লে লেখা যায় না। তখন বয়সোচিত গাম্ভীর্য্য ও সঙ্কোচে বাধে। মানুষের মধ্যে শুধু লেখকই থাকে না। ক্রিটিক্‌ও থাকে। বয়সের সঙ্গে এই ক্রিটিকটিই বাড়তে থাকে। তাই বেশি বয়সে লেখক যখন লিখ্‌তে চায় ক্রিটিকটি প্রতি হাতে তার হাত চেপে ধরতে থাকে। সে লেখা জ্ঞান বিদ্যে বুদ্ধির দিক দিয়ে ত বড়ই হয়ে উঠুক রসের দিক দিয়ে তার তেমনি ত্রুটি ঘটতে থাকে। তাই আমার বিশ্বাস যৌবন উত্তীর্ণ

ক'রে দিয়ে যে-ব্যক্তি রস-সৃষ্টির আয়োজন করে, সে ভুল করে। মানুষের একটা বয়স আছেই যার পরে কাব্য বলো উপন্যাস বলো আর লেখা উচিত নয়। রিটায়ার করাই কর্ত্তব্য। বুড়ো বয়সটা হচ্চে মানুষকে দুঃখ দেবার বয়স, মানুষকে আনন্দ দেবার অভিনয় করা তখন বৃথা।

সেদিন বার্ট্রাণ্ড রসেলের An Outline of Philosophy বইখানি পড়লাম। এ বইখানি শক্ত, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতির বিশেষ জ্ঞান না থাক্‌লে সকল কথা ভালো বোঝা যায় না, বুঝতেও পারি নি। কিন্তু মুগ্ধ হয়ে যেতে হয় মানুষটির সরলতা দেখলে, এবং অনভিজ্ঞ মানুষকে সোজা ক'রে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা দেখে। আনাড়ি লোকদের ওপর এঁর অশেষ করুণা। আহা! এ বেচারারা দুটো কথা বুঝুক,—সত্যিকার এই ইচ্ছেটুকু যেন এঁর লেখার ছত্রে ছত্রে অনুভব করা যায়। ভাবি, যাঁরা বাস্তবিকই পণ্ডিত, জ্ঞানী তাঁদের লেখার সঙ্গে ফোক্কড়দের লেখার কতই না প্রভেদ। এটা কতই না স্পষ্ট হয়ে ওঠে এঁর লেখার পাশাপাশি H. G. Wellsএর লেখা পড়লে। এর কেবলই চেষ্টা বড় বড় কথা শুধু চালাকি আর ফুক্কড়ি ক'রে মেরে দেবো। রসেলের On Education বইটা কিনে এনেচি। ভাবচি কাল পোড়ব। আসচে বছরে যদি বিলেতে যাই শুধু এই লোকটিকে একবার দেখে আসবার জন্যেই যাব।

সেদিন জন কয়েক ছেলে এসে তোমার মনের পরশের ভারি সুখ্যাতি করছিলো। তারা বলে এ বইটির সম্বন্ধে আমি যা বলেছিলাম তা বাস্তবিক সত্য। শুনে বড় খুসি হয়েছিলাম।

মায়া[১] কেমন আছে? এখন তুমি কোথায় আছো ঠিক না জানার

১। দিলীপবাবুর ভগ্নী।

দরুণ তোমার মামার বাড়ির ঠিকানাতেই চিঠি দিলাম। আশা করি পাবে। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো।—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

Autographএর খাতাটা নিজে গিয়ে এক দিন দিয়ে আসবো। হারাই নি,—আছে। মালিককে জানিয়ে দিয়ো।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট,
জেলা হাবড়া। ১৩।৬।২৯

মণ্টু,—তোমার নামে তো আর ওয়ারেণ্ট ছিল না যে সাধু হ'তে গেলে? ব্যস্, আর না। এই পত্র পাবা মাত্র চ'লে আস্‌বে। আবার না হয় দিন কতক পরে যেয়ো ক্ষতি নেই। আমি অভিজ্ঞ ব্যক্তি, আমার কথাটা শুনো। তোমার বয়সে আমি চার-চার বার সন্ন্যাসী হয়েছি। ও অঞ্চলে বোধ করি মাছি আর মশা কম, নইলে হিন্দুস্থানী···দের পিটের চামড়া ছাড়া কার সাধ্য সে দংশন সহ্য করে। এ বাঙ্গালীর পেশা নয় বাপু, কথা শোন, চ'লে এসো। তুমি এলে এবার একসঙ্গে বর্ষার পরে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ একবার বেড়াতে যাবো। তুমি সঙ্গে না থাক্‌লে খাতির পাওয়া যাবে না, খাওয়া-দাওয়ারও তেমন সুবিধে ঘটবে না। কবে আস্‌চো পত্রপাঠ লিখে পাঠাবে। আমি ইষ্টিসানে যাবো।

আর একটি কথা। বারীন[১] শুনেছি যে-কোন গাছের পাতা তোমার নাকের ডগায় রগ্‌ড়ে দিয়ে যে-কোন ফুলের গন্ধ শুঁকিয়ে দিতে পারে। উপেন বাঁড়ুয্যে[২] বলে এটা সে কর্ত্তার[৩] কাছ থেকে মেরে

১। শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

২। বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। শ্রীঅরবিন্দের।

নিয়েচে। আসবার সময় এটা তুমি শিখে নেবে। হঠাৎ সে মান্‌বে না, কিন্তু ছেড়ো না। দিন কতক তার আন্দামানের বাঁশীর খুব তারিফ করতে থাকবে এবং বইখানা সর্ব্বদাই হাতে হাতে নিয়ে বেড়াবে। এবং এ-বই এত দিন যে পড়ো নি এই ব'লে মাঝে মাঝে তার সুমুখে অনুতাপ প্রকাশ করবে। খুব সম্ভব এই হ'লেই "বিভূতি"টা হস্তগত ক'রে নিতে পারবে। উত্তর-ভারত বেড়াবার সময়ে এটা বিশেষ কাজে লাগবে।

অনিলবরণ[১] শুনেছি নাকি মাটির গুঁড়োকে চিনি ক'রে দিতে পারে। বেশীক্ষণ থাকে না বটে, কিন্তু ৫।৭ ঘণ্টা চিনির মত দেখতেও হয়, খেতেও লাগে। এটাও নিশ্চিত শিখে আস্‌বার চেষ্টা কোরো। হঠাৎ টাকাকড়ি ফুরিয়ে গেলে পথে ঘাটে বিদেশে,—বুঝেচ ত? এটা শেখাই চাই। অনিলবরণ লোকটি সরল এবং ভালো মানুষ,—একান্তই যদি শেখাতে আপত্তি করে তো খুব ভূত পেত্নীর গল্প করবে। হলফ ক'রে বলবে যে পেত্নী তুমি চোখে দেখেচো। তারপরে ভাব্‌তে হবে না,—অনায়াসেই কৌশলটা মেরে নিতে পারবে আর এ দুটো সত্যিই যদি শিখে নিতে পারো ত ওখানে কষ্ট ক'রে থাক্‌বারই বা দরকার কি?

অনেক কাল তোমাকে দেখি নি। ভারি দেখবার ইচ্ছে হয়, গান শোনবার সাধ হয়। কবে আস্‌বে জানিয়ো। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো।—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুঃ—"বিভূতি" দুটো আদায় ক'রে আনাই চাই। সময়ে অসময়ে ভারি কাজে লাগে। যাই হোক্ শীঘ্র চলে এসো। সন্ন্যাসী হওয়া ভারি খারাপ মণ্টু, আমার কথা বিশ্বাস কর। আজকালকার দিনে কিচ্ছু মজা নেই। কবে আস্‌বে নিশ্চয় লিখো।

১। পণ্ডিচেরী আশ্রমের অনিলবরণ রায়।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট,
জেলা হাবড়া। ৪ঠা ফাল্গুন ১৩৩৭

পরম কল্যাণীয়েষু,—মণ্টু, তোমার চিঠি পেলাম। গোড়াতেই লিখেচো যে, বেশ বোঝা যাচ্চে যে আপনি আমার উপরে ক্রমেই অখুসি হয়ে উঠ্‌ছেন। অখুসির মানে যদি হয় বিরক্তি তাহ'লে উত্তরে বোল্‌বো নিশ্চয়ই না। আর অখুসির অর্থ যদি হয় গভীরভাবে ব্যথিত, তা'হলে বল্‌বো নিশ্চয়ই হাঁ। বস্তুতঃ, তোমাকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি, তাই যখনি মনে হয় দিন শেষ হয়ে আসছে, কিন্তু এ জীবনে আর তোমাকে দেখতে পাবো না তখন এমন একটা কষ্ট হয় যে সে তোমাদের সাধন-ভজন করার দলে কেউ বুঝবে না। সুতরাং, এ সকল কথার প্রয়োজন নেই। জীবনে অনেক দুঃখই নিঃশব্দে সয়ে গেছি, এও একটা।

তোমার চিঠির আবশ্যকীয় অংশগুলোর একটা একটা ক'রে জবাব দিই। তোমাদের নতুন কাগজ আমাকে পাঠিও। আমি ছাড়া পরিচিত যাঁরা, তাঁদেরও নেবার জন্যে ব'লে দেবো। তোমার লেখা বেরুবে, ওটা পড়বার আমার সত্যিই আগ্রহ হয়। তুমি লিখেচো সাহিত্য ব্যাপারে আমার কাছে তুমি ঋণী,— অন্ততঃ এর সংযম সম্বন্ধে। ঋণের কথা আমার মনে নেই, কিন্তু এই কথাটা তোমাদের অনেক বার বলেচি যে কেবল লেখাই শক্ত নয়, না-লেখার শক্তিও কম শক্ত নয়। অর্থাৎ, ভেতরের উচ্ছ্বাস ও আবেগের ঢেউ যেন নিরর্থক ভা'সয়ে নিয়ে না যায়। আমি নিজেই যেন পাঠকের সবখানি আচ্ছন্ন ক'রে না রাখি। অ-লিখিত অংশটা তারাও যেন নিজেদের ভাব, রুচি এবং বুদ্ধি দিয়ে পূর্ণ ক'রে তোলবার অবকাশ পায়। তোমার লেখা তাদের ইঙ্গিত করবে, আভাস দেবে, কিন্তু তাদের তল্পি হইবে না। জলধর-দা তাঁর কি-একটা বইয়ে মরা ছেলের বাপ মায়ের হয়ে পাতার পর পাতা এত কান্নাই

কাঁদলেন যে পাঠকেরা শুধু চেয়েই রইলো, কাঁদবার ফুরসৎ পেলে না। বস্তুতঃ, লেখার অসংযম সাহিত্যের মর্য্যাদা নষ্ট ক'রে দেয়। ...বাঁড়ুজ্যে চমৎকার লিখতেই পারেন কিন্তু চমৎকার না-লিখ্‌তে পারেন না। আর এক ধরণের অসংযম দেখতে পাই অ...র লেখায়। ছেলেটি লেখে ভালো, বিলেতেও গেছে,—এই যাওয়াটা ও একটা মুহূর্তের জন্যও ভুল্‌তে পারে না। বিলেতের ব্যাপার নিয়ে ওর লেখায় এমনি একটা অরুচিকর ভক্তিগদ্‌গদ্‌ 'আদেক্‌লে-পণা' প্রকাশ পায় যে পাঠকের মন উৎপীড়িত বোধ করে। আমার গিরীন মামাকে মনে পড়ে। একবার বৈষ্ণব মেলা উপলক্ষে আমরা শ্রীধাম খেতুরিতে গিয়েছিলাম। মামার বিশ্বাস ছিল খেতুরির প্রসাদ খেলে অম্বল সারে। ষ্টীমার থেকে গঙ্গার তীরে নেমেই মামা অ্যাঃ—ক'রে উঠলেন। দেখি ভয়ার্ত্তমুখে এক পা উঁচু ক'রে আছেন।

কি হোলো?

বড্ড কাঁচা শ্রীগু মাড়িয়ে ফেলেচি

তাঁর ভয় ছিল, ভক্তিহীনতা প্রকাশ পেলে হয়ত অম্বল সারবে না। তোমার দোলার ব্যাপারটাও বিলেতের সেদিন কয়েকটা অধ্যায় পড়েছিলাম। তাতে এই অহেতুক ভক্তিবিহ্বলতা, অকারণ, অসংযত বিবরণের ঘটাপটা নেই। মনে হয় এও বিলেতে গেছে, জানেও অনেক কিছু কিন্তু জানানোর মাতামাতি নেই। এইটুকু সর্ব্বদাই মনে রেখো মণ্টু। আমি আশীর্ব্বাদ করচি এক দিন তুমি বড় হবে। অ...র লেখার সম্বন্ধে আমার অভিমত কেউ যদি challenge ক'রে বলে কই দেখাও দিকি? আমাকে প্রত্যুত্তরে হয়ত শুধু এই কথাই বল্‌তে হবে যে, এ-সব জিনিস এমন কোরে দেখানো যায় না। ও রসজ্ঞ পাঠকের মন আপনি অনুভব করে। অ...দেবীর উপন্যাসে দেখতে পাবে বেদ বেদান্ত

উপনিষৎ পুরাণ কালিদাস ভবভূতি সবাই ঢোকবার জন্যে যেন ঠেলাঠেলি লাগিয়ে দেয়। ছত্রে ছত্রে গ্রন্থকারের এই মনোভাবটি ধরা পড়ে,—ত্যাখো তোমরা, আমি কি বিদুষী! কি পড়াটাই পড়েছি, কি জানাটাই জেনেছি। এই আতিশয্য যেন কোনমতেই না লেখার মধ্যে ধরা পড়ে। ওদের এম্‌নি সহজে আসা চাই যেন না এলেই নয়। এই না-এলেই-নয় জিনিসটাই লেখার বড় কৌশল। এ শেখানো যায় না—আপনি শিখিতে হয়। আর শেখা যায় শুধু সংযমের অভ্যাসে। পাঠককে তাক লাগিয়ে দেবার সদিচ্ছার বাহুল্যে তার স্বকীয় কল্পনার খোরাকে কখনো কৃপণতা কোরব না, এই তত্ত্বটি লেখবার সময়ে একটি মিনিটের জন্যেও ভুল্‌লে চল্‌বে না। অথচ, বড় ভাব, বড় তত্ত্ব, বড় idea, বড় প্রকাশ এই নিয়েই চলা চাই লেখা,—জল পড়ে, পাতা নড়ে, লাল ফুল, কালো জল আর জায়ে জায়ে ঝগড়া আর বৌয়ে বৌয়ে মনোমালিন্য কিম্বা প্রভাত মুখুয্যের বর্ণনার নিপুণতা,—ঘরের মধ্যে ক'টা আলমারি, ক'টা সোফা, প্রদীপে ক'টা শল্‌তে দেওয়া এবং আলনায় ক'টা এবং কি পাড়ের কোঁচানো শাড়ি—এ সকলের দিনও গেছে, প্রয়োজনও শেষ হয়েছে। ও কেবল লেখার ছলে সাহিত্যকে ঠকানো।

তোমার লেখার মধ্যে আজকাল আমি অনেক আশা অনেক ভরসা পাই। অথচ, মনের মধ্যে বেদনা বোধ করি যে এ তুমি ছেড়ে দিলে। আশ্রমে বাস ক'রে সে বস্তু কখনো হবে না। জীবনে যে ভালোবাসলে না, কলঙ্ক কিনলে না, দুঃখের ভার বইলে না, সত্যিকার অনুভূতির অভিজ্ঞতা আহরণ করলে না, তার পরের-মুখে-ঝাল খাওয়া কল্পনা সত্যিকার সাহিত্য কত দিন জোগাবে? নাকটেপা-প্রাণায়ামের যোগবলে আর-যা-কিছুই হোক্ এ বস্তু হবে না। নিজের জীবনটাই হোলো যার নীরস, বাঙ্‌লা দেশের বালবিধবার মতো পবিত্র, সে প্রথম যৌবনের

আবেগে যত কিছুই করুক, দু'দিনে সব মরুভূমির মত শুষ্ক শ্রীহীন হয়ে উঠ্‌বে। ভয় হয়, ক্রমশঃ হয়ত তোমার লেখার মধ্যেও অসঙ্গতি দেখা দেবে। সবচেয়ে জ্যান্ত লেখা সেই, যা পড়লে মনে হবে গ্রন্থকার নিজের অন্তর থেকে সবকিছু ফুলের মতো বাইরে ফুটিয়ে তুলেছে। দেখো নি বাঙ্‌লা দেশে আমার সব বইগুলোর নায়ক-নায়িকাকেই ভাবে এই বুঝি গ্রন্থকারের নিজের জীবন, নিজের কথা। তাই সজ্জন-সমাজে আমি অপাংক্তেয়। কতই না জনশ্রুতি লোকের মুখে মুখে প্রচলিত। আমার কথা যাক্। তোমার নিজের কথায় এক দিন আমি ভেবেছিলাম মণ্টু যে ব্যারিষ্টার হয়ে আসে নি সে ভালোই হয়েছে। না-ই করলে ও রাশি রাশি টাকা রোজগার, না-ই চ'ড়ে বেড়ালো মটরগাড়ী, না-ই হোলো হাই সার্কেলের কেও-কেটা। ওর অভাব নেই, যা-আছে বেশ চ'লে যাবে,—শুধু সঙ্গীত ও সাহিত্যে দেশকে অনেক কিছু যেন মণ্টু দিয়ে যেতে পারে। সে নিরানন্দ দেশের আনন্দের ভোজ,—সেই আমাদের ঢের। আমি আরও একটা কথা ভাব্‌তাম। মণ্টু এই যে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, ও অনেক জাত অনেক সমাজ অনেক লোকের সঙ্গে বাঙ্‌লা দেশের একটা স্নেহ ও শ্রদ্ধার বাঁধন বেঁধে দিচ্চে। ওকে সবাই চেনে, সবাই ভালোবাসে। মণ্টুর সঙ্গে গেলে কোথাও আদরের অভাব ঘট্‌বে না। কিন্তু সে আশা সে আনন্দে ছাই পড়লো। যার দেহের, মনের আনন্দের সামাজিকতার স্বাধীনতার সীমা ছিল না সে আজ এমনি দাসখৎ লিখে দিলে যে এক-পা বাড়াতে গেলেও আজ চাই ওর permission—ছাড়পত্র। এই হোলো ওর মুক্তির সাধনা। গেলো দেশ, রইলো ওর কাল্পনিক স্বার্থ—সেই হোলো ওর বড়ো। আমিও অনেক পড়েচি, অনেক দেখেচি, অনেক কিছু করেচি—এ কথা আমিও তো ভুল্‌তে পারি নে। তাই, যে যা বলে মেনে নিতে পারি নে, আমার বাধে। কিন্তু এ নিয়ে আলোচনা নিষ্ফল।

আমার ছেলেবেলার একটা কথা চিরদিন মনে থাকবে। মামার সঙ্গে স্যর গুরুদাসের বাড়ী দুর্গাপুজোর নেমতন্ন খেতে গেছি। গিয়ে দেখি গুরু-দাসের প্রচণ্ড ক্রোধে মাথার বড় বড় কেশর ফুলে উঠেচে। একজন ছাত্র নাকি বলেছিল গঙ্গাস্নানে পাপ ক্ষয় হয় সে বিশ্বাস করে না। গুরুদাস ক্ষিপ্ত হয়ে চীৎকার ক'রে বলচেন যে, স্নানের প্রয়োজন নেই, শুধু তীরে দাঁড়িয়ে গঙ্গা ব'লে গঙ্গা দর্শন করলে শুধু তার নিজের নয় সাত পুরুষ যে পাপমুক্ত হয়ে অক্ষয় স্বর্গ বাস করে এতে সন্দেহের অবকাশ কোন্‌খানে? কোন্ পাষণ্ড এ শাস্ত্রবাক্য অস্বীকার করতে পারে! বল্‌তে বল্‌তে তিনি রাগে বাড়ীর মধ্যে চ'লে গেলেন। মনে আছে সেই ছেলে বয়সেই মনে মনে বোললাম, এই গুরুদাস! সেকালের এম, এ-তে Mathematicsএ First, বড় উকিল, বড় Jurist, বড় জজ, University'র ভাইস-চ্যান্‌সেলার! ধার্ম্মিক, সত্যবাদী—তিনি ভণ্ডামি করেন নি, যা সত্য ব'লে বিশ্বাস করতেন তাই বলেছেন,—তাই এই ভীষণ ক্রোধ। দেখি এ নিয়ে Sir Oliver Lodgeএর সঙ্গেও তর্ক চলে না, আমার প্রজা গৌর মাঝির সঙ্গেও না। এ অন্ধ বিশ্বাস। তাকেই নানা যুক্তি, নানা কথার মার-প্যাঁচ লাগিয়ে সত্যি ব'লে মেনে নেওয়া। বিদ্যে-সিদ্যে থাক্‌লে কথায়-বার্ত্তায় রঙ্‌ চঙ্‌ লাগাতে পারে, না থাক্‌লে সোজা কথায় সহজ কোরে বলে। প্রভেদ ঐটুকু। ঐ Sir Gooroodas! তোমার কাছে এ-সব বলতেও ভয় হয়, কারণ সকলেই জানে যে আশ্রম-বাসীরা অত্যন্ত ক্রোধী হয়। তারা কথায় কথায় গাল-মন্দ ক'রে তেড়ে মারতে আসে।······কোন আশ্রমের পরেই আমি প্রসন্ন নই, কিন্তু কোন-একটা বিশেষ আশ্রমের পরেই আমার কিছু মাত্র বিদ্বেষ বা আক্রোশ নেই। আমি জানি ও সবই সমান। সবই ভূয়ো।

আশ্রম যাক্···আসল কথা তুমি নিজে। তোমাকে যে অত্যন্ত স্নেহ

করি এ মিথ্যে নয়। ভারি দেখতে ইচ্ছে হয়। গান্ শুন্তে গল্প করতে। ভারি বুড়ো হয়ে পড়েচি, আর কটা দিনই বা বাঁচবো, এদিকে আস্‌বে না একবার? আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট,
জেলা হাবড়া। ৩০শে বৈশাখ ১৩৩৮।

কল্যাণীয়েষু,—মণ্টু, দেশোদ্ধার করবার জন্যে সুভাষের দল আমাকে বলপূর্ব্বক কুমিল্লায় চালান্ ক'রে দিয়েছিল। পথে এক দল শেম শেম্ বল্লে, গাড়ীর জানালার ফাঁক দিয়ে কয়লার গুঁড়ো মাথায় গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে প্রীতি জ্ঞাপন করলে, আবার এক দল বারো-ঘোড়ার-গাড়ী চাপিয়ে দেড় মাইল লম্বা শোভাযাত্রা ক'রে জানিয়ে দিলে কয়লার গুঁড়োটা কিছুই নয়,—ও মায়া। যাই হোক্ রূপনারাণের তীরে আবার ফিরে এসেছি। "The liberated man has no personal hopes"—এ সত্য উপলব্ধি করতে আর আমার বাকি নেই। জয় হোক্ কয়লার গুঁড়োর। জয় হোক্ বারো-ঘোড়ার-গাড়ীর!

শেষপ্রশ্ন প'ড়ে খুসি হয়েছো শুনে ভারি আনন্দ পেলাম। কারণ, খুসি হবার তো তোমাদের নিয়ম নয়। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ এ বছর অক্ষয় তৃতীয়ায় আমাকে আর ডাক্‌লে না। তারা অনুরোধ করেছিল বইয়ের মধ্যে শেষের দিকে যেন আশ্রমের জয়গান করতে পারি। অথচ স্পষ্টই দেখা গেল পেরে উঠি নি। শেষ প্রশ্নে অতি-আধুনিক-সাহিত্য কি রকম হওয়া উচিত তারই একটুখানি আভাস দেবার চেষ্টা করেচি। "খুব কোরবো, গর্জ্জন কোরে নোঙরা কথাই লিখ্‌বো" এই মনোভাবটাই অতি-আধুনিক-সাহিত্যের central pivot নয়—এরই একটু নমুনা দেওয়া।

কিন্তু বুড়ো হয়ে গেছি, শক্তি-সামর্থ্য পশ্চিমে ঢ'লে পড়েছে—এখন তোমাদের ওপরেই রইলো এর দায়িত্ব। তোমার সমস্ত লেখাই আমি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়ি, রবীন্দ্রনাথ তোমার সম্বন্ধে যে-কথা চিঠিতে লিখেছেন সে সত্য। দ্রুত উন্নতি স্পষ্টই চোখে পড়ে। কিন্তু সে বাইরে থেকে কারও কৃপায় নয়,—তোমার নিজেরই সত্য সাধনায়। এবং রক্তের মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে যা পেয়েছিলে তারই ফল। পণ্ডিচারীতে না থেকে কলকাতায় ব'সেও ঠিক এমনিই হ'তে পারতো।

তুমি লিখেছিলে যে শ্রীঅরবিন্দ বলেন আমরা intellectual যুগের সন্তান। এ খুবই সত্যি। তোমার লেখার মধ্যে এই সত্যের অনেকখানি প্রকাশ ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠ্চে, কিন্তু এখনই এলো তোমার সাবধান হবার সময়। Dialogue ছোট হওয়া চাই, মিষ্টি হওয়া চাই,—কিছুতেই না মনে হয় এ প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা অক্ষরও বেশি ব'লেছে। এই হ'লো artistic formএর ভিতরের রহস্য। প্রথমে হয়ত মনে হবে আমার সব কথা বলা হোলো না, পাঠকেরা বোধ হয় ঠিক বক্তব্যটি ধরতে পারবে না, কিন্তু এখানেই হয় লেখকের মস্ত ভুল। না বোঝে বরঞ্চ সেও ভালো, কিন্তু বেশি বোঝাবার গরজ না লেখকের প্রকাশ পায়। বুঝলে তো? এই জন্যেই হয়ত কেউ কেউ বলে যে মণ্টুর লেখার মধ্যে তর্কাতর্কিটা মাঝে মাঝে প্রবল আকার ধারণ করে। যে পড়ে সে যদি ভেবে বোঝবার অবকাশ না পায় তো নিজের বুদ্ধির প্রমাণ পায় না। তখন রাগ করে। আমি কুঁড়ে মানুষ, চিঠি লিখতে ভয় পাই, কিন্তু তুমি যদি কাছাকাছি থাকতে তো তোমার লেখার এই জায়গাগুলো দেখিয়ে দিতে পারতুম। কতবার না তোমার লেখা পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, মণ্টু এইখানটায় এমনি করে যদি শেষ করতো।

আমার বয়েস হয়ে গেছে, রবীন্দ্রনাথেরও বয়েস হোলো, এখন মাঝে

মাঝে আশঙ্কা হয় এর পরে বাঙ্গলার উপন্যাস-সাহিত্যের স্থানটা হয়ত একটু নেমে পড়বে।

তোমার উপর আমার অনেক আশা মণ্টু। কারণ, নোঙরামিকেই যারা সাহসের পরিচয় ব'লে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে তুমি তাদের দলে নও; তোমার শিক্ষা ও culture এদের থেকে স্বতন্ত্র।

তোমার নতুন কবিতাগুলি মন দিয়ে পড়লাম। চমৎকার হয়েছে। আচ্ছা, অরবিন্দ কি বাঙলা পড়তে পারেন? শেষপ্রশ্ন পড়তে দিলে কি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন? জানি এ-সব পড়ার সময় নেই তাঁর,—কিন্তু পড়তে বলায় কি অপমান বোধ করবেন? প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ রেগে গেছে দেখেই ভয় হয়, নইলে তাঁর মত গভীর পণ্ডিত মানুষের মতামত জানতে পারলে আমার লেখার ধারাটা হয়ত আর একটা পথ খোঁজে। উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে যে মানুষকে অনেক কথা শুনতে বাধ্য করা যায় এ-কথা কি শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করেন না? যাকে হাল্কা সাহিত্য বলে তার প্রতি কি তাঁর অত্যন্ত বিরাগ?

ষোড়শী, রমা, হরিলক্ষ্মী তোমাকে পাঠিয়ে দেবো। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট,
জেলা হাবড়া। ৬ই ভাদ্র ১৩৩৮।

পরম কল্যাণীয়েষু,—মণ্টু, জবাব দিই নি ব'লে মনে কোরো না যে তুমি যা কিছু পাঠাও মন দিয়ে পড়ি নে। শ্রীঅরবিন্দর যা-কিছু ছোট ছোট message অথবা তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেন এবং তুমি আমাকে যত্ন ক'রে পাঠাও তা পড়ি, চিন্তা করি এবং আবার পড়ি। অবশ্য, বুঝ্‌তে পারি নে বেশির ভাগ তা স্বীকার করি। মাঝে মাঝে তিনি মন

চৈতন্য বা consciousnessএর এত বিভিন্ন এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্য্যায় বা স্তর নির্দ্দেশ করেন যে সে আমার বুদ্ধির অগম্য। তাঁর কবিতার সম্বন্ধেও মতামত আমি সব সময়ে মেনে নিতে পারি নে। উদাহরণের মত বলা যায় যে, তোমারই যে-কবিতাটিকে তিনি বলেছেন সবচেয়ে ভালো, আমার মনে হ'লো সেটি তোমারই অন্যান্য কবিতার চেয়ে নীচু দরের। তবে, এ-ও বলি যে সেই কয়টা কবিতাই বাস্তবিক ভালো,—ভাবে, ভাষায় এবং ছন্দে। তাদের মধ্যে বেছে নিয়ে নম্বর দিতে গেলে কারও সঙ্গেই কারও মতের ঐক্য হবে না। না-ই বা হোলো। কিছু দিন থেকে তুমি দেখ্‌চি বেশ মন দিয়েই সাহিত্য সাধনা সুরু করেছো, ফাঁকি দেবার চেষ্টা নেই, যা-তা যেমন-তেমন ক'রে যশের কাঙ্গালপনা নেই, এইবার তোমার সফলতা সুনিশ্চিত।

আমার জন্মতিথি উপলক্ষে যে গানটি তুমি রচনা ক'রে পাঠিয়েছো তা কবিতার দিক দিয়ে এবং হৃদয়ের দিক দিয়ে চমৎকার হয়েছে, কিন্তু অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট। সঙ্কোচ বোধ হয়। সেদিন এই নিয়ে নলিনী সরকারকে[১] বলেছিলাম,—মণ্টু বলে তুমি যদি গাও তো বেশ হয়। সে স্বর-লিপির জন্যে তোমাকে লিখবে বলেচে। আরও বেতার-বার্ত্তার কর্ত্তারা বলেন জন্মতিথির দিনে তাঁরা এই গানটা তোমার নাম ক'রে broadcast করবেন। গাইবে নলিনী। আচ্ছা, আমার ষোড়শী প্রভৃতি বইগুলো কি তোমার কাছে হরিভায়া[২] পাঠিয়েছেন? আমি চিঠি লিখে দিয়েচি।

আমার আর কিছু কিছু তোমাকে জানাবার ছিল কিন্তু আর সময় নেই, পোষ্টাফিস বন্ধ হয়ে যাবে।

১। বিজলী পত্রিকার সম্পাদক।

২। হরিদাস চট্টোপাধ্যায়।

তোমার সেই সব পুরানো কাগজ-পত্রগুলো কাল কিম্বা পরশু ফিরে পাঠাবো।

ভালো কথা,—'পরিচয়' ব'লে একখানা ত্রৈমাসিক অভিজাত শ্রেণীর কাগজ বেরিয়েছে। তাতে তোমার বন্ধু নী— শেষ-প্রশ্ন নিয়ে সমালোচনা করেছেন। পড়েচো বোধ হয়? তাঁর 'মোদ্দা' কথাটা এই যে যে-হেতু গোরা সাহেবের ছেলে সেই হেতু 'কমল'-চরিত্র গোরার নকল ছাড়া কার কিছু নয়। অর্থাৎ যে-হেতু নী—র চোখ দুটো কটা সেই হেতু তার বুদ্ধি ঠিক বেরালের মতো। দুঃখ এই যে এরাও কলম ধরে এবং তাও ছাপা হয়। কারণ নিজেদের কাগজ রয়েছে। অহঙ্কার এই যে ফরাসি জানি জার্ম্মান জানি। আবার শেষের দিকে অনুপ্রাসের ঝঙ্কারে প্রার্থনাটুকুও আছে—হে ভগবান্! রূপকার না হইয়া উপকার করেন— না এমনিই কি একটা।

কিন্তু আর সময় নেই এক মিনিটও। আশীর্ব্বাদ রইলো।—

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাবড়া
বিজয়া দশমী। ৪ঠা কার্ত্তিক ১৩৩৮

মণ্টু,—আমার বিজয়ার শুভাশীর্ব্বাদ জেনো। অনেক দিন চিঠি দিতে পারি নি তার জন্যে অনুতপ্ত হয়ে আছি।

প্রথমে কাজের কথাটা সেরে নিই। দোলার গোড়ার কয়েকটা পাতা এই সঙ্গে পাঠালাম। হলচালনার বহর দেখে হয়ত পত্রোত্তরেই জানাবে যে, "মশাই আপনার ভিক্ষেয় কাজ নেই কুত্তা বুলিয়ে নিন। আমার বাকি কাগজগুলো ফিরিয়ে পাঠান।" সে আশঙ্কা আমার যথেষ্ট আছে,

কিন্তু আমার তরফ থেকেও একটুখানি কৈফিয়ৎ যে নেই তা নয়। যথা—

কতকটা তোমার মতই আমি ঐ বুলিগুলো মানি নে। যেমন art for art's sake, ধর্ম্ম for ধর্ম্মের sake, truth for truth's sake ইত্যাদি। Artএর উপলব্ধি সকলের এক নয়, ওটা ভিতরের বস্তু, ওর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করতে যাওয়া এবং তারই পরে এক ঝোঁকা জোর দেওয়া অবৈধ। ধর্ম্ম, truth প্রভৃতি শুধু কথাই নয় তার চেয়ে বেশি কিছু; এটা সর্ব্বদা মনে রাখা চাই। গল্পের উদ্দেশ্য যদি চিত্ত-রঞ্জন করাই হয় তবুও এই factটা থাকে যে ওটা দুটো কথা। চিত্ত এবং রঞ্জন। (ডাক্তার) Dr. Jitendra Mojumdar, M. D. এবং মণ্টুরামের চিত্ত ঠিক এক পদার্থ নয়। একটা চিত্ত যাতে খুশিতে ভ'রে ওঠে অপরটা হয়ত তাতে কোন আনন্দই পাবে না। একজন বহুশিক্ষিত লোককে দেখেছি দুধারার ১৫।২০ পাতার বেশি এগুতেই পারলে না, কিন্তু আমার কি ক'রে যে বুইটা শেষ হয়ে গেল জানতেই পারলাম না। গল্প লেখার আইন ওতে কতখানি ভাঙা হয়েছে তা আমি জানিও নে জানবার ইচ্ছেও হয় নি। খুশি হয়েছিলাম তৃপ্তি পেয়েছিলাম এ একটা fact, অথচ যদি তর্ক করা হয় যে art যে কি সে আমি জানি নে বুঝি নে তাহ'লে চুপ ক'রে থাকবো নিশ্চয় কিন্তু এই ৫৬ বছর বয়সে নিজের মনকে সায় দেওয়া যাবে না কিছুতেই। সুতরাং লাঙ্গল চালাবার যুক্তি আমার ওসব নয়। যে-সকল কথা তুমি অত্যন্ত ভেবে লিখেচো তার যে দরকার নেই উপন্যাস লিখ্‌তে-তা বল্‌চি নে, কিন্তু আমার মধ্যে উপন্যাস-লেখার যে ধারণা আছে তার দিক থেকে মনে হয়েছে স্বপনের চরিত্রের বিচারে ওর শেষের দিকের সঙ্গে গোড়ার দিকের লেখাটা বেশ সামঞ্জস্য পায় নি। তাছাড়া বইটা ছোট করার দরকার গোড়ার দিকে। এটা হচ্চে একটা কৌশল;

পড়ার interest গোড়ার দিকে অন্ততঃ যেন ক্লান্ত হয়ে না পড়ে। আর একটা কথা মন্টু। লিখ্‌তে ব'সে লেখার চেয়ে না-লেখা যে ঢের শক্ত। ...বাঁড়ুযো সত্যিই বড় লেখক, কিন্তু না-লেখবার ইঙ্গিতটা ঠিক বুঝতে পারেন না, একি তাঁর বইয়ের মধ্যে দেখতে পাও না? তাঁর বই পড়তে গিয়ে অনেক সময়ে আমার কেবল এই আপশোষই হয়েছে...বাবু এই কৌশলটা যদি জান্‌তেন। একেই বলে লেখার সংযম। বলবার বিষয়বস্তু যেন আবেগের প্রখরতায় প্রয়োজনের বেশি এক পাও ঠেলে নিয়ে যেতে না পারে। বরঞ্চ এক পা পেছিয়ে থাকে সেও ভালো। তুমি নিজে যদি এত বাদ দেওয়া পছন্দ না করতে পারো তোমার ওখানেই কোন সাহিত্যিক বন্ধুকে দেখিয়ে তাঁর মত নিয়ো। অবশ্য এমনও হ'তে পারে যে যে-সব লেখা এখন কেটে দিয়েছি তার কিছু কিছু হয়ত আমিই আবার জুড়ে দেবো যখন বইয়ের শেষ পর্য্যন্ত পৌছব। যাই হোক তোমার অভিমত জানতে পারলে ভাল হয়। তখন খুব শীঘ্র সমস্তটা কেটে ছেঁটে বেঁড়ে ক'রে দিতে বেশি দেরি ঘট্‌বে না।

তোমার নী—র চিঠিগুলো খুব মন দিয়েই পড়েছিলাম। তুমি আমাকে শ্রদ্ধা করো, ভালোবাসো তাই তোমার অত লেগেছে, কিন্তু তাতে কাজ তো কিছু হবে না। ওদের পর্ব্বতপ্রমাণ দম্ভ তাতে তিলমাত্রও কমবে ব'লে বিশ্বাস করি নে। আর ঐ যে নী—, এই মানুষটি যে কত ইতর তা কল্পনা করা যায় না। বাদ প্রতিবাদের মধ্যে দিয়েও আমার নামের সঙ্গে ওর নাম সংযুক্ত হবে মনে হলেও সমস্ত মন যেন লজ্জায় কণ্টকিত হয়ে ওঠে। এর বেশ আমি ও-লোকটার সম্বন্ধে আর বল্‌তে চাই নে। হয়ত, এক দিন তোমরাও দেখ্‌তে পাবে যে বিদেশী শাসকের হাতে যে-সব স্বদেশী মুগুর দেশের কল্যাণে সবচেয়ে বড় আঘাত করে এই ছোকরাটি সেই জাতের। যাক্‌।

ত—র সঙ্গে শীঘ্রই এক দিন দেখা কোরব। বোলবো না যে তাঁর সম্বন্ধে তুমি আমাকে কোন-কিছুই লিখেচো, কিন্তু যা-সব তুমি আমাকে জানিয়েছো তাই ভিত্তি ক'রে জেরা ক'রে সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা কোরব। দেখি ত— কি বলেন। শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে কোথাও তো আমি ও-কথা বলি নি। তাঁকে দেশশুদ্ধ সবাই গভীর শ্রদ্ধা করে শুধু কি করি নে আমিই? তবে আশ্রমবাসীদের ওপর আমার মন বেশ সুপ্রসন্ন নয়। হেতু কতকটা ত—র কথায় আর কতকটা অন্যান্য আশ্রমবাসীদের সম্বন্ধে আমার নিজের জানা-শোনায়। তাছাড়া তোমার নিজের চলে যাওয়াটা আমার অত্যন্ত বেজেছিল। যখন I. C. S. কিম্বা আইন পড়লে না তখনও বেজেছিল, কিন্তু যখন গান-বাজনাকেই এবং তার সঙ্গে সাহিত্যকে আশ্রয় করলে তখন সে ক্ষোভ গিয়েছিল। ভেবেছিলাম সবাই চাকরি করবে এবং দেশের লোককে জেলে পাঠাবে হাকিম হয়েই হোক বা ব্যারিষ্টার হয়েই হোক,—তাই বা কেন? মণ্টুর খাওয়া-পরার ভাবনা নেই, ও যদি ভারতের কলা-শিল্পকে বিদেশীর চোখে বড় ক'রে তুলতে পারে, বুদ্ধি দিয়ে এর গতানুগতিক পথ থেকে আর এক নতুন পথে টেনে আনতে পারে, সেই কি দেশের কম লাভ, কম গৌরব? তোমার কাছেই একবার শুনেছিলাম বিদেশীর 'সিমফনি' ব'লে একটা জিনিস আছে, সেটা সত্যিই বড় জিনিস এবং তাকে তুমি দেশের সঙ্গীতকে দিতে চাও। তার পরে এক দিন শুনলাম তুমি সব ছেড়ে বৈরিগী হ'তে গেছ। হঠাৎ মনে হয়েছিল আমার নিজেরই যেন একটা মস্ত বড় লোকসান হয়ে গেছে। এ জীবনে তোমাকে হয়ত আর দেখতেই পাবো না, একি মনে কর আমাদের সোজা দুঃখ? আর কেউ না বিশ্বাস করুক কিন্তু তুমি তো জানো। এই ব্যাপারটা যে আমাকে চিরদিনই গভীর দুঃখ দেবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

একটা মজার কথা শোন মণ্টু। সেদিন ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম একটা জরুরি কাজে। ক্যাশিয়ার বাঙালী, শুনতে পেলাম একজন নাম-করা জ্যোতিষী—তিনি সযত্নে আমার কাজকর্ম্ম ক'রে দিয়ে আমার কুষ্ঠি দেখতে চাইলেন। বললাম কুষ্ঠি তো নেই কিন্তু রাশি-চক্রটা আমার নোট বইয়ে টোকা আছে। সেটা তখুনি তিনি টুকে নিলেন, আমার হাতের রেখার একটা ছাপ নিলেন। তার পরে রইলো তাঁর কাজকর্ম্ম, ডেস্ক থেকে পাঁজি-পুথি বার ক'রে লেগে গেলেন গণনায়! বললেন কি জানো? বললেন, এক বছরের মধ্যে আপনি অন্য পথ নেবেন। জিজ্ঞেস কোরলাম অন্য পথ মানে? বললেন, spiritual. আমি জবাব দিলাম কুষ্ঠির ফল ও-রকম আছে, সে কথা আমাকে কাশীর ভৃগু-বালারাও বলেছিল, কিন্তু আমি নিজে কাণাকড়ি বিশ্বেস করি নে। কারণ আধ্যাত্মিকতার 'আ' আমার মধ্যে নেই। বললেন, এক বছর পরে যদি আবার দেখা হয় তখন এর উত্তর দেবো। আমি বললাম, এক বছর পরেও ঠিক এই কথাই আমার মুখ থেকে শুনবেন। তিনি শুধু ঘাড় নাড়লেন। তাঁর বিশ্বাস কুষ্ঠির ফলাফল গুনতে জানলে মিথ্যে হয় না।

মণ্টু, একটা কথা বোধ করি পূর্ব্বেও আমার কাছে শুনে থাকবে। আমাদের বংশের একটা ইতিহাস আছে। এই বংশে আমার মেজ ভাই (প্রভাস) ৺ স্বামী বেদানন্দকে নিয়ে অখণ্ড ধারায় ৮ম পুরুষ সন্ন্যাসী হওয়া চললো—কেবল আমিই হোলাম একেবারে ঘোরতর নাস্তিক। Heredity আমার রক্তে একেবারে উজান টানে সুর ধরলে। সুতরাং, জীবনের পঞ্চান্ন বছর পার ক'রে দিয়ে নূতন convert পাবার আশা কেউ যেন না করেন। কিন্তু খাজাঞ্চি ভদ্রলোক একেবারে নিঃসংশয় যে আমি বৈরিগী হবোই !!

তোমাদের অনিলবরণ শুনেছি ধুলোকে চিনি করতে পারে। আশ্রমের

সমস্ত চিনি নাকি তিনিই supply করেন,—এ কি সত্যি? আমি অবশ্য বিশ্বাস করি নে, কারণ, তাহ'লে সে আশ্রমে থাকতে যাবে কিসের জন্যে? কলকাতায় এসে অনায়াসে তো একটা চিনির দোকান খুলতে পারতো।

বারীনের সঙ্গে আজকাল প্রায়ই দেখা হয়। সে বলে সে কখনো আর ও-মুখো হবে না। অত ভীষণ কড়াকড়ির মধ্যে ওর আত্মা-পুরুষ যে আজও খাঁচা ছাড়া হয় নি সে ওর বহুভাগ্য। কিন্তু তোমাদের motherএর সম্বন্ধে ওর একটা গভীর উক্তি আছে। বলে ও-রকম আশ্চর্য্য মানুষ দেখা যায় না। বলে তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি একটা অদ্ভুত ব্যাপার। যেমন খাটবার শক্তি, যেমন discipline বোধ তেমনি প্রখর বুদ্ধি। প্রত্যেক লোকের প্রত্যেকটি ব্যাপার তাঁর চোখের সুমুখে থাকে। তাঁর আদেশ ও উপদেশ ছাড়া এখানে কিছুই হ'তে পারে না। এই জন্যেই বাইরে থেকে যারা হঠাৎ যায় তারা তাঁর সম্বন্ধে নানাবিধ উল্টো পাল্টা ধারণা নিয়ে ফিরে আসে।···

দোলার কাটাকটিগুলো একটু বিবেচনা ক'রে প'ড়ো। হঠাৎ চ'টে যেয়ো না। আবার এমনও হ'তে পারে ওর অনেক কাটাকুটিই শেষ পর্য্যন্ত আমি নিজেই আবার বসিয়ে দেবো। সে যাই হোক্, আমাকে উৎসর্গ কোরো না। বরঞ্চ এটা কোরো রবীন্দ্রনাথকে। আমার আর একবার বিজয়ার স্নেহাশীর্ব্বাদ রইলো। ইতি—
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পুঃ—অনিলবরণের চিনি করতে পারার খবরটা নিশ্চয় দিয়ো। পারলে জাভা চিনি তো অত্যন্ত সহজেই বয়কট করা যেতে পারে। সে তো দেশেরই একটা মহৎ কাজ।

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাবড়া
১০ই চৈত্র ১৩৩৮

পরম কল্যাণীয়েষু,—মন্টু, এবার সত্যিকার কৈফিয়ৎ আছে, নিতান্ত আলস্যই নয়। বছর দুই পূর্ব্বে ডান হাঁটুতে ট্রেনের দরজার আঘাত লাগে, এত দিন তাই নিয়ে কোনমতে চলছিলাম কিন্তু মাস দেড়েক থেকে শয্যাগত। real শয্যাগত। কাল যাচ্ছি কলকাতায় X'Ray করাবার জন্যে। রবীন্দ্রজয়ন্তীর পরে এই মাসখানেক রাত্রে ঘুমুই নি। যন্ত্রণার সীমা নেই। দিনরাত যেন শূল বেঁধার ব্যাপার চল্‌চে। কখনো ভালো হবে কি না জানি নে,—আশা বিশেষ নেই। যাক্ এ কথা। কারণ শেষ পর্য্যন্ত বোধ হয় ভালই হবে যদি না আর উঠতে হয়। শেষ যাত্রাটাও সম্ভবতঃ এগিয়ে আসতে পারবে এমন ভরসা করি। তোমায় চিঠি লিখি নি কিন্তু তুমি যা-কিছু পাঠাও সমস্ত সত্যিই যত্ন ক'রে মন দিয়ে পড়ি। কখনো বা মনের মধ্যে সাড়া পাই, কখনো বা পাই নে, কিন্তু তোমাদের আশা বিশ্বাস ও নিষ্ঠার গভীরতা আমার কত যে ভালো লাগে তা বলতে পারি নে। অথচ, কেন যে ভালো লাগে তারও হেতু খুঁজে পাই নে।

তোমার 'জলাতঙ্কে প্রেমবীজ' প্রহসনটা পড়েচি। কলকাতা থেকে ফিরে এসেই পাঠিয়ে দেব। বেশ হয়েছে, কিন্তু এর প্রাণটা ছোট ব'লে লেখাটাও ছোট করতে হবে। ছোট হ'লেই তবে রস জমাট হবে। এ-কথাটা তোমার শোনাই চাই।

শিশির ভাদুড়ী অভিনয় করবেন? এ কথায় আস্থা না রাখাই ভালো। ফিরে এসে সব কথার জবাব দেবো। শুয়ে শুয়ে আর কলম চলে না। ইতি—শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাবড়া

৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০

পরম কল্যাণীয়েষু,—মণ্টু, বহু দিন থেকে তোমাকে একখানা চিঠি লিখবো সঙ্কল্প করেচি কিন্তু কিছুতেই হয়ে ওঠে নি। আজ কলম নিয়ে বসেছি—লিখবই!

...পঞ্চম পর্ব্ব শ্রীকান্ত লিখে শেষ ক'রে দেবো! অভয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে। আর যদি তোমরা বলো ৪র্থ পর্ব্ব ভালো হয় নি তবে থাকলো এইখানেই রথ।

তবে এ সম্বন্ধে একটু নিজের কথা বলি। আমার অভিপ্রায় ছিল সাধারণ সহজ ঘটনা নিয়ে এ পর্ব্বটা শেষ করবো এবং নানা দিকের থেকে অল্প কথায় এবং সাহিত্যিক সংযমের মধ্যে দিয়ে কতটুকু রস সৃষ্টি হয় সেটা যাচাই করবো। উপাদান বা উপকরণের প্রাচুর্য্যে নয়, ঘটনার অসামান্যতায় নয়, বরঞ্চ, অতি সাধারণ পল্লী অঞ্চলের প্রাত্যহিক ব্যাপার নিয়েই এ বইটা শেষ হবে। বিস্তৃতি থাকবে না থাকবে গভীরতা, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতি নয় থাকবে শুধু ইঙ্গিত—শুধু রসিক যাঁরা তাঁদের আনন্দের জন্য। কতটা কি হয়েছে জানি নে তবে উপন্যাস-সাহিত্যের যতটুকু বুঝি তাতে এই আশা করি যে যদি আর কিছুই ভালো না পেরে থাকি, অন্ততঃ অসংযত হয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার স্বরূপ প্রকাশ ক'রে বসি নি। কিন্তু তোমার অভিমত চাই-ই।

দ্বিতীয়—ও-আশ্রমে যাবার পরে থেকে তোমার সম্বন্ধে এই বস্তুটা আমি বড় আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য ক'রে আসচি যে ওখানে থেকে তোমার পড়া-শুনা হয়েছে যেমন ব্যাপক সুদূরপ্রসার তেমনি হয়েছে গভীর এবং অন্তর্মুখী। এবং হয়েছে সত্য কেন না তোমার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য

যেমন বিনয়ী তেমনি শান্ত। নিজে বহু আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও তোমার বিদ্যাবত্তার লাঠি দিয়ে তুমি কাউকে প্রতিঘাত করো না। এই দিক থেকে তোমাকে যতই পরীক্ষা ক'রে দেখি ততই মুগ্ধ হই, ততই এই ভেবে খুশি হই যে মন্টু আমার দলে। সে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নীরবে সহ্য করে, উপেক্ষা করে, কিন্তু মুখ ভেঙচে মানুষকে অপমান করতে আক্রমণ করতে ছোটে না। তার আর ভয় নেই, আর তার বন্ধুজনের চিন্তার কারণ নেই—এখন থেকে চিরদিন তার সত্যকার ভদ্রতা তাকে নীচে নামা থেকে রক্ষা ক'রে যাবে। মন্টু, তাদের আমি বড় ভয় করি যারা নিজেরা সাহিত্য-সেবী হয়েও তার আপনজনদের প্রকাশ্যে লাঞ্ছনা ক'রে বেড়ায়। এই কথাটা তারা কিছুতেই বুঝতে পারে না যে অপরকে তুচ্ছ প্রমাণিত করলেই নিজের বড়ত্ব সপ্রমাণ হয়ে যায় না। তার জন্যে আরও কিছু চাই। সেটা অতো সোজা রাস্তা নয়।

সেদিন 'পুষ্পপাত্র' মাসিক কাগজে তোমার লেখা পড়লাম। তাতে অন্যান্য অনেক কথার মধ্যে তুমি ক্ষুব্ধ-মনে বু—র নারী-বিদ্বেষের প্রতিবাদ করেছো, কারণ অনুসন্ধান করেছো। তাকে তুমি ভালোবাসো, তোমার ভালোবাসায় পাছে ঘা লাগে এর জন্যে আমার মনে যথেষ্ট দ্বিধা এবং সঙ্কোচ আছে, তবু মনে হয় কতকটা ভিতরের কথা তোমার জানা দরকার। কে নাকি লিখেচেন সাহিত্য-সৃষ্টির অন্তরালে যে স্রষ্টা থাকে সে ছোট হ'লে সৃষ্টিটাও তার বড় হ'তে বড় ব্যাঘাত পায়। এই কথাটা আমিও বিশ্বাস করি ·· বু—লিখেচে সাবিত্রীর মত মেসের ঝি থাকলে আমরা মেসে প'ড়েই থাকতুম। কিন্তু মেসে প'ড়ে থাকলেই হয় না—সতীশ হওয়া চাই, নইলে সাবিত্রীর হৃদয় জয় করা যায় না। সারা জীবন মেসে কাটালেও না, তাছাড়া ছেলেটি একটু বোঝে না যে সাবিত্রী সত্যিই ঝি শ্রেণীর মেয়ে নয়। পুরাণে আছে লক্ষ্মী দেবীও দায়ে প'ড়ে

একবার এক ব্রাহ্মণ-গৃহে দাসীবৃত্তি করেছিলেন। পঞ্চ পাণ্ডবের অর্জ্জুন উত্তরাকে যখন নাচ গান শেখাতেন তখন তাঁর কথা শুনে এ-কথা বলা চলে না যে এ-রকম ভেড়ুয়া পেলে সব মেয়েই নাচ গান শেখার জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠতো। সকল সম্প্রদায়ের মতো বেশ্যাদের মধ্যেও উঁচু নীচু আছে। বেশ্যার কাছে যে-বেশ্যা দাসী হয়ে আছে তার চাল-চলন এবং তার মনিবের চাল-চলন এক না হ'তেও পারে। এদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে আট আনা এক টাকা খরচ করলেই চলে কিন্তু ওদের জানবার অনেক ব্যয়। সহজে তাদের দেখা মেলে না, তারা রঙ মেখে বারান্দায় মোড়া পেতে বসে না। তুমি যে সুশীলা মিষ্টভাষিণী বাইজির উল্লেখ করেচো সে কি সবাই দেখতে পায়? তার অনেক উপকরণ, অনেক আয়োজন না হলে হয় না। হয় নিজের অনেক টাকা কিম্বা কোন রাজপুত্র-বন্ধুর বহু টাকা খরচ না হ'লে উপরের স্তরে প্রবেশাধিকার মেলে না। শুধু রাস্তা থেকে যারা লোক ধ'রে নিয়ে খোলার ঘরে গিয়ে ঢোকে তাদের পরিচয় মেলে। গরীবের অভিজ্ঞতা নীচের স্তরেই আবদ্ধ থাকে। তাই ও শ্রীকান্তর টগর ও বাড়িউলিকেই চেনে। এ-সব উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন, লিখতেও লজ্জা বোধ হয়, কিন্তু যারা নির্বিচারে স্ত্রী-জাতির গ্লানি প্রচার করাটাকেই realism ভাবে তাদের idealism ত নেই-ই realismও নেই। আছে শুধু অভিনয় ও মিথ্যে স্পর্দ্ধা—না-জানার অহমিকা। মেয়েদের বিরুদ্ধে কোঁদল করার স্পিরিট থেকে কখনো সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।···আমার অন্তরের স্নেহ ও শুভাকাঙ্ক্ষা জেনো। সাহানাকে[১], দেখা হ'লে বোলো তাকে আমি আশীর্ব্বাদ করেছি।—শরৎবাবু।

১। দিলীপবাবুর সঙ্গীত-শিষ্যা।

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাবড়া
১০ই ভাদ্র, ১৩৪০

কল্যাণীয়েষু,—মণ্টু তোমার চিঠি পেলাম। ইতিপূর্ব্বেই তোমার প্রেরিত শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব্বের উপর প্রবন্ধ পেয়েছিলাম। প্রথমে মনে হয়েছিল প্রবন্ধ অতিদীর্ঘ; বোধ হয় অনেকখানি কাট ছাট করা আবশ্যক কিন্তু বার দুই অত্যন্ত যত্ন ক'রে পড়ার পরে আমার সন্দেহ নেই যে এ লেখার কিছুই বাদ দেওয়া চলে না। আমার বইয়ের উপর লিখেছ ব'লেই আমার এত বেশি ভালো লেগেছে কি না এ-কথা আমার অনেক বার মনে হয়েছে, কিন্তু অনেক ভেবেও বলতে সঙ্কোচ নেই যে, এ আলোচনা তুমি যে-কোন বইয়ের সম্বন্ধেই করতে আমার এমনিই ভালো লাগতো। তার কারণ মুখ্যতঃ শ্রীকান্তর কথাই আছে সত্যি, কিন্তু সাহিত্য বিচারের যে-ধারাটি তুমি এমন মধুর ক'রে এমন হৃদয় দিয়ে আলোচনা করেছ তা শুধু যে সুন্দর হয়েছে, তাই নয় নিরপেক্ষ সুবিচার হয়েছে ব'লে যে-কোন দরদী পাঠকই স্বীকার করবে। তাছাড়া সমালোচনা কথোপকথনের ছলে,—এটি চমৎকার নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছো মণ্টু। এ রকম ধরণে না লিখলে এত বড় প্রবন্ধ যত ভালোই হোক লোকের পড়বার হয়ত ধৈর্য্য থাকতো না। যেন একটি সুন্দর গল্পের মতো পড়তে লাগে। এটা কোন একটা ভালো মাসিকপত্রে ছাপতে দেবো এবং অনুরোধ করবো এ লেখার কোথাও যেন বাদ না পড়ে। কিন্তু তোমাকে proof পাঠানো সম্ভবপর হবে কি না এখন ঠিক বলতে পারলুম না,—যদি সময় থাকে তাই হবে।

শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব্ব তোমার এত ভালো লেগেছে জেনে কত যে খুশি হয়েছি বলতে পারি নে,—কারণ এ বইটি সত্যিই আমি যত্ন ক'রে মন দিয়ে লিখেছিলাম হৃদয়বান পাঠকের ভালো লাগার জন্যেই। তোমার

মত একটি পাঠকও যে শ্রীকান্তর ভাগ্যে জুটেছে এই আমার পরম আনন্দ, অন্য পাঠক আর চাই নে। অন্ততঃ না হ'লেও দুঃখ নেই। আর মনে মনে ভেবেছিলাম কত বিভিন্ন ভাষার কত বই না তুমি এই কটা বছরে পড়েচো। তবু তার মাঝে আমাদের মতো মূর্খ মানুষের লেখা পড়বার যে তুমি সময় পাও এ কি কম আশ্চর্য্য! জানি ত আমি কত তুচ্ছ কত সামান্য লেখক। না আছে বিদ্যে না আছে পড়াশুনা, পাড়াগাঁয়ের লোক যা মনে আসে লিখে যাই। তাই, আধুনিক কালের পণ্ডিত প্রফেসরেরা যখন আমাকে গালিগালাজ করে সভয়ে চুপ ক'রে থাকি। ভাবি এদের কাছে আমি কত নগণ্য কত সামান্য। কিন্তু এর মাঝে পাই যখন তোমার মত বন্ধুর প্রশংসাবাক্য তখন এই কথাটা গর্ব্বের সঙ্গে মনে করি, পাণ্ডিত্যে মণ্টু এদের ছোট নয়, অথচ তার তো ভালো লেগেছে। এই আমার মস্ত ভরসা, মস্ত সান্ত্বনা।

অনেক দিন তোমাকে দেখি নি, ভারি দেখতে ইচ্ছে হয়, পণ্ডিচারীতে যদি পূজোর সময়ে যাই দু-এক দিন থাকার ব্যবস্থা কি তুমি ক'রে দিতে পারো? আশ্রমে থাকার নিয়ম নেই জানি কিন্তু ওখানে কি কোন হোটেল নেই? যদি থাকে লিখে জানিও। ইতি—তোমার নিত্যশুভানুধ্যায়ী শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাবড়া

১৯শে মাঘ ১৩৪০

পরম কল্যাণীয়েষু,—মণ্টু, অনেক দিন হ'ল তোমাকে কিছু লিখি নি। হঠাৎ আজ সকালে কেন যে লেখার ইচ্ছে এত প্রবল হয়ে উঠলো তাই ভাবচি। বোধ হয় ফরিদপুরের সেই দীনেশবাবুর আন্তরিক কথাগুলো। দিন তিনেক আগে ফরিদপুর থেকে ফিরেচি, সেখানে ছিল

সাহিত্য সম্মিলনী এবং municipal address : মঞ্চের উপরে যখন সুদীর্ঘ ও 'সারগর্ভ' প্রবন্ধ পড়া চলছিল, তখন নেপথ্যে চলছিল অনামীর সমালোচনা। অবশ্য বিরুদ্ধ অভিমতই ৮০% : তার মধ্যে হঠাৎ একটি ভদ্রলোক স্বীকার ক'রে বসলেন যে তিনি অনামী বইখানি আদ্যোপান্ত ৪ বার পড়েছেন এবং আরও চার বার পড়বার ইচ্ছে রাখেন।

তখন, "বলেন কি দীনেশবাবু, আপনি যে ফরিদপুর বারের বিশিষ্ট রত্ন, প্রচণ্ড তার্কিক উকিল—এ আপনার কি (কী) দুর্ব্বলতা!"

"দীনেশবাবু, আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?"

"দীনেশবাবু, আপনি যে দেখি পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময়।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবশ্য আমি চুপ করেই ছিলাম—নীরব সাক্ষীর মতো। এক সময়ে এই দীনেশবাবু আমাকে একলা পেয়ে বললেন, "শরৎবাবু, সব বই পৃথিবীর সকলের জন্যে নয়। আমি শান্তদাস বাবাজীর শিষ্য,—বৈষ্ণব। ভগবান বিশ্বাস করি। দিলীপবাবু যে-ভাবের প্রেরণায় কবিতাগুলি লিখেছেন সংসারে তার তুলনা কম। যখনি সময় পাই মুগ্ধ হয়ে কবিতাগুলি পড়ি, কি যে ভালো লাগে পরকে বোঝাতে পারি নে।"

শুনে মনে মনে ভাবলাম মণ্টু, এর চেয়ে অকপট সত্যিকার সমালোচনা কি আছে? যে-তারে তুমি ঝঙ্কার দিয়েছ তাঁর বুকের মধ্যেকার অনুরূপ তারটি গুণগুণিয়ে বেজে উঠেছে। কিন্তু যাদের বাজলো না তারা কারো চার-চার বার পড়বার কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করবে না তো করবে কি (কী!)। আর যারা শুধু বিস্ময় প্রকাশ করাটাকেই যথেষ্ট মনে করে না তারা সুরু করে গালিগালাজ। মাত্রা যতই ছাড়িয়ে চলে ততই ভাবে নিজেদের নির্ভীক ও বাহাদুর সমালোচক। এমনিই ত দেখে আসচি।

সেদিন হীরেন ব'লে একটি ছেলে আমাকে চিঠি লিখেচে সে অনামীর একটা আলোচনা-সভা করতে চায় এবং আমাকে করতে চায় তার সভাপতি। আমি সেই চিঠিখানা পাবার দেড় মিনিটের মধ্যে জবাব দিলাম—রাজি। মনস্থির করা এবং দেড় মিনিটে জবাব দেওয়া। আমি বলি দীনেশবাবুর চার-চার বার অনামী পড়ার চেয়েও এ বস্তু বিস্ময়কর। আগামী সভায় এই কথাটির উল্লেখ করবো।

কিছু দিন থেকে মনে করচি তোমাকে একটা অনুরোধ করবো। সে আ—র লেখার সম্বন্ধে। তোমাকে সে শ্রদ্ধা করে তুমি বললে শুনতেও পারে। তাকে ব'লো তার লেখায় একটু সংযত হ'তে। অবশ্য সংযম জিনিসটা হচ্চে এক প্রকারের instinct : ও নিজের না থাকলে পরে বুঝিয়ে দিতে পারে না। তবু ব'লো যে, এই যে অস্থানে অকারণে পরের লেখার কোটেশন এর চেয়ে অসুন্দর জিনিস আর নেই। অমুক বড় গ্রন্থকারের "—" এই কথাগুলোর সঙ্গে আমার সায় আছে, ও লোকটার '—' এই লাইন কটা বিশ্রী, অমুক লেখক '—' এই ছত্রটা কি সুন্দর প্রকাশ করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব যেন অত্যন্ত রূঢ়ভাবে পাঠককে বলতে* চায় "তোমরা ছাখো আমার এইটুকু বয়সে আমি কত বুঝেছি, কত বই পড়েচি।" মন্টু, তোমার নিজের লেখার quotation গুলো ওকে একবার মন দিয়ে পড়তে বোলো। বোলো তোমার বহুবিস্তৃত ও গভীর পড়া-শুনার মধ্যে এগুলো এসে পড়েছে নিছক প্রয়োজনে। অহেতুক আসে নি, আসে নি পাণ্ডিত্য প্রকাশের দাম্ভিকতায়। আ—ছেলেমানুষ এখন থেকে ওকে এ বিষয়ে সতর্ক ক'রে দিলে ফল ভালোই হবে মনে করি। ও হয়ত জানে না যে কোটেশন ব্যাপারে তোমাকে অনুকরণ করতে পারাটা খুব সোজা কাজ নয়। ওটা খুবই কঠিন। অন্যান্য সহস্রবিধ অসংযমের কথা আর তুলবো না কারণ ওর সাহিত্যিক হিরো যদি হয়ে

থাকে বু—তাহ'লে ওকে সামলানো যাবে না। গভীর বেদনার সঙ্গেই এই কথাগুলো তোমাকে বললাম। তোমাকে কতবার বলেচি মণ্টু, লেখায় সংযম সাধনার মতো শক্ত সাধনা আর নেই। যা অনায়াসে লিখতে পারতাম তা না-লেখা। রসজ্ঞ পাঠকের মন তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে যখনি সে দেখতে পায় এই সংযমের চিহ্নটুকু। যাক্।

সেই যে চিঠিটা আমার স্বদেশ ও প্রচারকে বেরিয়েছিল তার সম্বন্ধে কবি আমাকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। তার শেষের দিকে ছিল 'তুমি বার বার আমাকে তীক্ষ্ণ কঠোর ভাষায় আক্রমণ করছো কিন্তু আমি কখনো প্রকাশ্যে বা গোপনে তোমার নিন্দে ক'রে প্রতিশোধ নিই নি। এ লেখা সেই ফর্দ্দে আর এক সংখ্যা যোগ করলে মাত্র[১]।'

১। কবির সেই চিঠিটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল—

কল্যাণীয়েষু,

শরৎ কোন পত্রিকায় দেখলুম তোমার বিশ্বাস যে, উপন্যাস রচনা নিয়ে একটি পত্রে আমি যে মত প্রকাশ করেছি তাতে তোমার রচনার প্রতিও আমার লক্ষ্য আছে। বোধ করি তোমাকে উত্তেজিত করবার জন্যেই কেউ তোমার কাছে এই সঙ্কেত করে থাকবে। তোমার বা দিলীপের সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য হওয়াটা আমার নির্ব্বুদ্ধিতা হোতে পারে কিন্তু সেটা আমার অপরাধ নয়। কিন্তু ইঙ্গিতে তোমাকে আক্রমণ করা যদি আমার কোনো লেখার উদ্দেশ্য হয় তবে সেটাকে অপরাধ বলেই স্বীকার করব। আমি এমন কাজ করিনি সে কথা বিশ্বাস করে নিয়ো। তুমি আমাকে বারবার তীব্র ভাষাতেই আক্রমণ করেছ—আমি কোনদিন তার প্রতিবাদ করিনি এবং কখনই প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে তোমাকে নিন্দা করে শোধ তুলিনি। এবারেও সেই ফর্দ্দে আর একটি সংখ্যা বাড়ল। আমার বিজয়ার অভিবাদন। ইতি—১৬ই আশ্বিন ১৩৪০

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেদিন উমাপ্রসাদ আমাকে বলছিলেন এ চিঠি লিখে আমি অন্যায় করেচি, কারণ, এর প্রতি ছত্রে বিষ ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু কি করবো নাচার। যা লিখে ফেলেচি সে তো আর ফেরাতে পারবো না। এখন কবির সঙ্গে বিচ্ছেদ বোধ করি আমার পরিপূর্ণ হলো। কিন্তু এ সম্বন্ধে তুমি যে চিঠিটা 'স্বদেশে' লিখেচো সেটি ভারি চমৎকার হয়েছে। দুঃখ প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু ক্রোধ নয়। আমার ত্রুটি ঘটেছে ঐখানে। কিন্তু কি যে হলো, 'পরিচয়ে'র ঐ লেখাটা পড়ামাত্রই সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলে গেল, তখনি কাগজ কলম নিয়ে চিঠিটা লিখে ফেললাম।

তোমার শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব্বের সমালোচনা 'বিচিত্রা'য় আর একবার পড়লাম। এ যদি শ্রীকান্ত না হয়ে আর কিছু হ'তো মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা ক'রে বাঁচতাম। লেখাটি সত্যিই চমৎকার। যে সত্যিই পড়েছে এবং বুঝেছে তার আনন্দ প্রকাশ।

মাঝে মাঝে চিঠি লিখো মণ্টু, জবাব পাও বা না পাও। এ আমার ভারি তৃপ্তি—তোমার লেখা চিঠি পাওয়া। আর একটা কথা। বন্ধু স্থরেন মৈত্র (যার মাথা জোড়া টাক। প্রফেসর, শিবপুর Engineering Collegeএ আমরা যেতাম) তিনি শ্রীঅরবিন্দের গভীর ভক্ত। আমাকে অনুরোধ করেছেন অদ্যাবধি তুমি আমাকে তাঁর সম্বন্ধে যত লেখা পাঠিয়েছো (এবং বলা সত্বেও যা আমি কোনো কালে ফেরৎ দিই নি) সেইগুলি একবার পড়তে দিতে। আমি বলেচি দেবো। কিন্তু রাগ ক'রো না যেন। স্থরেন ব্রাহ্ম হ'লেও লোক ভালো। ইতি—

তোমার নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সামতাবেড়, পাণিত্রাস, হাবড়া
২০শে মাঘ ১৩৪০

মণ্টু,—এইমাত্র তোমার রেজেষ্ট্রী চিঠি পেলাম। কাজের কথাগুলো আগে ব'লে নিই। (১) রঙের পরশ পাঠিও। দু-এক পাতায় যা পারি লিখবো। কিন্তু ব'লে রাখি গল্প উপন্যাস ছাড়া আমি ত আর কিছুই লিখতে পারি নে। প্রবন্ধ ত ভাষার দৈন্যে একেবারে অপাঠ্য হয়ে ওঠে। আমার চিঠি লেখার ভাষাও ত দেখেচ। কবির সম্বন্ধে 'স্বদেশে'র চিঠিটাই কি বিশ্রীই হয়ে গেছে। তবু আমার শাদা-মাটা গেঁও ভাষায় আনন্দ প্রকাশ করার লোভ সম্বরণ করা শক্ত। সুতরাং লিখবই, আমাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।

(২) হীরেনের[১] কথা ও-চিঠিটায় দিয়েছি। অনামীর আলোচনা-সভায় যোগ দেবো।

(৩) শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব্বের ('বিচিত্রা'য় প্রকাশিত) আলোচনাটুকু যে-ভাবেই ছাপাও লোকে পড়বেই। তবে রঙের পরশের সঙ্গে দিলে হয়ত ভালোই হবে। বরঞ্চ আর কারও মত নিও।

একটা কথা। পথের দাবীর আলোচনা বা উল্লেখ না করাই ভালো, কারণ, আইন কানুন বর্ত্তমানে এত কঠোর হয়েছে যে শুধু ওরই জন্যে হয়ত Govt. সমস্ত বইটাই বাজেয়াপ্ত করতে পারে।

✓ যে উপন্যাসখানি তুমি লিখচো (যা ৩।৪ মাসে শেষ হবে) সেখানি আরও ভালো হবে আমিও আশা করি। কথোপকথন (dialogue) যেখানেই থাক খুব সহজ ভাষা ব্যবহার কোরো। তর্ক-বিতর্ক যেন ছোট হয় অর্থাৎ, একসঙ্গে অনেকখানি নয়। এক অধ্যায়ে একটু, পরের

১। হীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যায়ে বাকি অংশটুকু—এমনি। উপমা উদাহরণ—কোনটিই যেন রবীন্দ্রনাথের মতো নিরর্থক ও অসম্বদ্ধ না হয়। এখানে logic যেন কিছুতে বাষ্পাচ্ছন্ন না হয়ে ওঠে। মানুষকে অলঙ্কার দিয়ে সাজানোর রুচি এবং স্যাকরার দোকানে অলঙ্কার দিয়ে show-case সাজানোর রুচি এক নয়। এ-কথা সর্ব্বদাই মনে রাখা চাই। অলঙ্কৃত বাক্যের বাহুল্য-ভার যে কত পীড়াদায়ক সে কথা শুধু পাঠকই বোঝে। কিন্তু আর না। বিস্তর advice বিনা-মূল্যে দিয়ে ফেলেচি। সংযমের পাঠ দিতে নিজেই দেখচি অসংযত হয়ে পড়েচি সব চেয়ে বেশি। আশীর্ব্বাদ এবং ভালোবাসা জেনো।—শ।

পি ৫৬৬ মনোহরপুকুর, কালীঘাট,
কলিকাতা। ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২

পরম কল্যাণীয়েষু,—নিজের খবরটা আগে দিই। পরশু বাড়ি থেকে ফিরে এসে পর্য্যন্ত মাথা ধ'রে আছে। বুদ্ধদেব ভটচায ব'সে, Dr. কানাই গাঙ্গুলি ব'সে—ফোন করা হচ্চে একটা ডাক্তারখানায়। এবং আমার driverকে বলা হচ্চে মোটর বার করার জন্যে। অর্থাৎ যাবো রক্তের চাপ দেখাতে। যদি চাপ বেশি না থাকে ভালই, থাক্‌লে শয্যাগ্রহণ ক'রে পরমানন্দে দিন কাটাবো। আমার পক্ষে এত বড় আনন্দ এবং আরামের বস্তু আর নেই। শ্রীভগবান তাই করুন। যাক্।

তোমার চিঠিগুলো বুদ্ধদেবের মারফতে অর্দ্ধেক পড়লুম। বাকি অর্দ্ধেকটা কোন ফরাসি-জানা বন্ধুর মারফতে প'ড়ে নেবো।

মণ্টু, এই অতি তুচ্ছ 'নিষ্কৃতি' নিয়ে সমরাঙ্গনে নেমে পড়া আর টিনের খাঁড়া নিয়ে মোষ কাটতে যাওয়া প্রায় এক কথা। নিজের মধ্যে সত্যিই বিশেষ ভরসা পাই নে। শুধু একটা কথা এই মনে করি যে তোমার

গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ আছে এবং তোমার নিজের অকৃত্রিম স্নেহ ও শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু নিজের তরফ থেকে যে কিছুই নেই মনে হয় ভাই!

তুমি শ্রীকান্ত তর্জ্জমা করতে সঙ্কোচ বোধ করচো কেন? যদি হয় ত তোমাকে দিয়েই হবে। ভবানীকে ডেকে ৪র্থ ভাগ শ্রীকান্ত দিয়ে বলেছিলাম এর যে-কোন একটা অধ্যায় তর্জ্জমা ক'রে নিয়ে এসো। আট দশ দিন পরে সে নিজে ত এলেই না, চিঠিতে জানালে তার সাহস হয় না। এবং যে ইংরিজি চিঠিটুকু পাঠালে তার থেকে তার কথাটাকে মিথ্যে বিনয় ব'লেও ভাবতে পারলাম না। সে সত্যিই লিখেচে। তাকে দিয়ে হবে না। হ'লে খবরের কাগজের ভাষা হবে।

সোমনাথ মৈত্র যে 2nd part translation করতে উদ্যত হয়েছে এ খবর আমি নিজেও জানি নে। 'বিচিত্রা'র উপেন নিজে যদি এ ব্যবস্থা ক'রে থাকে ত সে আলাদা। খবর নোবো। আমি ত খুঁজেই পাচ্ছি নে কে এ কাজে হাত দিতে পারে তুমি ছাড়া। 'নিষ্কৃতি'র যে-তর্জ্জমা তুমি করেছো তার চেয়ে ভালোই বা কে করতো? তবে, তোমাকে শ্রীকান্ত তর্জ্জমা করতে বলতে আমার ইচ্ছে হয় না, কারণ এত বড় পরিশ্রমের কাজে হাত দিলে তোমার অন্য কাজের ক্ষতি হবে।

'নিষ্কৃতি'র সম্বন্ধে তোমার যে-রকম ব্যবস্থা করতে ইচ্ছে হয় কোরো। ছোট গল্পগুলোর তর্জ্জমা এখানে করাবার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু লোক পাই নে। আমার নিজের কাছেই রয়েছে 'পণ্ডিত মশায়ে'র তর্জ্জমা কিন্তু সে দেখলেও তোমার হয়ত দুঃখ হবে। মায়ার সঙ্গে আমার এখনো দেখা হয় নি, আশা করি দু-এক দিনেই হবে। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি—শরৎদা

পুঃ—অন্যান্য খবর বুদ্ধদেবই তোমাকে দেবে।— শ, চ

পি ৫৬৬ মনোহরপুকুর, কলিকাতা
৩রা মাঘ ১৩৪১

পরম কল্যাণীয় মন্টু —কাল রাতে দেশের বাড়ি থেকে এ বাড়িতে ফিরে এসেছি। তোমার চিঠিগুলি পেলাম। একটা একটা ক'রে জবাব দিই কাজের ব্যাপারগুলো—

(১) তোমার ও নিশিকান্তর ছবি বেশ উঠেছে। বহুকালের পরে তোমার মুখ আবার দেখতে পেলাম। বড় আনন্দ হলো। একবার সত্যিকার দেখা ভারি দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আশা ছেড়ে দিয়েছি, ভেবেচি এ জীবনে আর হলো না। না-ই হোক।

(২) টাইপরাইটারটা যে ভালো ভাবে পৌঁছেছে এ বড় তৃপ্তি। ভয় ছিল পাছে সেটা বিকলাঙ্গ হয়ে তোমার আশ্রমে গিয়ে হাজির হয়। সেদিন হীরেন এসে বল্লে মন্টুদার নিজের টাইপরাইটারটা গেছে পুরনো হয়ে, একটা নতুন কলের তাঁর দরকার। বল্লুম একটু খেটেখুটে তাঁকে পাঠিয়ে দাও না হীরেন্। সে রাজি হলো, এ-সব সে-ই করেছে—আমি জড়বস্তু, কোন কাজই আমাকে দিয়ে হয় না। আমি শুধু তাদের ঐ কটা টাকার চেক্ লিখে দিয়েছিলাম। তোমার যে পছন্দ হয়েছে এর চেয়ে আনন্দ আমার নেই। যে-লোক নিজের সমস্ত দিয়েছে তাকে দেওয়া ত দেওয়া নয়—পাওয়া। আমি অনেক পেলাম। তোমার চেয়ে ঢের বেশি।

(৩) শ্রীঅরবিন্দর হাতের লেখা চিঠিটুকু সযত্নে রেখে দিলাম। এ একটি রত্ন।

(৪) 'নিষ্কৃতি'কে ভালো অনুবাদ করার জন্যে যে তুমি যথাসাধ্য করবে সে আমি জানতাম। শুধু আমাকে ভালোবাসো ব'লেই নয়, যারা যথার্থই সাধুর ব্রত গ্রহণ করেন এ তাঁদের স্বভাব। এ না ক'রে

তারা থাকতে পারে না। হয় করে না, কিন্তু করলে ফাঁকি দিতে জানে না।

(৫) অনুবাদ ভালো হবেই যা দেখে দেবার সংকল্প করেছেন শ্রীঅরবিন্দ নিজে। কিন্তু বইটার নিজস্ব গুণ এমন কি আছে মণ্টু? কেন যে শ্রীঅরবিন্দর ভালো লাগলো জানি নে। অন্ততঃ, না লাগলে বিস্মিতও হোতাম না ক্ষুণ্ণও হোতাম না। তুমি শ্রীকান্ত যবে প্রচার করতে পারবে তখনই শুধু আশা করবো হয়ত বাঙালী একজন গল্প-লেখককে পশ্চিমের ওরা একটুও শ্রদ্ধার চোখে দেখবেন। তোমার উদ্যোগ থাকলে এবং শ্রীঅরবিন্দর আশীর্ব্বাদ থাকলে এ অসম্ভবও হয়ত এক দিন সম্ভব হবে। এই ভরসাই করি।

(৬) অনুবাদের ব্যাপারে তোমার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ স্বীকার ক'রে আমি নিয়েছি। তার কারণ, তুমি ত শুধু অনুবাদক নও নিজেও বড় লেখক। তোমাকে অকিঞ্চিৎকর সপ্রমাণ করার লোক বিরল নয়, এ চেষ্টা তাদের আছে এবং অধ্যবসায়ও অপরিসীম। তা হোক,—তাদের সম্বেত চেষ্টার চেয়েও অনেক বড় তোমার প্রতিভা এবং একাগ্র সাধনা। তোমার গুরুর শুভাকাঙ্ক্ষা ত সমস্ত কিছুর পিছনে রইলই। জগতে তাদের অপচেষ্টাটাই সফল হবে আর সার্থক হবে না তোমার অন্তরের জাগ্রত শক্তি? এমন হ'তেই পারে না মণ্টু।

(৭) রবীন্দ্রনাথ আমাকে introduce ক'রে দিতে চাইবেন ব'লে ভরসা করি নে। আমার প্রতি ত তিনি প্রসন্ন নন। তা ছাড়া তাঁর এত সময়ই বা কই? সাহিত্যসেবার কাজে তিনি আমার গুরুকল্প। তাঁর ঋণ আমি কোন কালে শোধ করতে পারবো না, মনে মনে তাঁকে এমনি ভক্তি-শ্রদ্ধাই করি। কিন্তু ভাগ্য বাধ সাধলো,—আমার প্রতি তাঁর বিমুখতার অবধি নেই। সুতরাং এ চেষ্টা করা নিরর্থক।

(৮) হীরেন হয়ত আজকালের মধ্যেই আসবে। তাকে তোমার কাগজ পাঠিয়ে দিতে বলবো।

(৯) শেষকালে রইলো তোমার কথা। তোমার কাছে আমি সত্যিই বড় কৃতজ্ঞ মণ্টু। এর বেশি আর কি বলবো! চিঠি লেখার ব্যাপারটা চিরকালই আমার কাছে জটিল। যেন কিছুতেই গুছিয়ে লিখতে পারি নে। তাই যে-সব কথা বলা আমার উচিত ছিল অথচ বলা হলো না, সে আমার অক্ষমতার জন্যে অনিচ্ছার জন্যে কখনো নয়। এ বিশ্বাস ক'রো।

আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো এবং সৌরীনকে জানিও ছেলেটিকে বেশ মনে করতে পারছি নে। ৺দাদামশাইয়ের বাড়িতে কিম্বা তকুদের বাড়িতে হয়ত দেখে থাকবো।

(১০) শ্রীঅরবিন্দের নববর্ষের প্রার্থনা সত্যিই বড় চমৎকার লাগলো। সত্যিই খুব বড় কবি তিনি।—শুভার্থী শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পি, ৫৬৬, মনোহরপুকুর, কালীঘাট,
কলিকাতা। ৭ই চৈত্র ১৩৪২

পরম কল্যাণবরেষু,—মণ্টু, অনেক দিন তোমাকে চিঠি লেখা হয় নি। অন্যায় হয়েছে জানি, এর দণ্ড আছে তাও অবিদিত নই, কিন্তু এ-ও দেখে আসচি অক্ষম লোকদের অক্ষমতা যদি অকৃত্রিম হয় তাহ'লে সেটা পূরণ করবার মানুষও ভগবান জোগান। একেবারে রসাতলে পাঠান না। এই মানুষটি পেয়েছি আমি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যতে। আমার যতকিছু তোমাকে জানাবার সব জানাতে পাই আমি তার মারফতে। আবার খবরও পাই তার হাত থেকে। তোমার মতো ওরও স্নেহটা আমার প্রতি

যথার্থ আন্তরিক। যথার্থই ও চায় আমার ভালো হোক,—আমার যশ আমার প্রতিষ্ঠার কোথাও যেন-না কম্‌তি থেকে যায়। সেদিন ও জোর ক'রে ধরে নিয়ে গিয়ে আমাকে Hoffmanদের ক্যামেরার সামনে বসিয়ে ছবি তুলিয়ে তবে ছাড়লে। বললে দিলীপকুমারের ফরমাস আমি অবহেলা করতে পারবো না। তিনি যে পরিশ্রম স্বীকার করছেন আমাদের কিছুটা তাঁকে সাহায্য করা চাই। অর্থাৎ মেহন্নতের ভাগ নেওয়া দরকার। সমস্তই কি তিনি একাই করবেন? বুদ্ধদেবের বিশ্বাস আমি খুব বড় লেখক। অতএব, বড় লেখকের সম্মান আমার পাওয়াই চাই। আমি অনেক বলি যে না হে আমি অত্যন্ত ছোট লেখক, য়ুরোপ আমাকে কোন সম্মানই দেবে না। তাই নিজের মধ্যে কোন ভরসাই পাই নে। ও বলে দিলীপবাবু তাহ'লে কখনো এত মিথ্যা শ্রম, অর্থাৎ কি না বাজে কাজ করতেন না। শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে নিশ্চয়ই আশা দিয়েছেন। আমি বলি তাহ'লে শ্রীঅরবিন্দই জানেন।

সেদিন বসিষ্ঠ না বশীশ্বর সেনের American স্ত্রী আমাকে বিশেষ অনুরোধ করেছেন তোমার 'নিষ্কৃতি'র অনুবাদ দেখবেন ব'লে। খবর পেয়েছেন তাতে শ্রীঅরবিন্দের কলমের দাগ পড়েছে, তাই প্রবল আগ্রহ। বলেন এর একটা copy তিনি April মাসের মাঝামাঝি Americaতে নিয়ে গিয়ে প্রকাশ করবার চেষ্টা করবেন। তিনি আগে ছিলেন Asia কাগজের Editor, সেখানকার বহু Publisherদের সঙ্গে সুপরিচিত। আমি ভাবি এটা নিষ্কৃতি না হয়ে শ্রীকান্ত হ'লেও না হয় কিছু আশা ছিল, কিন্তু ওদেশে নিষ্কৃতি আদর পাবে কিসের জোরে! সে যাই হোক, একটা copy আমাকে তুমি পাঠাও মন্টু। অন্ততঃ আমি নিজে দেখি কি রকম পড়তে হলো। বুদ্ধদেবও হয়ত এত দিনে এ-কথা তোমাকে জানিয়েছে। তুমি যা-যা জিনিসপত্র পাঠাতে বলেছিলে তাকে পাঠাতে

বলেচি। খুব সম্ভব এত দিনে তোমার কাছে পৌচেছে। নিষ্কৃতির ফরাসী অনুবাদের কল্পনাও তোমার আছে দেখতে পেলাম এবং চেষ্টা চরিত্রও করচো দেখচি। আমার নিজের বিশ্বাস নেই, শুধু ভাবি শ্রীঅরবিন্দের আশীর্ব্বাদে অঘটনও ঘটতে পারে। জগতে এ-ও হয়ত হয়।

তুমি ফকির মানুষ তবু আমার জন্যে অনেক কিছু তোমার খরচ হচ্ছে। এটুকু আমি পাঠিয়ে দেবো বুদ্ধদেব এবার আমার কাছে এলেই। এই বুদ্ধদেব ছেলেটি ভারি পণ্ডিত। সংস্কৃত এবং বোটানিতে চমৎকার জ্ঞান। কলেজে ও এই দুটোই পড়ায়।

মণ্টু, এবার শ্রীকান্ত ধরো। বেঁচে থাকতে এর অনুবাদটা চোখে দেখে যাই।

সাহানা ও তোমার গানের বই পেয়েছি এবং সযত্নে আলমারিতে তুলে রেখে দিয়েছি। সাহানাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিও।

আমি চিঠির জবাব দিতে যতই কুড়েমি করি নে কেন তুমি যেন ভ্রমেও তার শোধ নিও না। সাত-আট দিন পরে আবার দেশের বাড়িতে সকলে যাচ্ছি। যদিও যখন যাওয়া হবে তোমাকে ঠিকানা জানাবো। ইতিমধ্যে নিষ্কৃতির তর্জ্জমার একটা কপি কলকাতার ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও।

আশা করি সকলে কুশলে আছো। আমার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ রইল। ইতি—শরৎদা।

কল্যাণীয়েষু,—মণ্টু, আজ তোমার পোষ্টকার্ড ও 'বহুবল্লভে'র ফর্ম্মার পুলিন্দা পেলাম। তুমি হয়ত জানো না যে আমি ৮।৯ মাস অত্যন্ত অসুস্থ। শয্যাগত বললেও অতিশয়োক্তি হয় না। গেল জ্যৈষ্ঠ মাসে

দেশের বাড়ি থেকে এখানে আসবার পথে sun-strokeএর মতো হয়, সেই পর্য্যন্ত চোখের ও মাথার ব্যথায় কত যে পীড়িত সে আর বলবো কি। আজও সারে নি, বাকি দিন কটায় সারবে কি না তাও জানি নে। তার ওপর আছে অর্শের অজস্র রক্তস্রাব (বহু পুরাতন ব্যাধি) এবং মাসখানেক থেকে সুরু হয়েছে মাঝে মাঝে জ্বর। তোমাকে চিঠি লিখচি জ্বরের উপরেই। দেশের বাড়িতেই থাকি, শুধু মাঝে মাঝে একটু ভাল থাকলে কলকাতায় আসি। লেখা কিম্বা পড়া সমস্তই বন্ধ। খবরের কাগজ পর্য্যন্ত না। এ জীবনের মতো লেখাপড়া যদি শেষ হয়েই থাকে ত অভিযোগ করব না। যেটুকু সাধ্য ও শক্তি ছিল করেছি, তার বেশি যদি না-ই পারি ক্ষোভ করতে যাবো কেন? মনের মধ্যে আমি চিরদিনই বৈরিগী—এখনও তা-ই যেন থাকতে পারি।

এক দিন বুদ্ধদেব ভটচায এসে বলেছিল মন্টুবাবুর 'দোলা' চমৎকার হয়েছে। শুনে বিস্মিত হই নি। আমি মনে মনে জানি মন্টুর উপন্যাস উত্তরোত্তর চমৎকার থেকে আরো চমৎকার হবেই। অকৃত্রিম সাধনার ফল যাবে কোথায়? তাছাড়া উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া রয়েছে artist হৃদয়। যেমন বৃহৎ তেমনি ভদ্র তেমনি পরদুঃখকাতর। তোমার রসজ্ঞ মনের পরিচয় ছেলেবেলাতেই তোমার সংগীতে, তোমার গুণিজনের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগে, তোমার নানা কাজে আমি পেয়েছিলাম। তোমার প্রতি স্নেহও আমার তাই অকৃত্রিম। কোন বাইরের ঘাত প্রতিঘাতেই তা মলিন হবার নয়। তোমার লেখার সম্বন্ধে যে শুভকামনা বহুদিন পূর্ব্বে করেছিলাম আজ তা সফল হ'তে চল্‌লো এ আমার বড় আনন্দ। আবার আশীর্ব্বাদ করি জীবনে তুমি সুখী হও, সার্থক হও।

বুদ্ধদেব বসুর 'বাসর ঘর' বই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন আমি দেখি নি। বুদ্ধদেব বসু যদি ব'লে থাকেন আমার চেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঢের,

বড় ঔপন্যাসিক সে তো সত্যি কথাই বলেছে মণ্টু। নিজের মন ত জানে এ সত্য,—পরম সত্য।

এ ছাড়াও আর একটা কথা এই যে আমার চেয়ে কে বড়ো কে ছোটা এ নিয়ে যথার্থই আমার মনে কোন আক্ষেপ, কোন উদ্বেগ নেই। রবীন্দ্রনাথ যদি বল্‌তেন আমার কোন বই-ই উপন্যাস-পদ-বাচ্য নয়, তাতেও বোধ করি একটা সাময়িক বেদনা ছাড়া আর কিছুই মনে হতো না। হয়ত বিশ্বাস করা শক্ত, হয়ত মনে হবে আমি অত্যধিক দীনতা প্রকাশ করচি, কিন্তু এই সাধনাই আমি সারা জীবন করেছি। এই জন্যই কোন আক্রমণেরই প্রতিবাদ করি নে। যৌবনে এক আধটা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে করেছিলাম বটে কিন্তু সে আমার প্রকৃতি নয়, বিকৃতি। নানা হেতু থাকার জন্যেই হয়ত ভুল ক'রে করেছিলাম।

স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে, বেশি দিন আর এখানে থাকতে হবে মনে করি নে, এই সামান্য সময়টুকু যেন এমনি ধারা মন নিয়েই থাকতে পারি। যৌবনের কিছু কিছু ভুঁলের জন্যে পরিতাপ হয়। একটা কথা আমার মনে রেখো মণ্টু, কোন কারণেই কাউকে ব্যথা দিও না। তোমার কাজই তোমাকে সফলতা দেবে।

বাড়িগুলো তোমার বিক্রী ক'রে দিচ্চো? কিন্তু এর কি কোন প্রয়োজন আছে? এ-দেশের সকল সম্বন্ধ তুমি ছিন্ন ক'রে ফেলচো ভাবলে বড় ক্লেশ বোধ হয়।

আমার চিঠি-লেখা চিরকালই এলো-মেলো হয়, বিশেষতঃ এই পীড়িত দেহে। যদি কোথাও অসংলগ্ন কিছু লিখে ফেলে থাকি কিছু মনে কোরো না। ভাল যদি একটু বোধ ক.র তোমার দুখানা বইই মন দিয়ে পড়বো। ইতি—শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৩রা মাঘ, ১৩৪২

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,—তোমার চিঠি এবং কবির চিঠির নকল একসঙ্গে কাল পেয়েছি। এখানে চিঠি আসতে যেতে দুদিন লাগে না হলে উত্তরটা এবার একটু শীঘ্র পেতে।

অকস্মাৎ কে যে কবিকে আমার কথা লিখে জানিয়েছে ঠাউরে পেলাম না, কিন্তু কথাটা আমি বলেছি তা সত্য। আমার ধারণা ছিল তিনি আমার প্রতি বিরক্ত, তাই ১লা বৈশাখে বোলপুর যাবার জন্যে আমাকে তুমি অনুরোধ করলেও আমি যাই নি। যাই হোক্ এখন নিশ্চয়ই জানলাম ধারণা আমার ভুল। মস্ত স্বস্তি।

এই শনিবারে তোমার ও তোমার সাগ্‌রেদদের গান-বাজনা শোনবার জন্যে হয়তো যাবো। নিজেরও একটা কাজ আছে। আমার এখানে আসবার ৩।৪ খানা গাড়ী আছে। Deulty. Ry Station, B. N. Ry. টাইম টেব্‌ল একখানা কিনে সময় দেখে নিয়ো। সময় লাগে প্রায় ঘণ্টা দেড়। ষ্টেশন থেকে হেঁটে আসতে হয়—আধ ঘণ্টা লাগে। যদি জানতে পারি কবে এবং কোন গাড়ীতে আস্‌বে আমি লোক পাঠিয়ে দেব তোমাকে আন্‌তে। শোবার যায়গা কোন মতে একটুখানি দিতে পারবো।

পরশু কলকাতায় গিয়েছিলাম, ভবানীপুর থেকে ফেরবার সময় ইচ্ছে হয়েছিল তোমাদের ওখানে যাই, কিন্তু পাছে না থাকো এই ভয়েই যাওয়া হয়নি। শরীর নেহাৎ মন্দ যাচ্ছে না।

কবিবরের চিঠি আমাকে দিয়ে ভারি বুদ্ধির কাজ করেছ এ আমাকে স্বীকার করতেই হবে। তোমার কল্যাণ হোক্।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

["আত্মশক্তি" পত্রিকার সম্পাদককে লেখা]

৫ই আশ্বিন, ১৩৩৪

শ্রীযুক্ত আত্মশক্তি-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,—

আপনার ৩০শে ভাদ্রের আত্মশক্তি কাগজে মুসাফির লিখিত—"সাহিত্যের মামলা" পড়িলাম। একদিন বাঙ্‌লা সাহিত্যে সুনীতি দুর্নীতির-আলোচনায় কাগজে কাগজে অনেক কঠিন কথার সৃষ্টি হইয়াছে, আর অকস্মাৎ আজ সাহিত্যের 'রসের' আলোচনায় তিক্ত রসটাই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এম্‌নিই হয়। দেবতার মন্দিরে সেবকের পরিবর্ত্তে 'সেবায়তের' সংখ্যা বাড়িতে থাকিলে দেবীর ভোগের বরাদ্দ বাড়ে না, কমিয়াই যায়। এবং মামলা ত থাকেই।

আধুনিক সাহিত্য-সেবীদের বিরুদ্ধে সম্প্রতি বহু কুবাক্য বর্ষিত হইয়াছে। বর্ষণ করার পুণ্য কর্ম্মে যাঁহারা নিযুক্ত আমিও তাঁহাদের একজন। 'শনিবারের চিঠি'র পাতায় তাহার প্রমাণ আছে।

মুসাফির-রচিত এই "সাহিত্যের মামলা"র অধিকাংশ মন্তব্যের সহিতই আমি একমত, শুধু তাঁহার একটি কথায় যৎকিঞ্চিৎ মতভেদ আছে।

রবীন্দ্রনাথের ব্যাপার রবীন্দ্রনাথ জানেন, কিন্তু আমার নিজের কথা যতটা জানি তাহাতে শরৎচন্দ্র 'কল্লোল' 'কালি-কলম' বা বাঙ্‌লার কোন কাগজই পড়েন না বা পড়িবার সময় পান না, মুসাফিরের এ অনুমানটি নির্ভুল নয়। তবে, এ কথা মানি যে সব কথা পড়িয়াও বুঝি না, কিন্তু না-পড়িয়াও সব বুঝি এ দাবী আমি করি না।

এ তো গেল আমার নিজের কথা। কিন্তু যা লইয়া বিবাদ বাধিয়াছে সে জিনিসটি যে কি, এবং যুদ্ধ করিয়া যে কিরূপে তাহার মীমাংসা হইবে সে আমার বুদ্ধির অতীত।

রবীন্দ্রনাথ দিলেন সাহিত্যের ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়া এবং নরেশচন্দ্র দিলেন সেই ধর্ম্মের সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া। যেমন পাণ্ডিত্য তেম্‌নি যুক্তি। পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ভাবিলাম, ব্যস! ইহার পরে আর কথা চলিবে না। কিন্তু অনেক কথাই চলিল। তখন কে জানিত কাহার সীমানায় কে পা বাড়াইয়াছে, এবং সেই সীমানার চৌহদ্দি লইয়া এত লাঠি ঠ্যাঙ্গা উদ্যত হইয়া উঠিবে। আশ্বিনের 'বিচিত্রা'য় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মহাশয় "সীমানা বিচারের" রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ঠাসবুনানি বিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী ব্যাপার। কত কথা, কত ভাব। যেমন গভীরতা, তেম্‌নি বিস্তৃতি, তেম্‌নি পাণ্ডিত্য। বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, গীতা, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কালিদাসের ছড়া, উজ্জ্বল নীলমণি, মায় ব্যাকরণের অধিকরণ কারক পর্য্যন্ত। বাপ্ রে বাপ্! মানুষে এত পড়েই বা কখন্, এবং মনে রাখেই বা কি করিয়া!

ইহার পার্শ্বে "লাল শালু-মণ্ডিত বংশখণ্ড-নির্ম্মিত ক্রীড়া গাণ্ডীব" ধারী" নরেশচন্দ্র একেবারে চ্যাপ্‌টাইয়া গিয়াছেন। আজ ছেলেবেলার একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। আমাদের অবৈতনিক নব-নাট্য-সমাজের বড় অ্যাক্টর ছিলেন নরসিং বাবু। রাম বল, রাবণ বল, হরিশ্চন্দ্র বল, তাঁহারই ছিল একচেটে। হঠাৎ আর একজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন তাঁর নাম রাম-নরসিং বাবু। আরও বড় অ্যাক্টর! যেমন দরাজ গলার হুঙ্কার তেম্‌নি হস্ত-পদ সঞ্চালনের অপ্রতিহত পরাক্রম। যেন মত্ত হস্তী। এই নবাগত রাম-নরসিং বাবুর দাপটে আমাদের শুধু-নরসিং বাবু একেবারে তৃতীয়ার শশি-কলার ন্যায় পাণ্ডুর হইয়া গেলেন। নরেশবাবুকে দেখি নাই, কিন্তু কল্পনায় তাঁহার মুখের চেহারা দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন তিনি যুক্ত হস্তে চতুরাননকে গিয়া বলিতেছেন, প্রভু! ইহার চেয়ে যে আমার বনে বাস করা ভাল।

দ্বিজেন্দ্রবাবুর তর্ক করিবার রীতিও যেমন জোরালো, দৃষ্টিও তেম্‌নি ক্ষুরধার। রায়ের মুসাবিদায় কোথাও একটি অক্ষরও যেন ফাঁক না পড়ে এম্‌নি সতর্কতা। যেন বেড়া-জালে ঘেরিয়া রুই-কাত্‌লা হইতে শামুক-গুগ্‌লি পর্য্যন্ত ছাঁকিয়া তুলিতে বদ্ধ-পরিকর।

হায় রে বিচার! হায় রে সাহিত্যের রস! মথিয়া মথিয়া আর তৃপ্তি নাই। ডাইনে ও বামে রবীন্দ্রনাথ ও নরেশচন্দ্রকে লইয়া অক্লান্তকর্ম্মী দ্বিজেন্দ্রনাথ নিরপেক্ষ সমান তালে যেন তুলাধুনা করিয়াছেন।

কিন্তু ততঃ কিম্‌?

এই কিম্‌ টুকুই কিন্তু ঢের বেশি চিন্তার কথা। নরেশচন্দ্র অথবা দ্বিজেন্দ্রনাথ ইঁহারা সাহিত্যিক মানুষ। ইঁহাদের ভাব-বিনিময় ও প্রীতি-সম্ভাষণ বুঝা যায়, কিন্তু এই সকল আদর-আপ্যায়নের সূত্র ধরিয়া যখন বাহিরের লোকে আসিয়া উৎসবে যোগ দেয় তখন তাহাদের তাণ্ডব নৃত্য থামাইবে কে?

একটা উদাহরণ দিই। এই আশ্বিনের 'প্রবাসী' পত্রিকায় শ্রীব্রজ-দুর্ল্লভ হাজরা বলিয়া এক ব্যক্তি রস ও রুচির আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহার আক্রমণের লক্ষ্য লইতেছে তরুণের দল। এবং নিজের রুচির পরিচয় দিতে গিয়া বলিতেছেন, "এখন যেরূপ রাজনীতির চর্চ্চায় শিশু ও তরুণ, ছাত্র ও বেকার ব্যক্তি সতত নিরত," সেইরূপ অর্থোপার্জ্জনের জন্যই এই বেকার সাহিত্যিকের দল গ্রন্থরচনায় নিযুক্ত। এবং তাহার ফল হইয়াছে এই যে, "হাঁড়ি চড়াইয়া কলম ধরিলে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে।"

এই ব্যক্তি ডেপুটি-গিরি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, এবং আজীবন গোলামির পুরস্কার মোটা পেন্সনও ইহার ভাগ্যে জুটিয়াছে। তাই সাহিত্য-সেবীর নিরতিশয় দারিদ্র্যের প্রতি উপহাস করিতে ইহার

সঙ্কোচের বাধা নাই। লোকটি জানেও না যে দারিদ্র্য অপরাধ নয়, এবং সর্ব্ব দেশে ও কালে ইহারা অনশনে প্রাণ দিয়াছে বলিয়াই সাহিত্যের আজ এত বড় গৌরব।

ব্রজদুর্ল্লভ বাবু না জানিতে পারেন কিন্তু 'প্রবাসী'র প্রবীণ ও সহৃদয় সম্পাদকের ত এ-কথা অজানা নয় যে সাহিত্যের ভাল-মন্দর আলোচনা ও দরিদ্র সাহিত্যিকের হাঁড়ি-চড়া না-চড়ার আলোচনা ঠিক এক বস্তু নয়। আমার বিশ্বাস তাঁহার অজ্ঞাতসারেই এত বড় কটূক্তি তাঁহার কাগজে ছাপা হইয়া গেছে। এবং এজন্য তিনি ব্যথাই অনুভব করিবেন। এবং হয়ত, তাঁহার লেখকটিকে ডাকিয়া কানে কানে বলিয়া দিবেন, বাপু, মানুষের দৈন্যকে খোঁটা দেওয়ার মধ্যে যে রুচি প্রকাশ পায় সেটা ভদ্র সমাজের নয় এবং ঘটি চুরির বিচারে পরিপক্কতা অর্জ্জন করিলেই সাহিত্যের "রসের" বিচারে অধিকার জন্মায় না। এ দুটোর প্রভেদ আছে, কিন্তু সে তুমি বুঝিবে না।

[শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়কে লেখা]

সামতাবেড়, জেলা হাবড়া। ২৭, ৮, ২৭

পরম কল্যাণবরেষু,

মণীন্দ্র, তোমার চিঠি পেলাম। তোমার চিঠি পড়লে মনে হয় এখ্‌খুনি যাই, কিন্তু আমি ত ভাই সুস্থ নই, প্রায় দু হপ্তা থেকে influenzaর মত হয়ে ভারি দুর্ব্বল ক'রে রেখেছে। তা' ছাড়া বৃষ্টি বাদলে রেল ষ্টেশনের একটি মাত্র পথ যা' হয়ে আছে তাতে যাওয়ার কল্পনা করতেও ভয় হয়। পাল্‌কি নিয়ে চল্‌তে বেহারা আশঙ্কা করে হয়ত পা পিছলে বাঁধ থেকে একেবারে খালে ফেলে দেবে। আচ্ছা বায়গাতেই এসে পড়েছি। এখানকার লোকের একটা সুবিধে আছে। তাদের এই বর্ষাকালে পায়ে খুর গজায়,—তাতেই দিব্যি খট্‌ খট্‌ ক'রে হেঁটে চলে,—পিছলকে ভয় করে না। আমার এখনো ওটা গজায় নি—তবে এরা ভরসা দিয়েছে আরও দু-এক বছর একাদিক্রমে বাস করলেই গজাবে। অসম্ভব নয়। কিন্তু আমি বলেছি খুরে আমার কাজ নেই, আমি বরঞ্চ যেখানে ছিলাম সেখানেই ফিরে যাবো।

তোমার বাবার সঙ্গে যে কত কাল দেখা হয় নি মনেও করতে পারিনে। অথচ, তাঁর মিষ্টি স্বভাবটুকুর জন্যে তাঁর প্রতি আমার কতই না শ্রদ্ধা। তাঁকে আমার নমস্কার দিয়ো। একটু জোর পেলেই গিয়ে একবার দেখে আসবো।

ষোড়শী অভিনয় আমি একবার মাত্র দেখেছি, এবং তারই জের চলছে। জলে ভিজে, কাদায় হেঁটে এই influenza। তুমি পারো ত একবার গিয়ে দেখে এসো। বাস্তবিকই শিশির[1] এবং চারুর[2] (জীবানন্দ—ষোড়শী) অভিনয় দেখবার মত বস্তু। আমার আশীর্ব্বাদ জেনো। দাদা।

১। শিশিরকুমার ভাদুড়ী। ২। তখনকার বিখ্যাত অভিনেত্রী চারুশীলা দেবী।

৮, ২, ৩২

পরম কল্যাণীয়েষু,

মণি, তোমার চিঠি পেলাম। সেদিন তোমার অপরিসীম দুঃখ ও বেদনার ছবি আমার খুবই মনে আছে। প্রায় সর্ব্বদাই মনে পড়ে। আশীর্ব্বাদ করি এর থেকে তুমি যেন মুক্ত হতে পারো! উপায়হীন ব্যথার মত ব্যথা সংসারে আর নেই।

সরস্বতী পূজোর সময়ে আমার বাড়ীর বার হওয়া চলে না। আমি অন্যান্য বারে তার পরের দিন বাইরে যাই, কিন্তু এবারে শনিবারে বড়বোয়ের[১] একটা ব্রত প্রতিষ্ঠার বাকি বামুন খাওয়ানোর দিন, আমার এ কথাটা সেদিন মনে ছিল না। তাই মঙ্গলবারেই যেতে পারবো ভেবেছিলাম। আমি এই মঙ্গলবারের পরের মঙ্গলবারে বেরিয়ে পড়বো। অর্থাৎ ১৬ই ফেব্রুয়ারী।...

আমি এক রকম আছি। লোকের আসার বিরাম নেই—দলে দলে। বিশেষতঃ কংগ্রেস বে-আইনি হবার দরুণ যারা অনাথ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাঁদের। ইতি—দাদা

পরম কল্যাণীয়েষু,

মণি, সেদিন রাত্রে ফিরে এসে বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ের অবধি রইল না। বাড়ীময় আলো, রাত দেড়টায় ওপরের বারান্দায় সার দিয়ে দাঁড়িয়ে ও-বাড়ীর মেয়েরা—নীচেও ৫ ৬ জন লোক, ভাবলাম ভয়ানক কিছু একটা নিশ্চয় ঘটেছে। দেখলাম তাই বটে, ডাক্তার এসেছিলেন, বুড়ীর[২]

১। শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীর।

২। শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা মুকুলমালা। ছেলে বেলায় এঁর ডাক নাম ছিল বুড়ী।

১০৪, ১০৪'৫ জ্বর, পেটে ভয়ানক যন্ত্রণা প্রায় সারা দিনই যন্ত্রণা চলচে।

কিন্তু তোমাদের আশীর্ব্বাদে সে সেরে উঠেছে। কাল থেকে জ্বর নেই, আজও জ্বর হয় নি, খেলাধূলো করে বেড়াচ্ছে। বোধ করি আর কিছু হবে না, এমনি ভালো হয়ে যাবে।

সুতরাং, যাওয়াই স্থির কোরলাম।[১] রাত্রে ৮-২৪ ট্রেনে শুক্রবারেই রওনা হবো, আশা করি তুমি যেতে আপত্তি করবে না। Howrah স্টেশনেই তোমাকে প্রতীক্ষা কোর্ব্ব। ননী[২] সঙ্গে যাবে, তুমি যদি শুধু একটা টিফিন পটে একটু খাদ্যবস্তু ও একটা কুঁজোতে খাবার জল নাও, বড় ভালো হয়। এখান থেকে ঐগুলো নিয়ে যাবার ভারি অসুবিধে হয়। পথ তো সোজা নয়।

বউমাকে[৩] বোলো একটা দিন মাত্র, বড় জোর তার পর দিনটাও হতে পারে, যদি একবার ঘণ্টা কয়েকের জন্যে পুরীতে ৺জগন্নাথ দেখতে যাই। কটক থেকে পুরী তো বেশি দূর নয়। যদি যেতেই হোলো ত ওটা না দেখে আর ফিরবো না।

এদের অনেক দিনের অনুরোধ যাবার, এবার নিশ্চয়ই সেটা সম্ভব হবে যদি না ইতিমধ্যে আর কোন দুর্ঘটনা ঘটে। বুড়ীর অসুখের জন্যে যাত্রা তো প্রায় বন্ধ করেই দিয়েছিলাম। অন্যান্য মঙ্গল। বউমাকে ও ছেলেমেয়েদের আশীর্ব্বাদ দিয়ো। দাদা

হাবড়া। ১২, ৪, ৩২

১। শরৎচন্দ্র এই সময় কটক থেকে নিমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে যাওয়া স্থির করেছিলেন।

২। শরৎচন্দ্রের অন্যতম ভৃত্য।

৩। মণিবাবুর স্ত্রী।

পরম কল্যাণীয়েষু,

দেহটা আবার গোল বাধিয়েছে ; স্থির করেছি ঐ নিয়ে আর নালিশ জানাবো না—এই এ সম্বন্ধে শেষ। পায়ের ব্যথাটা যে বাত নয়, সেই পুরাতন আঘাতের জের এটাও এবারে নিঃসন্দেহে বোঝা গেছে। এখন বড়বোয়ের চিকিৎসা সুরু হয়েছে—তিনি নাকি এই মুসব্বরের প্রলেপ দিয়ে অনেকের আঘাত-পাওয়া ব্যথা আরোগ্য করেছেন। তিন চার দিন লাগানো হচ্চে, অনেকটা ফল পাওয়া গেছে। নির্দ্দোষ নিরাময় হবে কিনা জানিনে, কিন্তু যন্ত্রণার হাত থেকে সাময়িক একটু অব্যাহতি পেয়েছি।

তোমাদের ওখানে যাবার জন্যে মনে মনে ছট্‌ফট্ করচি, কিন্তু সাহস সঞ্চয় করতে ভয় হচ্চে। পাছে তোমাদের বিব্রত করি।

বৌমা ও ছেলেমেয়েদের আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ দিয়ো। দিন ৪।৫ গেলো ছোট বৌমা বাঘাকে[১] নিয়ে বাপের বাড়ী মুঙ্গেরে গেছেন। কেবল বুড়ী রইলো, মামার বাড়ীতে যেতে চাইলে না, বড়বৌও ছেড়ে দিলেন না। অন্যান্য খবর ভালো। ইতি ২৯শে ফাল্গুন ৩৮। দাদা

পুঃ তোমার দেওয়া m. ss. লেখবার কাগজগুলি চমৎকার হয়েছে। খুব আনন্দিত হয়েছি। শরৎ

পরম কল্যাণীয়েষু,

মণি, সেই পর্য্যন্ত আমি অসুখ বিসুখের ঘূর্ণাবর্ত্তে দিন কাটাচ্ছি। মুকুলের হঠাৎ হোলো লিভারের ব্যথা এবং জ্বর! বউমা ঠিক এই ভয়টা সেইদিন করেছিলেন ; তাই হোল অবশেষে। তিনটে এমিটিন ইনজেক্‌শন্ দিয়ে এবং অন্যান্য ওষুধ খাইয়ে সে একটু আছে ভালো। তার সম্বন্ধে আর চিন্তা নেই, অন্ততঃ সম্প্রতি।

১। শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশবাবুর পুত্র শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায়। ছেলেবেলায় এঁর ডাক নাম ছিল বাঘা।

তার পরে হঠাৎ মুখুয্যে মশাই[১] নিলেন শয্যা। আশঙ্কা হোয়েছিল এ যাত্রায় বোধকরি আর তাঁকে ধরে রাখা গেল না। রক্তের চাপ বেড়ে গেছে ২২০তে। বয়সও হোল ৭৩, কিন্তু তা বোললে তো হয়না। তাঁর যাওয়া মানে আমাদেরও এখান থেকে যাওয়া। এখন তাঁকেই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছি। তবে আজ একটু আছেন ভালো। প্রস্রাব পরীক্ষা হয়ে এলো, তাতে কোন দোষ নেই—এটা ভারী আশার কথা। যাই হোক, না আঁচালে বিশ্বাস নেই। এতো ঠিক রায় বাড়ীর ফলার নয়, এখানে শেষ পর্য্যন্ত ফলার নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবার ভয় থাকেই।

তারপরে নিজে। আনন্দ স্বামিজীকে বেলো failed! absolutely failed! failed ignominiously! রক্তধারা বোধকরি নায়গ্রা প্রপাতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কোরতে চায়[২]।

তারপরে হোল কটকের Engagement, এ শুক্রবারে যেতেই হবে। তোমার ঠিকানায় আমাকে খবর দেবার কথা ছিল, বোধ করি তুমিও সম্বাদ পেয়েছো। যাওয়া চাই …

আমি সেই ট্রেনেই হাবড়া পৌঁছব। যদি দেখো আমি নেই, নিশ্চয় জেনো খড়্গাপুরে অপেক্ষা করে আছি। তবে আশা করি তা' হবে না, হাবড়াতেই যাবো এবং দুজনে একত্রেই রওনা হবো। আমার এবং ননীর একটু খাবার নিয়ো ভাই। দাদা

পুঃ তুলু বল্‌চে আর লিখ্‌লে ট্রেন পাবেন না।

১। শরৎচন্দ্রের ভগ্নীপতি পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।

২। শরৎচন্দ্রের অর্শের রোগ ছিল। এই সময় আনন্দ স্বামী নামে এক সন্ন্যাসী শরৎচন্দ্রের অর্শ সারিয়ে দেবেন বলে তাঁকে ওষুধ দিয়েছিলেন। কিন্তু সে ওষুধে কিছুই কাজ হয় নি। তাই শরৎচন্দ্র এখানে স্বামীজীর ওষুধের ব্যর্থতা এবং ঐ সঙ্গে পরিহাস করে নিজের অর্শের রক্তপাতের কথা উল্লেখ করেছেন।

[জলধর সেনকে লেখা]

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট,

জেলা হাবড়া

দাদা,

শেষপ্রশ্নের কিছুই লিখতে পারলাম না অসুখের জন্যে। সমস্ত দিন মাথা ভার হয়ে থাকে, কোন চিন্তার কাজই করতে পারিনি। দিন হ'ল সেটা সেরেছে। আমার লেখার ব্যাপারে এ ত্রুটি তো বচ্ছর দেখে আসচেন, সুতরাং খারাপ লাগলেও আশ্চর্য্য যে হন নি এ কথা নিশ্চয় জানি। আবার এমনি কোরেই অবশেষে একদিন বই শেষও হয়।[১]

এই ছেলেটির হাতে এঁরই লেখা একখানা বই পাঠালাম। সেবার এর কথাই আপনাকে গল্প করেছিলাম। বইখানি পড়ে দেখলে বোধ হয় খুসি হবেন। লেখকের নাম সুধীরেন্দু, এঁর ভারি ইচ্ছে ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়। যদি কোথাও প্রয়োজন মনে করেন তো আমি নিজেই সংশোধন করে দেবো। সে যাই হোক্, মন দিয়ে গল্পটি একবার পড়ে দেখবেন। ৩০।৯।২৮

স্নেহাকাঙ্ক্ষী

শরৎ

১। সাহিত্য-রচনায় শরৎচন্দ্রের যথেষ্ট কুঁড়েমি ছিল। তিনি যখন রেঙ্গুন থেকে "ভারতবর্ষে" লিখতেন, তখন চিঠির পর চিঠি দিয়ে তাগাদা করে লেখা আদায় করতে হ'ত। তারপর রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে যখন নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে ভারতবর্ষে লিখতে লাগলেন, তখনও ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধর সেনকে শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে একরূপ রীতিমত ধর্ণা দিয়েই তবে ভারতবর্ষের জন্য লেখা আদায় করে আনতে হ'ত।

[চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা]

হাবড়া Ry. Statioı
1st. April, 1930

ভাই চারু,

আজ ঢাকার জন্যে রওনা হয়েও বাড়ী ফিরে যাচ্ছি। আ কলকাতায় গাড়োয়ানের দল ধর্ম্মঘট এবং সত্যাগ্রহ করায় অর্থা C. S. P. C. A.র কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করার ফলে একট মহামারী ব্যাপার ঘটে, Serjeantদের সঙ্গে পেটাপেটি হয়, কেল্লা থেবে গোরা এসে গুলি চালায়। শুনচি ৪ জন মরেছে।

ও তো গেল কলকাতার কথা। কিন্তু হাবড়া সহরেও C.S.P.C.A আছে এবং আমি তার Chairman. এও একটা বড় department আজ হাবড়ার Magistrate এবং S. P. কোন মতে হাবড়ার দাঙ্গ বাঁচিয়েছে কিন্তু কাল কি ঘটে বলা যায় না। অথচ, এই Department এর কর্ত্তা হয়ে আমার এ সময়ে দেশ ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলে না এই জন্যেই মাঝপথ থেকে ফিরে যাচ্ছি। কাল সকালেই আবার ফি আসতে হবে।

জানি তুমি অতিশয় দুঃখিত হবে কিন্তু এই না-যাওয়াটা আমা নিতান্তই দৈবের ব্যাপার।

একটু গোলমাল থামুক, নিজের অফিসটা সামলে নিই। তারপ তোমার সঙ্গে দেখা করে আসবো। আশা করি মার্জ্জনা করবে।

তোমার—শরৎ

২৮শে মাঘ ১৩৪২

প্রিয়বরেষু,

ভাই চারু, ইতিমধ্যে আমি বাড়ী গিয়েছিলাম। পাড়াগাঁয়ের মাটির বাড়ী আর রূপনারায়ণ নদ,—এদের মায়া কাটিয়ে আমি বেশি দিন কোথাও থাকতে পারি নে। তবে এও সত্যি, এদের মায়া কাটিয়ে যাবারও বেশি দিন বাকি নেই। পুরনো বন্ধু-বান্ধব অনেকেই এগিয়ে গেছেন। তাঁদের আমি নিত্যই স্মরণ করি। এইমাত্র এলো অধ্যাপক পরলোকগত বিপিন গুপ্তর শ্রাদ্ধসভায় যাবার আমন্ত্রণপত্র। শিবপুরে কত বিকাল বেলাই না একসঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করেছি। তুমি আছো একটি সাবেক কালের বন্ধু, আশা করি অন্ততঃ তোমার আগে যেন যেতে পারি। এ সংসারে আর একটা দিনও মন বসছে না চারু। কেবলই পিছনের কথা ভাবি, সুমুখের দিকে একবারও চোখ যায় না। কিন্তু যাক্ গে এ-সব কথা। তোমার মন খারাপ ক'রে দিয়ে লাভ নেই।

তোমার দু'খানা চিঠিই পেলাম। যাঁরা আমাকে উপাধি[১] দেবার প্রস্তাব করেছিলেন তাঁদের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসাই আমার সব চেয়ে বড় উপাধি। এই কথাটি মনে করলেই মন ভ'রে যায়।

ঢাকায় যদি যাওয়া হয় তোমার বাড়ীতে গিয়েই উঠবো, তুমি নিমন্ত্রণ করে না রাখ্‌লেও। তোমার গৃহিণীকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে বোলো, তাঁর আহ্বান অবহেলা করবো না।

তোমাদের

শরৎ

১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. লিট. উপাধি।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

ভাই চারু,

কাল তোমার চিঠি পেলাম। তোমার চিঠিখানি পড়েই মনে হ'ল এখনি চলে যাই। সেবার[১] তোমাদের যত্ন আদরের কথাগুলোই মনে পড়ে। সে কি আনন্দেই দিন কেটেছিল।

গত রবিবার দিন হঠাৎ বমি আর জ্বর—দিন দুই ভারি কষ্ট পেলাম। ডাক্তার এসে বললেন, ইতিমধ্যে বারাকপুর আর হুগলি জেলার নানাস্থানে ঘুরে এসেছেন, অতএব এ জ্বর ম্যালোয়ারি ছাড়া অন্য কিছু হতেই পারে না। ৬০।৭০ গ্রেণ কুইনিন ব্যবস্থা করে গেলেন। জ্বর আর হল না বটে কিন্তু দেহটা এখনো ভারি বে-এক্তার হয়ে রয়েছে। তোমাদের উৎসব[২] দিন পনেরো পরে যদি হোতো আমি নিশ্চয় গিয়ে যোগ দিতাম।

আর উৎসব না-ই হোলো। গিরিজা নরেন[৩] প্রভৃতি—এঁদের একটা নিমন্ত্রণ করে পাঠাও না। আমরা এক সঙ্গে এক বাড়ীতে জুটলেই তো উৎসব সুরু হবে।

চারু, তুমি তো আসতে পারো না, সুতরাং আমার পরামর্শ এঁদের একবার ঢাকায় ডাক দাও। আমি তো আছিই।

তোমার গৃহিণীর আতিথেয়তা—আড়ম্বর নেই, অথচ সমাদরের

১। শরৎচন্দ্র মুন্সীগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন সেরে যখন ঢাকা গিয়েছিলেন।

২। ঢাকা হলের সাহিত্য অনুষ্ঠান।

৩। গিরিজাকুমার বসু, নরেন্দ্র দেব

কাথাও ত্রুটি খুঁজে পাবার যো নেই—আমার সমস্ত মনে আছে। অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নেই—বাস্তবিক লোভ হচ্ছে যাবার।

পাথেয়[১] আমি নিই নে ভাই। ও অনুরোধটি কোরো না। আশা করি ছেলেপুলে ভালই আছে। তোমার গৃহিণীকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার দিয়ো। ইতি ৪ঠা চৈত্র—১৩৩৬ তোমার—শরৎ

পি ৫৬৬ মনোহরপুকুর রোড
কলিকাতা

ভাই চারু,

তোমার চিঠি পেলাম। তোমার ওখানে গিয়ে থাকবো না ত বিদেশে যাই কোথায়? তোমাদের দেশে (ঢাকায়) গিয়ে—যেখানে যেখানে যে সব সভা সমিতিতে আমাকে যোগ দেবার জন্যে আহ্বান এসেছে, আমি সকলকেই এই জবাব দিয়েছি যে সেখানে না যাওয়া পর্য্যন্ত তারিখ নির্দ্দিষ্ট হতে পারে না। এ কথাও তাঁদের জানিয়েছি যে, আমি চারুর বাড়ীতে গিয়ে উঠবো।

আজ শ্রীযুক্ত তুলসী গোস্বামী এসে বলছিলেন—শরৎদা, আমি আপনার secretary হয়ে ঢাকায় যাবো। আমাদের উপেনমামা (বিচিত্রার)[২] বলছিলেন তাঁরও ঢাকা যাবার ইচ্ছে। উপেন শেষ পর্য্যন্ত হয়ত যেতে পারবে না কিন্তু তুলসী সম্ভবতঃ যাবে। কোথায় তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা যায় বলত?

১। চারুবাবু শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলেন যে, তিনি যদি ঢাকায় যান তাহলে তাঁর পথ-খরচ পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এরই উত্তরে শরৎচন্দ্র একথা লিখেছিলেন।

২। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এই সময় ইনি 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তুলসীবাবু কি উপেনবাবু কেউই যেতে পারেন নি।

আর একটা কথা। আমাকে কি একটা গাউন তৈরি করিয়ে নিয়ে যেতে হবে?[১] জীবনে আর কখনো প্রয়োজন হবে না শুধু একটা দিনের জন্যে একি বিপদ। সঙ্গে একটা তৈরি করিয়ে নিয়ে যাবো? ইতি—২রা শ্রাবণ, ১৩৪৩।

তোমার স্নেহার্থী—শরৎ

২৪, অশ্বিনী দত্ত রোড
কলিকাতা

প্রিয়বরেষু,

চারুচন্দ্র, আজ প্রভাতে এসে পৌছেছি। বরাবর রহমান সাহেব আমার সকল প্রকার সুখ সুবিধার প্রতি চোখ রেখেছিলেন।[২]

জাহাজে জ্বর হয়েছিল কিন্তু খুব বেশি নয়। তোমাদের সমস্ত খবর জানিও, বিশেষ করে দীপুর।[৩] তার কথাটাই আমার সর্ব্বদাই মনে হয়, অথচ সেবা করেছে কোরক আর হীরক।[৪] বৌমাকে[৫] আমার আশীর্ব্বাদ দিও, এবং তোমরা উভয়ে আমার অন্তরের প্রীতি জেনো। অসুস্থ মানুষকে যে যত্ন তোমরা করেছো তার সবিশেষ বৃত্তান্ত সবিস্তারে দিয়েছে আমাদের সীতানাথ।[৬]

১। ডি. লিট. উপাধি নেওয়ার জন্য।

২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার এ. এফ. রহমান। ইনিও ঐ সময় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কলকাতায় আসছিলেন।

৩। চারুবাবুর পুত্র দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। কোরক ও হীরক চারুবাবুর অপর দুইপুত্র।

৫। চারুবাবুর পুত্র অধ্যাপক কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী।

৬। শরৎচন্দ্রের অন্যতম সঙ্গী। শরৎচন্দ্র ঢাকায় গিয়ে ডি. লিট. উপাধি নেবার

আজ জ্বর নেই, একদিন অন্তরই দেখি বেশি হয়। কনককে বোলো তার চিঠিটা আমি সর্ব্বদাই মনে রাখবো।

ওদুদ সাহেব[১] কাজী সাহেব[২] তাঁরা আমার প্রীতি নমস্কার যেন জানতে পারেন। আজ আনন্দ-বাজারে দেখলাম, Dacca Intermediate College কেন অভ্যর্থনা বলো, অভিনন্দন বলো করেন নি। যাক্।

১৩শে শ্রাবণ ১৩৪৩ শরৎ

পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর খুব জ্বর হয়। সেই সময় প্রবল জ্বরের জন্য শরৎচন্দ্র কয়েকদিন আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলেন। সেই সময়কার তাঁর সেবার কথা পরে তিনি সীতানাথের কাছে শোনেন।

১। কাজী আবদুল ওদুদ ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের বাঙ্গলার অধ্যাপক ছিলেন।

২। কাজী মোতাহার হোসেন। ইনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক।

[শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়[১]কে লেখা]

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬

৮

ভূপেন,—একখানি মাসিক পত্রের তুমি সম্পাদক, catchword-এর মোহ যেন তোমাকে না পেয়ে বসে। কারণ, এ-কথা তোমার কিছুতেই ভোলা উচিত নয় যে, বিপ্লব এবং বিদ্রোহ এক বস্তু নয়। কোথাও দেখেচ কি বিপ্লব দিয়ে পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়েছে? ইতিহাসে কোথাও এর নজির আছে? বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন দেশেই Govt.-এর form অথবা সামাজিক নীতিরও পরিবর্ত্তন করা যায়, কিন্তু বিপ্লব দিয়ে পরাধীন দেশকে স্বাধীন করা যায় ব'লে আমার মনে হয় না। তার কারণ কি জানো? বিপ্লবের মাঝে আছে class war, বিপ্লবের মাঝে আছে civil war :—আত্মকলহ ও গৃহবিচ্ছেদ দিয়ে আর যাই কেন করা যাক্, দেশের চরম শত্রুকে পরাভূত করা যাবে না। বিপ্লব ঐক্যের পরিপন্থী।

সামতাবেড়, পানিত্রাস

জেলা হাবড়া, ১০ই চৈত্র, ১৩৩৬

ভূপেন,—নববর্ষের সূচনায় তোমাদের 'বেণু'কে আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে আশীর্ব্বাদ করি। যে-জাতির সাহিত্য নেই, তাদের দারিদ্র্য যে কত বড়, এই পুরানো সত্যটা আমরা বর্ত্তমান কালে নানা উত্তেজনায় প্রায় ভুলে যাই। তার ফল হয় এই যে, হীনতার অন্ধকার জাতীয় জীবনে নিরন্তর গাঢ়তর হয়েই উঠতে থাকে। সমাজের মধ্যে আবর্জ্জনা অনেক জমেছে, বেদনা ও দুঃখেরও সীমা নেই, এ-

১। বেণু পত্রিকার সম্পাদক।

কথা আমরা সবাই জানি, কিন্তু তোমরা যে-কয়টি ছেলের দল এই ছোট কাগজখানিকে কেন্দ্র কোরে একসঙ্গে মিলেছো—তোমরা যে নর-নারীর যৌন-সমস্যাকেই সকল বেদনার পুরোভাগে স্থাপন কর নি, এইটিই আমার সবচেয়ে আনন্দের হেতু। পরাধীনতার দুঃখই তোমাদের সকল ব্যথার বড় হয়ে তোমাদের এই পত্রিকায় বারে বারে ফুটে ওঠে। প্রার্থনা করি, এ কাগজে এ নীতির যেন ব্যতিক্রম না হয়।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণবরেষু,

ভূপেন, কিছু দিন পূর্ব্বে তোমার চিঠি পেয়েছি কিন্তু তার পরেই আমাকে কুমিল্লায় যেতে হয়, এবং ফিরে এসেই বাড়ী যাই, এই জন্যে জবাব দিতে দেরি হয়ে গেলো। কিছু মনে ক'রো না। কবে যে তোমরা মুক্তি পাবে এবং কবে যে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে, এ কথা এই নির্জ্জন পল্লীভবনে বসে প্রায়ই ভাবি। সাহিত্য নিয়েই তোমাদের সঙ্গে পরিচয়, এবং নিজের দেশকে সমস্ত মন দিয়ে ভালোবাসা এই জানি, কিন্তু কোন্ অপরাধে যে আবদ্ধ হয়ে আছো ভেবে পাই নে। প্রার্থনা করি যেন অচিরে মুক্তি পেয়ে আবার কর্ম্মের মধ্যে, সাহিত্যের মধ্যে ফিরে আসতে পারো।

'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসটা যে তোমার এতখানি ভালো লেগেছে, এতে ভারি আনন্দ পেলাম। এর ভেতর সামাজিক অনেক প্রশ্নের আলোচনা আছে, কিন্তু সমাধানের ভার তোমাদের হাতে। ভবিষ্যতের এই সুকঠিন দায়িত্বের সম্ভাবনাই হয়ত তোমাদের এত বড় আনন্দ দিয়েছে। অথচ, আমার ধারণা এ বই বহু লোককেই নিরাশ করবে, তারা কোন আনন্দই

পাবে না। একে তো গল্পাংশ নিতান্ত কম, তাতে আবার ভেবে ভেবে পড়তে হয়, হুহু ক'রে সময় কাটানো বা ঘুমের খোরাকের মত নিশ্চিন্ত আরামে অর্দ্ধেক চোখ বুজে উপভোগ করা চলে না। এ ভালো লাগবার কথা নয়। তবুও লিখেছিলাম এই ভেবে যে কেউ-কেউ তো বুঝবে, আমার তাতেই চলে যাবে। সকল প্রকার রস সকলের জন্যে নয়। অধিকারী ভেদটা আমি মানি।

আরও একটা কথা মনে ছিলো সে অতি-আধুনিক-সাহিত্য। ভেবেছিলাম এই দিকে একটা ইসারা রেখে যাবো। বুড়ো হয়েছি, লেখার শক্তি অস্তগতপ্রায়, তবু, ভাবী-কালের তোমরা এই আভাসটুকু হয়ত পাবে যে নোঙ্‌রা না করেও অতি-আধুনিক-সাহিত্য লেখা চলে। কেবল কোমল, পেলব রসানুভূতিই নয়, intellect-এর বলকারক আহার্য্য পরিবেশন করাও আধুনিক কালের রস-সাহিত্যের একটা বড় কাজ। এর পরে তোমরাও যখন লিখবে তোমাদেরও অনেক পড়তে হবে, অনেক চিন্তা করতে হবে। শুধু চিত্ত-বিনোদনের হাল্কা ভারটুকু বয়ে দিয়েই অব্যাহতি পাবে না।

জেলের মধ্যে আছো, হাতে সময় অপরিসীম, এ বৃথা যেন নষ্ট ক'রো না, এই তোমার প্রতি আদেশ। এই নির্জ্জন বাস পরবর্ত্তী কালে যেন তোমার কল্যাণের দ্বার মুক্ত ক'রে দিতে পারে। সাহচর্য্যে বহু মানবকে যেন চিন্‌তে পারো। মানুষের স্বরূপের জ্ঞানটাই সাহিত্যের আসল মালমসলা। এই সত্যটি কোনদিন ভুলো না।

আমার শরীর বুড়ো-বয়সে যেমন থাকা উচিত তেম্‌নিই আছে। ভালো থাকো, নির্ব্বিঘ্নে থাকো এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ '৩৮

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীকালিদাস রায়কে লেখা[1]]

সামতাবেড়, পানিত্রাস, জেলা হাবড়া

কল্যাণীয়েষু,

ভাই কালিদাস, তোমার চিঠি পেলাম। আমার একটা দুর্নাম আছে যে আমি জবাব দিইনে। নেহাৎ মিথ্যে বলতে পারি নে, কিন্তু যে বিষয়টি নিয়ে তুমি নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছো তারও যদি সাড়া না দিই তো শুধু যে অসৌজন্যের অপরাধ হবে তাই নয়, কোন দিক থেকেই যে যতীনকে সমাদর করবার অংশ নিতে পারলাম না, সে দুঃখের অবধি থাকবে না। অনেকেই জানে না যে যতীনকে আমি সত্যিই ভালোবাসি। শুধু কেবল কবি বলে নয়, তাঁর ভেতরে এমন একটি স্নেহ-সরস বন্ধু-বৎসল ভদ্র মন আছে যে, তার স্পর্শে নিজের মনটাও তৃপ্তিতে ভরে আসে।

যতীন জানেন, আমি তাঁর কবিতার একান্ত অনুরাগী। যখন যেখানেই তাদের দেখা পাই, বার বার করে পড়ি। স্নিগ্ধ সকরুণ নির্ভুল ছন্দগুলি কানে-কানে যেন কত-কি বলতে থাকে।

কারও সম্বন্ধেই নিজের অভিমত আমি সহজে প্রকাশ করিনে—আমার সঙ্কোচ বোধ হয়। ভাবি আমার মতামতের মূল্যই বা কি, কিন্তু যদি কখনো বল্‌তেই হয়তো সত্যি কথাই বলি। যতীনকে স্নেহ করি, কিন্তু স্নেহের অতিশয়োক্তি দিয়ে তাঁকেও খুশি করতে পারতাম না সত্যি না হলে। যাক্ এ কথা।

তোমাদের অনুষ্ঠানটি ছোট,—হবেই তো ছোট। কিন্তু তাই বলে

১। "রসচক্র" সাহিত্য-সংসদের উদ্যোগে ১৩৩৮ সালের ৬ই ভাদ্র বেলঘরিয়ায় এক উদ্যান সম্মিলনীতে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীকে সম্বর্ধনা করার ব্যবস্থা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন সাহিত্যিক জলধর সেন। শরৎচন্দ্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে না পেরে রসচক্রের সম্পাদক কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়কে এই চিঠিখানি লিখেছিলেন।

তার দামটি ছোট নয়। এ তো ঢ্যাঁটরা দিয়ে বহুলোক ডেকে এনে উচ্চ কোলাহলে "জয়, যতীন্ বাগচীকি জয়!" বলার ব্যাপার নয়, এ তোমাদের ছোট্ট রস-চক্রের প্রীতি-সম্মিলন। কোন একটি বিশেষ দিনে ও বিশেষ স্থানে জন কয়েক সত্যিকার সাহিত্য-রসিক ও সাহিত্য-সেবী একসঙ্গে মিলে আর একজন সত্যিকার সাহিত্য-সেবককে সাদরে আহ্বান করে এনে বলা—'কবি, আমরা তোমার সাহিত্য-সাধনায় আনন্দ লাভ করেছি, তোমার বাণীপূজা সার্থক হয়েছে,—তুমি সুখী হও, তুমি দীর্ঘায়ুঃ হও, আমরা তোমকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিই, তুমি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ কর।' এই তো? আয়োজন সামান্য বলে তোমরা ক্ষুণ্ণ হয়ো না।

কিন্তু তবুও সম্মিলনে একটুখানি ত্রুটি ঘটলো, আমি যেতে পারলাম না। কারণ আমি বোধ করি তোমাদের সকলের চেয়ে বয়সে বড়।

এ অঞ্চলটায় ব্যারাম-স্যারাম নেই, কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে হতভাগা ডেঙ্গু এসে জুটেছে। সকাল থেকে ছোট ছেলে মেয়ে দুটির চোখ্ ছল্‌ছল্ করচে, চাকর জন দুই ছাড়া সবাই বিছানা নিয়েচে, আমার এক নাক বন্ধ, অন্যটায় টিউব-ওয়েলের লীলা সুরু হয়েছে। রাত্রি নাগাদ বোধ হয় দেহ-মন-প্রাণ উৎসবে যোগ দিবেন আভাসে ইসারায় তার খবর পৌঁছোচ্চে। নইলে এ অনুষ্ঠানে আমার নামে তোমাকে গর-হাজিরির ঢ্যারা টানতে দিতাম না।

অনেকে উপস্থিত আছো, এই সুযোগে একটা দুঃখের অনুযোগ জানাই। কালিদাস, তুমিও তো প্রায় সাবালক হতে চললে। আগেকার দিনের সকল কথা তোমার স্মরণে না থাকলেও কিছু কিছু হয়তো মনেও পড়বে। এদিনের মতো সেদিনে আমরা এমন ক'রে পরস্পরের ছিদ্র খুঁজে বেড়াতাম না। এক আধটা ব্যতিক্রম হয়ত ঘটেচে, কিন্তু এখনকার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। সাহিত্য-সেবকদের মাঝখানে

চারের আদান-প্রদান, একের কাছে অপরের দেওয়া এবং পাওয়া চিরদিনই চলে আসচে এবং চিরদিনই চলবে। কিন্তু তরুণ দলের মধ্যে আজকাল একি হতে চললো? নিন্দে করার একি উদ্দাম উৎসাহ, গ্লানি প্রচারের একি নির্দ্দয় অধ্যবসায়। কেবলি একজন আর একজনকে চোর প্রতিপন্ন করতে চায়। খবরের কাগজে কাগজে যত দেখি ততই যেন মন লজ্জায়, দুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে আসে। ক্ষমা নেই, ধৈর্য্য নেই, বেদনা-বোধ নেই, হানা-হানির নিষ্ঠুরতার যেন শেষ হতেই চায় না। কোথায় কার সঙ্গে কার কতটুকু মিলেচে, কার লেখা থেকে কে কতখানি নকল করেচে, রুক্ষ কটু কণ্ঠে এই খবরটা বিশ্বের দরবারে ঘোষণা করে যে এরা কি সান্ত্বনা অনুভব করে আমি ভেবেই পাই নে। ঘরে বাইরে কেবলি জানাতে চায় যে বাঙলা দেশের সাহিত্যিকদের বিদেশের চুরি করা ছাড়া আর কোন সম্বলই নেই।

যতীনকে জিজ্ঞেসা করলেই জানতে পারবে অতি পরিশ্রমে খুঁজে খুঁজে এই গোয়েন্দাগিরির কাজটা তখনও আমাদের সাহিত্যিক মহলে প্রচলিত হয়ে ওঠেনি। যাই হোক্, কামনা করি তোমাদের রস-চক্রের রসিকদের মধ্যে যেন এ ব্যাধি কখনো প্রবেশ করবার দরজা খুঁজে না পায়।

কবি নই, মনের মধ্যে কথা জমে উঠলেও তোমাদের মত প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাইনে, গুছিয়ে বলা হয় না। তাই চিঠি লেখা হয়ে যায় আমার চিরদিনই এলো-মেলো।

তা' হোক্‌গে এলো-মেলো, তবু এমনি করেই বলি, তোমাদের রস-চক্রের জয় হোক্, তোমাদের আজকের আয়োজন সফল হোক্ এবং যতীনকে বোলো শরৎদা তাঁকে এই চিঠির মারফৎ স্নেহাশীর্ব্বাদ পাঠিয়েছেন। ইতি—৫ই ভাদ্র, ১৩৩৮।

—শরৎদা

[শ্রীকৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিককে[১] লেখা]

২৪শে ভাদ্র, ১৩৪০

কল্যাণীয়েষু,

কাগজ চালাবার সম্বন্ধে আমার অভিমত জানতে চেয়োছো, কিন্তু নিজে কখনও কাগজ চালাইনি, সুতরাং বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার নেই। তবে প্রতি মাসেই অনেক কাগজ পড়ি, এর থেকে এই কথাটা মনে হয় মাসিকপত্র বহুলোকের প্রিয় করে তোলার জন্যে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন লেখার স্নিগ্ধতা এবং সংযম। উগ্রতায় অভিভূত ক'রে দেবার সঙ্কল্প নিয়ে যে-লেখা রচিত হয়, একটু মন দিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে, তার পোষাক ও বাইরের আতিশয্য স্বল্পকালের জন্যে পাঠকের চিত্ত চঞ্চল করে তুললেও সে স্থায়ী ত হয়ই না, পরন্তু প্রতিক্রিয়ায় অবসাদ গ্রস্ত ক'রে দেয়। গল্পেই হোক্ বা যাতেই হোক, যদি দেখতে পাও তার আসল কথাগুলি লেখকের আপন অনুভূতির রসে সত্য এবং বিশুদ্ধ হয়ে রচনায় আসে নি, তখনি মনে কোরো তার ভাব ও ভাষার আড়ম্বর যত চমকপ্রদ হয়েই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক, সে অন্তঃসার শূন্য,—সে টিকবে না।

ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল গল্প ব'লে একটা কথা আজকাল প্রায় শুনতে পাই, কিন্তু তার স্বরূপ কখনো দেখি নি কিম্বা দেখেও যদি থাকি চিনতে পারি নি। সেদিন হঠাৎ একটা গল্প পড়েছিলুম, শেষ ক'রে মনে হয়েছি হয়েছিল লেখকের বিদ্যের ভারে লেখাটা যেন পথের ওপর মুখ থুবড়ে পড়েচে। এ বস্তুকে কাগজে কখনো প্রশ্রয় দিও না। তবে এমন কথাও মনে কোরো না, গল্পে বুদ্ধি-শক্তির ছাপ থাকা মাত্রই দোষনীয়, হৃদয়-বৃত্তির অপরিমিত বাহুল্যতায় লেখকের আহাম্মক সাজাই দরকার।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

---

১ [redacted]দেশ-সম্পাদক।

[শ্রীমতিলাল রায়[১]কে লেখা]

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাবড়া।

১৯শে আশ্বিন '৪০

প্রিয়বরেষু,—শ্রীমতিবাবু, প্রথম দফা—একজন অকৃত্রিম বন্ধুর বিজয়ার সম্ভাষণ ও শুভকামনা জানবেন। যদিচ আমি চলি উত্তরে আপনি চলেন দক্ষিণে।

দ্বিতীয় দফা—আপনাদের মতো ধার্ম্মিক ব্যক্তিরাও যদি শয্যাগত হন, আমরা কোন্ ভরসায় বেঁচে থাকবো বলুন ত? সুতরাং শয্যাগত হওয়া আপনাদের অবৈধ, ওটা ত্যাগ করুন।

তৃতীয় দফা—প্রায় ইচ্ছে হয় একবার গিয়ে পড়ি কিন্তু অবিশ্রান্ত বৃষ্টি-বাদলে এ-দিকের পথঘাট এমন দুর্গম হয়েছে যে কিছুতে সাহস পাই নি।

চতুর্থ দফা—জ্বরে ভুগলুম দেড় মাস—লিভারঘটিত। তারপরে চলেছে শ্রীঅর্শের ভয়ঙ্কর রক্তপাত। থাম্‌চে না, হয়ত এই রবিবারে যাবো হাঁসপাতালে। যদি ফিরতে পারি আবার চিঠি দেবো নইলে —নমস্কার।

পঞ্চম দফা—পুস্তকাগারের তরফ থেকে আমন্ত্রণ করেছেন কিন্তু অসম্ভব যে!

ষষ্ঠ দফা—বলবার কথা বিস্তর জমা হয়ে উঠেচে। পরিশেষে ভগবৎ-স্থানে প্রার্থনা করি, আপনার চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী নিদারুণ ক্রোধ যেন অন্ততঃ তেইশ ঘণ্টায় দাঁড়ায়। ইতি—আপনাদের শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১। প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা।

২৭শে বৈশাখ ১৩৪১

শ্রদ্ধাস্পদেষু,—মতিবাবু, আপনার চিঠি পেলাম। কিন্তু এ এমন দেশ যে মাশুল পাঠালেও তার করার যায়গা নেই, অতএব টিকিটগুলো নষ্ট না ক'রে ফিরে পাঠালাম।

আপনার সঙ্গে আমার না আছে দেখা-সাক্ষাৎ না আছে পত্র-ব্যবহার, তবু এ-কথা বাস্তবিকই সত্য যে আপনাকে আমি গভীর শ্রদ্ধা করি কর্ম্মী বোলে, সত্যাশ্রয়ী সন্ন্যাসী বোলে। কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে হে ঈশ্বর, তুমি মতিবাবুর মেজাজটা একটু মোলায়েম ক'রে দাও। চব্বিশ ঘণ্টা চ'টে থাকাটা কমিয়ে তেইশ ঘণ্টা করো যে ঐ ফাঁকে আমরা সাধারণ মানুষ একটু মন খুলে তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে বাঁচি।

আমার কলকাতার আড্ডাটার নির্ম্মাণকার্য্য প্রায় শেষ হয়ে এলো। জ্যৈষ্ঠ মাসে যাবো এবং কিছু কাল অর্থাৎ বর্ষার দিনগুলো নগরেই কাটাবো। সে সময়ে আশা আছে সর্ব্বদাই আপনার কাছে যেতে পারবো, এবং ইতিমধ্যে ভগবান যদি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন ত ঐ এক ঘণ্টা প্রত্যহ গল্প করবো। ধর্ম্মালোচনা নয়, বুড়ো বয়সের হাসি-তামাসার কথা। তখন রাজি হবেন ত?

সে যাক্। কবে আমাকে যেতে হবে? যাবো কথা দিলুম। কেমন আছেন জিজ্ঞেসা করবো না, কারণ সন্ন্যাসীর শারীরিক কুশল-প্রশ্ন অবান্তর। নিশ্চয় জানি ভগবান নিজের গরজে কাজের জন্যে যত দিন ভালো রাখা আবশ্যক মনে করবেন তত দিন রাখবেন। তার পরে হিসেব দাখিল করতে ডেকে পাঠাবেন।

আমার নিজের খবরটা কিন্তু দিই। কারণ আমি ত আর সন্ন্যাসী নয়—ভালো-মন্দ আছেই। সেই দিক থেকে জানাই যে সম্প্রতি পা

মচ্‌কে একটু লেঙ্‌চে চলচি। সঙ্গে সঙ্গে মালিশাদিও চল্‌চে,—আশা আছে এক দিন সোজা হয়ে হাঁটবোই। ইতি—

আপনাদের

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৭ই আশ্বিন, ১৩৪১

পরম শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়,—একটা প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটা সাহিত্য নিয়ে। আপনি বলতে পারেন, তবে খাঁটি সাহিত্যিকের কাছে না গিয়ে আমার কাছে কেন? তারও কারণ আছে। লোকে আপনাকে ঠিক কি ব'লে জানে জানি নে, কিন্তু আমি জানি আপনাকে সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় সাধু মানুষ ব'লে। কর্ম্ম নেই, অথচ, কর্ম্মকে আপনি ত্যাগ করেন নি। এ-ও তেমনি। সেই কর্ম্মহীন কর্ম্মই আপনার প্রবর্ত্তকের সম্পাদনা। তাই, বহু বিভিন্ন বিষয়ে বহু লেখাই আপনাকে লিখতে হয়, দেখি, বহু চিন্তা আপনার মনের মধ্যে আসে আর যায়,—চলার পথ তাদের অবারিত কিন্তু পথ জুড়ে অন্য পথচারীর পথ আগলানোর অধিকার তাদের নেই।

প্রবর্ত্তকের সম্পাদনায় কেবলমাত্র যদি কাব্য এবং গল্প-উপন্যাস নিয়ে থাকতেন, সাহিত্যঘটিত প্রশ্ন হ'লেও এ জিজ্ঞাসা আপনাকে করতাম না। যদি নিজের কাগজের মারফতে একটা উত্তর দেন অত্যন্ত সুখী হবো। এ বিশ্বাস আছে উত্তর দিলে সত্য উত্তরই পাবো, ফাঁকির কারবার আপনার নেই।

আচার্য্যগণ বলেন, কলা-সাধনার মূল সূত্র হলো সত্য, শিব এবং সুন্দর। অর্থাৎ, সাধনা হয় যেন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুন্দরের উপর প্রতিষ্ঠিত

এবং তার ফল যেন হয় কল্যাণময়। যাঁরা বিজ্ঞানের সাধক (তত্ত্বজ্ঞান বলচি নে,—বলচি সাধারণ সাংসারিক অর্থে) অর্থাৎ, বৈজ্ঞানিক যাঁরা তাঁদের একমাত্র মন্ত্র হলো সত্য। সাধনার ফল সুন্দর-অসুন্দর, কল্যাণ-অকল্যাণকর—কোনটাতেই তাঁদের গরজ নেই। হয় ভালোই, না হ'লেও অপরাধ নেই।

অথচ, সাহিত্য-সেবায় বহু দিন ব্রতী থেকে নিরন্তর অনুভব করি এখানে সত্য এবং সুন্দরে বাধে পদে-পদে বিরোধ। জগতে যা ঘটনায় সত্য, সাহিত্যে হয়ত সে সুন্দর নয়, এবং যা সুন্দর সে হয়ত সাহিত্যে একেবারে মিথ্যা। যাকে সত্য ব'লে জানি তাকে মূর্ত্তি দিতে গিয়ে দেখি সে হয়ে ওঠে বীভৎস কদাকার, আবার অসত্যকে বর্জ্জন ক'রেও পাই নে সুন্দরের রূপ। তেমনি মঙ্গল-অমঙ্গলও। সাহিত্যে এ-প্রশ্ন অবান্তর স্বীকার না ক'রেও ত পারি নে।

জিজ্ঞাসা করি সত্য যদি হয় সুন্দরের পরিপন্থী, কল্যাণ অকল্যাণ হয় গৌণ, সাহিত্য সাধনায় এ সমস্যার মীমাংসা কোন্ পথে? ইতি—

ভবদীয়

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

[শ্রীঅতুলানন্দ রায়কে[১] লেখা]

কল্যাণীয়েষু,—শ্রাবণের [১৩৪০] 'পরিচয়' পত্রিকায় শ্রীমান্ দিলীপকুমারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র—সাহিত্যের মাত্রা—সম্বন্ধে তুমি আমার অভিমত জান্‌তে চেয়েছো। এ চিঠি ব্যক্তিগত হ'লেও যখন সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়েছে, তখন এরূপ অনুরোধ হয়ত করা যায়, কিন্তু অনেক চার-পাতা-জোড়া চিঠির শেষ ছত্রের 'কিছু টাকা পাঠাইবা'র মতো এরও শেষ ক'লাইনের আসল বক্তব্য যদি এই হয় যে, ইয়োরোপ তার যন্ত্রপাতি ধনদৌলত-কামান-বন্দুক মান-ইজ্জত সমেত অচিরে ডুববে, তবে অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে এই কথাই মনে করবো যে, বয়েস ত অনেক হলো, ও-বস্তু কি আর চোখে দেখে যাবার সময় পাবো!

কিন্তু এদের ছাড়াও কবি আরও যাদের সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, তোমাদের সন্দেহ তার মধ্যে আমিও আছি। অসম্ভব নয়। এ প্রবন্ধে কবির অভিযোগের বিষয় হলো ওরা 'মত্ত হস্তী' 'ওরা বুলি আওড়ালে' 'পালোয়ানি করলে' 'কসরৎ কেরামত দেখালে' 'প্রব্লেম সল্‌ভ করলে' অতএব ওদের ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই কথাগুলো যাদেরকেই বলা হোক, সুন্দরও নয়, শ্রুতিসুখকরও নয়। শ্লেষ বিদ্রূপের আমেজে মনের মধ্যে একটা ইরিটেশান আনে। তাতে বক্তারও উদ্দেশ্য যায় ব্যর্থ হয়ে, শ্রোতারও মন যায় বিগড়ে। অথচ, ক্ষোভ প্রকাশও যেমন বাহুল্য, প্রতিবাদও তেমনি বিফল। কার তৈরি-করা বুলি পাখীর মতো আওড়ালুম, কোথায় পালোয়ানি করলুম, কি 'খেল্' দেখালুম, ক্রুদ্ধ কবির কাছে এ-সকল জিজ্ঞাসা অবান্তর। আমার

১। পরিচয় পত্রিকার অন্যতম কর্মকর্তা।

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। খেলার মাঠে কেউ রব তুলে দিলেই হলো অমুক গু মাড়িয়েছে। আর রক্ষে নেই,—কোথায় মাড়ালুম, কে বললে, কে দেখেচে, ওটা গু নয়, গোবর—সমস্ত বৃথা। বাড়ি এসে মায়েরা না নাইয়ে, মাথায় গঙ্গাজলের ছিটে না দিয়ে আর ঘরে ঢুকতে দিতেন না। কারণ, ও যে গু মাড়িয়েছে! এও আমার সেই দশা।

'সাহিত্যের মাত্রা'ই বা কি, আর অন্য প্রবন্ধই বা কি, এ-কথা অস্বীকার করি নে যে কবির এই ধরণের অধিকাংশ লেখাই বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার নেই। তাঁর উপমা উদাহরণে আসে কল-কব্জা, আসে হাট-বাজার, হাতী-ঘোড়া, জন্তু-জানোয়ার—ভেবেই পাই নে মানুষের সামাজিক সমস্যায় নর-নারীর পরস্পরের সম্বন্ধ বিচারে ওরা সব আসেই বা কেন এবং এসেই বা কি প্রমাণ করে? শুনতে বেশ লাগ-সই হ'লেই ত তা যুক্তি হয়ে ওঠে না।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। কিছু দিন পূর্ব্বে হরিজনদের প্রতি অবিচারে ব্যথিত হয়ে তিনি প্রবর্ত্তক-সংঘের মতিবাবুকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। তাতে অনুযোগ করেছিলেন যে, ব্রাহ্মণীর পোষা বিড়ালটা এঁটো মুখে গিয়ে তাঁর কোলে বসে, তাতে শুচিতা নষ্ট হয় না—তিনি আপত্তি করেন না। খুব সম্ভব করেন না, কিন্তু তাতে হরিজনদের সুবিধা হলো কি? প্রমাণ করলে কি? বিড়ালের যুক্তিতে এ-কথা ত ব্রাহ্মণীকে বলা চলে না যে, যে-হেতু অতি-নিকৃষ্ট-জীব বেড়ালটা গিয়ে তোমার কোলে বসেছে, তুমি আপত্তি করো নি, অতএব, অতি-উৎকৃষ্ট-জীব আমিও গিয়ে তোমার কোলে বসবো, তুমি আপত্তি করতে পারবে না। বেড়াল কেন কোলে বসে, পিঁপড়ে কেন পাতে ওঠে, এ-সব তর্ক তুলে মানুষের সঙ্গে মানুষের ন্যায়-অন্যায়ের বিচার হয় না। এ-সব উপমা শুনতে ভালো, দেখতেও চক্চক্ করে, কিন্তু বাচাই করলে দাম যা ধরা পড়ে, তা অকিঞ্চিৎকর।

বিরাট ফ্যাক্টরির প্রভূত বস্তু-পিণ্ড উৎপাদনের অপকারিতা দেখিয়ে মোটা নভেলও অত্যন্ত ক্ষতিকর, এ-কথা প্রতিপন্ন হয় না।

আধুনিক কালের কল-কারখানাকে নানা কারণে অনেকেই আজকাল নিন্দে করেন, রবীন্দ্রনাথও করেছেন—তাতে দোষ নেই। বরঞ্চ, ওইটেই হয়েছে ফ্যাশান। এই বহু-নিন্দিত বস্তুটার সংস্পর্শে যে-মানুষগুলো ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় এসে পড়েছে, তাদের সুখ-দুঃখের কারণগুলোও হয়ে দাঁড়িয়েছে জটিল—জীবন-যাত্রার প্রণালীও গেছে বদ্‌লে, গাঁয়ের চাষাদের সঙ্গে তাদের হুবহু মেলে না। এ নিয়ে আপশোষ করা যেতে পারে, কিন্তু তবু যদি কেউ এদেরই নানা বিচিত্র ঘটনা নিয়ে গল্প লেখে, তা সাহিত্য হবে না কেন? কবিও বলেন না যে হবে না! তার আপত্তি শুধু সাহিত্যের মাত্রা লঙ্ঘনে। কিন্তু এই মাত্রা স্থির হবে কি দিয়ে? কলহ দিয়ে না কটু কথা দিয়ে? কবি বলছেন—স্থির হবে সাহিত্যের চিরন্তন মূল নীতি দিয়ে। কিন্তু এই 'মূল নীতি' লেখকের বুদ্ধির অভিজ্ঞতা ও স্বকীয় রসোপলব্ধির আদর্শ ছাড়া আর কোথাও আছে কি? চিরন্তনের দোহাই পাড়া যায় শুধু গায়ের জোরে আর কিছুতে নয়। ওটা মরীচিকা।

কবি বলচেন, "উপন্যাস-সাহিত্যেরও সেই দশা। মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েছে।" কিন্তু প্রত্যুত্তরে কেউ যদি বলে, "উপন্যাস-সাহিত্যের সে দশা নয়, মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়ে নি, চিন্তার সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে" তাকে নিরস্ত করা যাবে কোন্ নজীর দিয়ে? এবং এরই সঙ্গে আর একটা বুলি আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, তাতে রবীন্দ্রনাথও যোগান দিয়েছেন এই ব'লে যে, "যদি মানুষ গল্পের আসরে আসে, তবে সে গল্পই শুনতে চাইবে, যদি প্রকৃতিস্থ থাকে।" বচনটি স্বীকার ক'রে নিয়েও পাঠকেরা যদি—

বলে—হাঁ, আমরা প্রকৃতিস্থই আছি, কিন্তু দিন-কাল বদলেছে এবং বয়েসও বেড়েচে; সুতরাং রাজপুত্র ও ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্পে আর আমাদের মন ভরবে না, তা হ'লে জবাবটা যে তাদের দুর্বিনীত হবে, এ আমি মনে করি নে। তারা অনায়াসে ব'লতে পারে, গল্পে চিন্তাশক্তির ছাপ থাকলেই তা পরিত্যাজ্য হয় না কিম্বা বিশুদ্ধ গল্প লেখার জন্যে লেখকের চিন্তাশক্তি বিসর্জ্জন দেবারও প্রয়োজন নেই।

কবি মহাভারত ও রামায়ণের উল্লেখ ক'রে ভীষ্ম ও রামের চরিত্র আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন, 'বুলির' খাতিরে ও-দুটো চরিত্রই মাটি হয়ে গেছে। এ নিয়ে আমি আলোচনা করবো না, কারণ, ও-দুটো গ্রন্থ শুধু কাব্যগ্রন্থই নয়, ধর্ম্মপুস্তক ত বটেই, হয়ত বা ইতিহাসও বটে। ও-দুটি চরিত্র কেবলমাত্র সাধারণ উপন্যাসের বানানো চরিত্র নাও হ'তে পারে, সুতরাং সাধারণ কাব্য-উপন্যাসের গজকাঠি নিয়ে মাপতে যেতে আমার বাধে।

চিঠিটায় ইন্‌টালেক্‌ট শব্দটার বহু প্রয়োগ আছে। মনে হয় যেন কবি বিদ্যে ও বুদ্ধি উভয় অর্থেই শব্দটার ব্যবহার করেছেন। প্রব্লেম শব্দটাও তেমনি। উপন্যাসে অনেক রকমের প্রব্লেম থাকে, ব্যক্তিগত, নীতিগত, সামাজিক, সাংসারিক আর থাকে গল্পের নিজস্ব প্রব্লেম, সেটা প্লটের। এর গ্রন্থিই সবচেয়ে দুর্ভেদ্য। কুমারসম্ভবের প্রব্লেম, উত্তর কাণ্ডে রামভদ্রের প্রব্লেম, ডল্‌স হাউসের নোরার প্রব্লেম অথবা যোগাযোগের কুমুর প্রব্লেম একজাতীয় নয়। যোগাযোগ বই খানা যখন 'বিচিত্রা'য় চলছিল এবং অধ্যায়ের পর অধ্যায় কুমু যে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল, আমি ত ভেবেই পেতুম না ঐ দুর্দ্ধর্ষ প্রবল-পরাক্রান্ত মধুসূদনের সঙ্গে তার টাগ্‌-অফ্‌-ওয়ারের শেষ হবে কি ক'রে? কিন্তু কে জানতো সমস্যা এত সহজ ছিল—লেডি ডাক্তার মীমংসা ক'রে দেবেন এক মুহূর্ত্তে এসে। আমাদের

জলধরদাদাও প্রব্লেম দেখতে পারেন না, অত্যন্ত চটা। তাঁর একটা বইয়ে এমনি একটা লোক ভারি সমস্যার সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু তার মীমাংসা হয়ে গেল অন্য উপায়ে। ফোঁস ক'রে একটা গোখরো সাপ বেরিয়ে তাকে কামড়ে দিলে। দাদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, এটা কি হ'ল? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, কেন, সাপে কি কাউকে কামড়ায় না?

পরিশেষে আর একটা কথা বলবার আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ইবসেনের নাটকগুলি ত এক দিন কম আদর পায় নি, কিন্তু এখনি কি তার রঙ ফিকে হয়ে আসে নি, কিছু কাল পরে সে কি আর চোখে পড়বে?" না পড়তে পারে, কিন্তু তবুও একটা অনুমান, প্রমাণ নয়। পরে এক দিন এমনও হ'তে পারে ইবসেনের পুরনো আদর আবার ফিরে আসবে। বর্ত্তমান কালই সাহিত্যের চরম হাইকোর্ট নয়।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে[১] লেখা]

সামতাবেড়, পানিত্রাস

হাবড়া

ভাই ভূপেন,

তোমার চিঠিখানি পড়ে কত কথাই না মনে পড়লো—কিন্তু সে সব তো আর চিঠিতে লেখবার নয়। আমি ত এদিকে বজ্জাতি করেই টিকে আছি—যাবার নামটী নেই। সেদিন ছিলুম আমরা যৌবনের কোঠায়, যৌবনের নানা আনন্দ ও অনাচার নিয়ে—আর আজ নড়তে চড়তে গেলেও মনে হয় থাকগে আজ—কাল দেখা যাবে। অতএব শরৎদার উপদেশ সেদিনের সঙ্গে এদিনের মাঝে মাঝে একটু তুলনা ক'রে দেখো—আমোদ পাবে।

চিঠির জবাব দিচ্ছি ব'লে আশ্চর্য্য হয়ো না। শতকরা নব্বুইটা চিঠিই আমার নিরুত্তরে শেষ হয়, কিন্তু বাকি দশটার মধ্যে যাঁরা আজও আছেন, তাদের একজন তুমি। তাই।

তোমার নেমন্তন্ন নিশ্চয়ই নিতুম, কিন্তু এই রবিবার কলকাতার কোন একটা হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হতে যাচ্ছি। মাসখনেক পরে হয়না ভাই? কত খুসির সঙ্গেই যে তোমার ওখানে যেতুম তা আর বলতে পারিনে।

তোমার ছেলেটি আমাকে জ্যাঠামশাই ব'লে ডাকে এবং পিতৃব্যের মতোই ভক্তি-শ্রদ্ধা করে এ কথা ঠিক তোমার মতোই জানি। বলবার প্রয়োজন নেই। তাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ দিয়ো এবং তুমিও জেনো পুরণো বন্ধুর সাদর সম্ভাষণ। ইতি ৯ই কার্ত্তিক ১৩৪০।

তোমাদের শরৎদা

১। এই ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই শরৎচন্দ্রের বিরাজ-বৌ উপন্যাসের সর্বপ্রথম নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। বিরাজ-বৌ নাট্যরূপ দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ভূপেনবাবুর পরিচয় হয়। পরে এই পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

[শ্রীঅবিনাশ ঘোষালকে লেখা]

কল্যাণীয়েষু—লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি দেশের সাপ্তাহিক পত্রগুলি ক্রমশঃ দশের উৎসুক ও উৎকণ্ঠ দৃষ্টি লাভ করিতেছে। পূর্ব্বেকার উপেক্ষা অবহেলার ভাব আর নাই। অর্থাৎ মানুষের নিত্যকার প্রয়োজনে এইগুলির প্রয়োজনীয়তাও মানুষে এখন উপলব্ধি করিতেছে। আনন্দের কথা। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠার আসনটি কেবলমাত্র দখল করিয়া রাখিলে চলিবে না, কাজের মধ্য দিয়া স্বকীয় মর্য্যাদা প্রতিদিন প্রমাণিত করিতে হইবে, নিরন্তর মনে রাখিতে হইবে তোমার কর্ম্মশীলতা সাধারণের সৌভাগ্য ও কল্যাণ সমৃদ্ধ করিতেছে। আর কোন পন্থায় নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলা কাগজের পক্ষে শুধু ব্যর্থতা নয় বিড়ম্বনা।

তোমাকে ছেলেবেলা হইতে জানি, তোমার আদর্শ তোমার অভিজ্ঞতা কতদিন আমার আছে আলোচনা করিয়াছ, কনিষ্ঠের মতো উপদেশ চাহিয়া লইয়াছ। জীবনের পথে সে সমুদয় তুমি বিস্মৃতি না হও এই ইচ্ছা করি।

কাগজ পরিচালনার কাজ কেবলমাত্র দায়িত্বপূর্ণই নয়, নানাভাবে বিঘ্ন সঙ্কুল। বিবিধ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইতে হয়। অধিকাংশই সাময়িক নিঃসন্দেহ, তথাপি সংযম ও সহিষ্ণুতার অত্যন্ত প্রয়োজন। জানি নির্ভীক আলোচনা সাপ্তাহিকের প্রাণ, কর্ত্তব্যবিমুখতা অপরাধ, তবু বলি তার চেয়েও মহার্ঘ তোমার আপন চরিত্র ও মর্য্যাদা। অসৌজন্য ও কুকথায় তোমার মুখের বক্তব্য যেন কোনদিন কলুষিত না হয়। কাহাকেও ছোট করার জন্য নয়, বড় করার উদ্যমেই তোমার প্রবুদ্ধ শক্তি অনুক্ষণ নিয়োজিত থাক এই প্রার্থনা করি। প্রগতির পথে জয় তোমার অপ্রতিহত হইবেই। ইতি—৭ই শ্রাবণ ১৩৪২

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৫শে শ্রাবণ, ১৩৪১

কল্যাণীয়েষু,—'বাতায়নে'র প্রত্যেকটি সংখ্যাই আমি মনোযোগের সঙ্গে পড়েচি, আলস্য বা উপেক্ষায় কোনদিন দূরে ঠেলে রাখি নি।

সকল বিষয়েই যে একমত হ'তে পেরেছি তা নয়, এর সমালোচনার ভাষা মাঝে মাঝে কঠোর ও সুতীক্ষ্ণ ঠেকেছে, কিন্তু অকারণ বিদ্বেষ বা ব্যক্তিগত ঈর্ষার আক্রমণে কোন আলোচনাই কোন দিন কলঙ্কিত হ'তে দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না। এটা আনন্দের কথা। কিন্তু যদি কখনো এমন ঘটেও থাকে, যা আমার চোখে পড়ে নি, তার সম্বন্ধে এই কথাই আজ বলবো যে, যা হয়ে গেছে সে যাক্, কিন্তু নূতন বৎসরের প্রারম্ভে তোমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখা চাই যে, লেখায় অসিষ্ণুতা যদি-বা সহা যায়, ক্রূরতা, নীচতা, অসত্য অপবাদে মানুষকে হীন প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস দীর্ঘদিন পাঠক সমাজ সইতে পারেন না, তাঁদের চোখে ধীরে ধীরে লেখক আপনিই হয়ে আসে ছোট, তার স্বরূপ ধরা পড়ে। তখন কাগজের মর্য্যাদা হয় নষ্ট, উদ্দেশ্য হয় শিথিল, আলোচনা হয় নিষ্ফল পণ্ডশ্রম—সর্ব্বপ্রকারেই তার কল্যাণের সামর্থ্য যায় ক্ষীণ হয়ে। এর চেয়ে অবনতি কাগজের আর নেই। কেবল অসত্য বা অন্যায়ের জন্যই নয়, নিশ্চয় জেনো কুশ্রীতা কখনো দীর্ঘজীবী হয় না।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষকে লেখা]

পি ৫৬৬ মনোহরপুকুর, কালীঘাট,
কলিকাতা।

কল্যাণীয়েষু,

বারীন, তোমার বিবাহের খবর লোকের মুখে মুখে আমার কানে পৌঁছয়, নইলে আনন্দবাজার পত্রিকা আমি পাইও নে পড়িও নে। আশা করি পরমানন্দে আছ।

দেশের বাড়ী ছেড়ে আমি কোন কালেই যে সহরে উঠে আসবো অর্থাৎ পল্লীবাসীর বদলে নাগরিক, তাহলে মানতেই হবে যে সে কার্য্য তোমার বিবাহের চেয়েও—হবে[১]। এতে আমি সহজে রাজী হবো না, তা যত উৎসাহিতই মানুষ করুক। এখানে রোজ দাড়ী কামাতে হয়, এতবড় যন্ত্রণার ব্যাপার আমি কল্পনা করতে পারি নে।

মণির ব্যাপার কিছু কিছু জানি, সব জানি নে। এমন ভয়ঙ্কর ভাগ্য-বিপর্য্যয় অতিবড় শত্রুর জন্যেও বোধ করি কেউ কামনা করতে পারে না।

তোমার সঙ্গে বহুদিন দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি, যদি পার একদিন এসো দুপুর বেলায়। লোকজনের ভিড় তখনই একটু কম থাকে।

৪।৫ দিন আরো এখানে আছি, তারপরেই পালাবো এবং হয়ত দীর্ঘদিন আর আসবো না।

বুড়ো বয়সে শরীরং ব্যাধি মন্দিরং, এর আর তালিকা কি দেব? তোমাদেরও যখন বয়স হবে, আপনিই জানতে পারবে।

আজ শৈলেনের গান শোনার যো নেই। বিচিত্রার লেখাটা শেষ করতে বসেছি। তারাও উর্দ্ধমুখে বসে আছে।

আমার ভালোবাসা জেনো। ইতি—২৯শে আষাঢ় ১৩৪১

তোমাদের শরৎদা

১। বারীনবাবু ৫৩ বছর বয়সে বিবাহ করেন।

[শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়কে[১] লেখা]

তোমার প্রশ্ন আমি নাটক লিখি না কেন ? বোধকরি, তোমার এ জিজ্ঞাসা মনে এসেছে দুটো কারণে। প্রথম, নাট্যকার এবং অন্যান্য গ্রন্থকারের রচিত উপন্যাসের নাট্যরূপদাতা শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরী সম্প্রতি 'বাতায়নে' বাংলা নাটক সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তাকে তুমি সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিতে পারো নি এবং দ্বিতীয় হচ্ছে, তোমরা নিরন্তর যে-সমস্ত নাটকের অভিনয় দেখে থাকো, তাদের ভাব ভাষা, চরিত্র গঠন ইত্যাদি বিচার করে দেখবার পর তোমাদের মনে এই কথা জেগেছে যে, শরৎচন্দ্র নাটক লিখলে হয়ত রঙ্গমঞ্চের চেহারার একটু পরিবর্ত্তন হ'তে পারে।

তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমার প্রথম কথা এই যে, আমি নাটক লিখি না, তার কারণ হচ্ছে আমার অক্ষমতা। দ্বিতীয়, এই অক্ষমতাকে অস্বীকার ক'রে যদিই বা নাটক লিখি, তা হ'লেও আমার মজুরি পোষাবে না। মনে কোরো না কথাটা টাকার দিক্ থেকেই শুধু বলচি। সংসারে ওটার প্রয়োজন, কিন্তু একমাত্র প্রয়োজন নয়, এ সত্য এক দিনও ভুলি নে। উপন্যাস লিখলে মাসিক-পত্রের সম্পাদক সাগ্রহে তা নিয়ে যাবেন, উপন্যাস ছাপাবার জন্যে পাব্লিশারের অভাব হবে না, অন্ততঃ হয় নি এত দিন এবং সেই উপন্যাস পড়বার লোকও পেয়ে এসেছি। গল্প লেখার ধারাটা আমি জানি। অন্ততঃ, শিখিয়ে দিন ব'লে কারও দ্বারস্থ হবার দুর্গতি আমার আজও ঘটে নি। কিন্তু নাটক ? রঙ্গমঞ্চের কর্ত্তৃপক্ষই হচ্ছেন এর চরম হাইকোর্ট। মাথা নেড়ে যদি বলেন, এ যায়গাটায় আকশন (action) কম,—দর্শকে নেবে না, কিম্বা এ বই অচল, ত তাকে সচল

১। নাচঘর পত্রিকার অন্যতম কর্মকর্তা।

করার কোন উপায় নেই। তাঁদের রায়ই এ-সম্বন্ধে শেষ কথা। কারণ, তাঁরা বিশেষজ্ঞ। টাকা-দেনে-ওয়ালা দর্শকের নাড়ী-নক্ষত্র তাঁদের জানা। সুতরাং এ-বিপদের মধ্যে থামাকা ঢুকে পড়তে মন আমার দ্বিধা বোধ করে।

✓নাটক হয়ত আমি লিখতে পারি। কারণ, নাটকের যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু—যা ভালো না হ'লে নাটকের প্রতিপাদ্য কিছুতেই দর্শকের অন্তরে গিয়ে পৌঁছয় না—সেই ডায়ালোগ লেখার অভ্যাস আমার আছে। কথাকে কেমন ভাবে বলতে হয়, কত সোজা ক'রে বললে তা মনের ওপর গভীর হয়ে বসে, সে-কৌশল জানি নে, তা নয়। এ ছাড়া চরিত্র বা ঘটনা সৃষ্টির কথা যদি বল, তাও পারি ব'লেই বিশ্বাস করি। নাটকে ঘটনা বা সিচুয়েশান সৃষ্টি করতে হয় চরিত্র-সৃষ্টির জন্যেই। চরিত্র-সৃষ্টি দু-রকমের হ'তে পারে:—এক হচ্ছে, প্রকাশ অর্থাৎ পাত্রপাত্রী যা, তাই ঘটনা-পরম্পরার সাহায্যে দর্শকের চোখের সুমুখে প্রকাশিত করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে—চরিত্রের বিকাশ অর্থাৎ ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে দিয়ে তার জীবনের পরিবর্ত্তন দেখানো। সে ভালোর দিকেও হ'তে পারে, মন্দর দিকেও যেতে পারে। ধরো, একজন হয়ত বিশ বচ্ছর আগে উইল্‌সনের হোটেলে খেত, মিথ্যা কথা বলত এবং আরও অন্যান্য অকাজ করত। আজ সে ধার্ম্মিক বৈষ্ণব—বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় —পাতে মাছের ঝোল পড়লে হাত দিয়ে মুছে ফেলে দেয়। তবু এ হয়ত তার ভণ্ডামি নয়, সত্যিকারের আন্তরিক পরিবর্ত্তন। হয়ত অনেক-গুলো ঘটনার আবর্ত্তে প'ড়ে, পাঁচটা ভালো লোকের সংস্পর্শে এসে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আজ সে সত্যি ক'রে বদলে গেছে। সুতরাং বিশ বচ্ছর আগে সে যা ছিল, তাও সত্যি এবং আজ সে যা হয়েছে, তাও সত্যি। কিন্তু যা-তা হ'লে ত হবে না,—বইয়ের মধ্যে দিয়ে লেখার মধ্যে

দিয়ে পাঠক বা দর্শকের কাছে তাকে সত্যি ক'রে তুলতে হবে। এমন যেন না তাঁদের মনে হয়, লেখার মধ্যে এ পরিবর্ত্তনের হেতু খুঁজে মেলে না। কাজটা শক্ত। আর একটা কথা—উপন্যাসের মত নাটকের elasticity নেই; নাটককে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের বেশি এগুতে দেওয়া চলে না। ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে নাটককে দৃশ্যে বা অঙ্কে ভাগ করা,—তাও হয়ত চেষ্টা করলে দুঃসাধ্য হবে না। কিন্তু ভাবি, ক'রে কি হবে? নাটক যে লিখব, তা অভিনয় করবে কে? শিক্ষিত বোঝদার অভিনেতা অভিনেত্রী কৈ? নাটকের হিরোইন সাজবে, এমন একটিও অভিনেত্রী ত নজরে পড়ে না। এমনিধারা নানা কারণে সাহিত্যের এই দিকটায় পা বাড়াতে ইচ্ছে করেনা। আশাকরি একদিন বর্ত্তমান রঙ্গালয়ের এই অভাবটা ঘুচবে, কিন্তু আমরা তা হয়ত চোখে দেখে যেতে পারবো না। অবশ্য সত্যিকারের তাগিদ যদি আসে, কখনো হয়ত লিখতেও পারি। কিন্তু আশা বড় করি নে।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[গিরিজাকুমার বসুকে লেখা]

পরম কল্যাণীয়েষু,

গিরিজা, আমি শয্যাগতও নই, উপবাস করে পড়েও নেই, তবু কেন যে তোমার অনুরোধ রাখতে পারলাম না তার কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন। ইতিপূর্ব্বেও অনেক নিরাশ করেছি, লিখবো বলেও পারিনি, বলেছি আমি অক্ষম, কিন্তু যাই কেননা বলি খালি হাতে যাকে ফিরতে হয় আশীর্ব্বাদ ক'রে—সে যায় না। হয়ত ভাবে, এই ত খায় দায়, এই ত ঘুরে বেড়ায়, দু'ছত্র লেখার বেলাতেই কি হয় যত অসুখ!

দোষ দিতে তাদের পারিনে। কারণ, সাধারণতঃ অসুখের যে চেহারা তাদের পরিচিত, আমাতে তা' মেলে কই? মেলে না নিজেও জানি। সুতরাং তর্ক ক'রে ওদিকে আত্মরক্ষার উপায় পাওয়া যাবে না, দণ্ড নিতেই হবে, কিন্তু তোমার কাছে অন্য কথা। এ ভরসা করি, দোষ স্খলনের রাস্তা যদি আর কোথাও না খোলা থাকে, তোমার কাছে আছেই। কারণ, তুমিত শুধু কোন একটা মাসিক বা সাপ্তাহিকের সম্পাদক মাত্রই নও,—নিজেও কবি। অর্থাৎ আমাদেরই সগোত্র—জ্ঞাতি। সাহিত্য সেবার আনন্দ বেদনা তুমি জানো, সাহিত্য সেবকের দুর্দ্দিনের খবর রাখো। তোমাকে স্মরণ করানো চলে যে, সাহিত্যিকের বাহ্য ও অভ্যন্তর—সমসূত্রে গাঁথা নয়। একের সাক্ষ্য-প্রমাণে অপরের বিচার করা যায় না। এমন বিড়ম্বনাও ঘটে যখন দেহ দেখায় সুস্থ, কি সুপুষ্ট, মন হয়ত তখন একেবারে দেউলে, মাথাটা হয়ে থাকে মরুভূমি। তাকে নাড়া দিলে ভাবের বদলে অভাবের শুকনো ধুলোই বেরিয়ে আসতে চায়। সেই দুঃসময় চলচে আমার এখন। ইতি—১১ই আশ্বিন ১৩৪১

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[জাহান-আরা চৌধুরীকে লেখা]

কল্যাণীয়া জাহান-আরা,—তোমার বার্ষিক পত্রিকায়[১] সামান্য কিছু একটা লিখে দিতে অনুরোধ করেছো। আমার বর্ত্তমান অসুস্থতার মধ্যে হয়ত সামান্যই একটু লেখা চলে। ভাবছিলাম, সাহিত্যের ধর্ম্ম, রূপ, গঠন, সীমানা, এর তত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে মাঝে মাঝে অল্প-বিস্তর আলোচনা হয়ে গেছে, কিন্তু এর আর একটা দিকের কথা প্রকাশ্যে আজও কেউ বলেন নি। সে এর প্রয়োজনের দিক্,—এর কল্যাণ করার শক্তির সম্বন্ধে। এ-কথা বোধ করি বহু লোকেই স্বীকার করবেন যে সাহিত্য-রসের মধ্যে দিয়ে পাঠকের চিত্তে যেমন সুবিমল আনন্দের সৃষ্টি করে, তেমনি পারে করতে মানুষের বহু অন্তর্নিহিত কুসংস্কারের মূলে আঘাত! এরই ফলে মানুষ হয় বড়, তার দৃষ্টি হয় উদার, তার সহিষ্ণু ক্ষমাশীল মন সাহিত্য-রসের নূতন সম্পদে ঐশ্বর্য্যবান্ হয়ে উঠে।

বাংলা দেশের একটা বড় সমাজের মধ্যে এর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্চে। সাহিত্যে-সৃষ্টির সঙ্গে এখানে ক্ষোভ ও বেদনা উত্তরোত্তর যেন বেড়ে উঠচে ব'লেই মনে হয়। আমি তোমাদের মুসলমান-সমাজের কথাই বলছি। রাগের উপর কেউ কেউ ভাষাটাকে বিকৃত ক'রে তুলতেও যেন পরাঙ্মুখ নন, এমনি চোখে ঠেকে। অজুহাত তাঁদের নেই তা নয়, কিন্তু রাগ পড়লে এক দিন নিজেরাই দেখতে পাবেন, অজুহাতের বেশিও সে নয়। যে কারণেই হোক, এত দিন বাংলা দেশের হিন্দুরাই শুধু সাহিত্য-চর্চ্চা ক'রে এসেছেন। মুসলমান-সমাজ দীর্ঘকাল এদিকে উদাসীন ছিলেন। কিন্তু সাধনার ফল ত একটা আছেই, তাই, বাণী-দেবতা বর দিয়ে এসেছেনও এঁদেরকে। মুষ্টিমেয় সাহিত্য-রসিক মুসলমান সাধকের কথা আমি ভুলি নি, কিন্তু কোন দিনই সে বিস্মৃত হ'তে পারে নি। তাই

১। "বর্ষ-বাণীর" ৩য় সংখ্যা।

ক্রোধের বশে তোমাদের কেউ-কেউ নাম দিয়েছেন এর হিন্দু-সাহিত্য। কিন্তু আক্ষেপের প্রকাশ ত যুক্তি নয়।

যদিচ, বলা চলে সাহিত্যিকদের মধ্যে কয়জন তাঁদের রচনায় মুসলমান-চরিত্র এঁকেছেন, ক'টা যায়গায় এত বড় বিরাট সমাজের সুখ-দুঃখের বিবরণ বিবৃত করেছেন। কেমন ক'রে তাঁদের সহানুভূতি পাবেন, কিসে তাঁদের হৃদয় স্পর্শ করবে! স্পর্শ করে নি তা জানি, বরঞ্চ উল্টোটাই দেখা যায়। ফলে ক্ষতি যা হয়েছে তা কম নয়, এবং আজ এর একটা প্রতিকারের পথও খুঁজে দেখতে হবে।

কিছুকাল পূর্ব্বে আমার একটি নবীন মুসলমান বন্ধু এই আক্ষেপ আমার কাছে করেছিলেন। নিজে তিনি সাহিত্যসেবী, পণ্ডিত অধ্যাপক, সাম্প্রদায়িক মালিন্য আজও তাঁর হৃদয়কে মলিন, দৃষ্টিকে আবিল করে নি। বললেন, হিন্দু ও মুসলমান এই দুই বৃহৎ জাতি, এক-ই দেশে, এক-ই আবহাওয়ার মধ্যে পাশাপাশি প্রতিবেশীর মতো বাস করে, এক-ই ভাষা জন্মকাল থেকে বলে, তবুও এম্‌নি বিচ্ছিন্ন, এম্‌নি পর হয়ে আছে যে ভাবলেও বিস্ময় লাগে। সংসার ও জীবনধারণের প্রয়োজনে বাইরের দেনা-পাওনা একটা আছে, কিন্তু অন্তরের দেনা-পাওনা একেবারে নেই বললেও মিথ্যে বলা হয় না। কেন এমন হয়েছে, এ গবেষণার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আজ এই বিচ্ছেদের অবসান, এই দুঃখময় ব্যবধান ঘুচোতেই হবে। না হ'লে কারও মঙ্গল নেই।

বললাম, এ কথা মানি, কিন্তু এই দুঃসাধ্য সাধনের উপায় কি স্থির করেছো?

তিনি বললেন, উপায় হচ্ছে একমাত্র সাহিত্য। আপনারা আমাদের টেনে নিন। স্নেহের সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের কথা বলুন। নিছক হিন্দুর জন্যেই হিন্দু-সাহিত্য রচনা করবেন না। মুসলমান-পাঠকের কথা

একটুখানি মনে রাখবেন। দেখবেন, বাইরের বিভেদ যত বড়ই দেখাক, তবু এক-ই আনন্দ এক-ই বেদনা উভয়ের শিরার রক্তেই বয়।

বললাম, এ-কথা আমি জানি। কিন্তু অনুরাগের সঙ্গে বিরাগ, প্রশংসার সঙ্গে তিরস্কার, ভালো কথার সঙ্গে মন্দ কথাও যে গল্প-সাহিত্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ। কিন্তু এ-তো তোমরা না করবে বিচার, না করবে ক্ষমা। হয়ত এমন দণ্ডের ব্যবস্থা করবে যা ভাবলেও শরীর শিউরে ওঠে। তার চেয়ে যা আছে সেই ত নিরাপদ।

তার পরে দু-জনেই ক্ষণকাল চুপ ক'রে রইলাম। শেষে বললাম, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত বলবে, আমরা ভীতু, তোমরা বীর, তোমরা হিন্দুর কলম থেকে নিন্দা বরদাস্ত করো না এবং প্রতিশোধ যা নাও তাও চূড়ান্ত। এ-ও মানি, এবং তোমাদের বীর বলতেও ব্যক্তিগতভাবে আমার আপত্তি নেই। তোমাদের সম্বন্ধে আমাদের ভয় ও সংকোচ সত্যিই যথেষ্ট। কিন্তু এ-ও বলি এই বীরত্বের ধারণা তোমাদের যদি কখনও বদলায় তখন দেখবে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছো সবচেয়ে বেশি।

তরুণ বন্ধুর মুখ বিষণ্ণ হয়ে এলো, বললেন এমনি non-co-operationই কি তবে চিরদিন চলবে?

বললাম, না চিরদিন চলবে না; কারণ, সাহিত্যের সেবক যাঁরা তাঁদের জাতি, সম্প্রদায় আলাদা নয়, মূলে,—অন্তরে তাঁরা এক। সেই সত্যকে উপলব্ধি ক'রে এই অবাঞ্ছিত সাময়িক ব্যবধান আজ তোমাদেরই ঘুচোতে হবে।

বন্ধু বললেন, এখন থেকে সেই চেষ্টাই করবো।

বললাম, করো। তোমার চেষ্টার পরে জগদীশ্বরের আশীর্বাদ প্রতি দিন অনুভব করবে।—১২ই মাঘ '৪২ শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

[ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা]

24 Aswini Dutt Road. Calcutta

প্রিয়বরেষু,—আপনাকে আমার মনে থাকবে না[১] এ কি রকম কথা? মনে বরাবরই আছে এবং থাকবে। চারু[২] আমার ছেলেবেলার বন্ধু; তাঁর বাড়ীতে তাঁর কাছে গিয়ে থাকতেই মন চায়।

তবে দিন কয়েক যখন থাকতেই হবে তখন প্রতিদিনই দেখা সাক্ষাৎ হবে।

১। ১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে মুন্সীগঞ্জে যে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন হয়, তাতে সাহিত্য-শাখার সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র আর ইতিহাস-শাখার সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। এইখানেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রমেশবাবুর প্রথম পরিচয় হয়। সম্মেলনের শেষে রমেশবাবু শরৎচন্দ্রকে ঢাকায় তাঁর বাড়ীতে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করলে, শরৎচন্দ্র সেই সময় ঢাকায় গিয়ে রমেশবাবুর বাড়ীতে দু' এক দিন থেকে এসেছিলেন।

১৩৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরৎচন্দ্রকে যে ডি-লিট উপাধি দেওয়া হয়, সেই উপাধি দেওয়ার ব্যাপারে রমেশবাবু বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। তিনি তখন ওখানকার ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস্-চ্যান্সেলার ডাঃ এ. এফ. রহমানের সঙ্গেও তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। (এই রহমান সাহেবের পরই রমেশবাবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার হয়েছিলেন।) তাই শরৎচন্দ্রকে ডি-লিট দেওয়ানোর ব্যাপারে রমেশবাবু ডাঃ রহমানের উপর তাঁর নিজের যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরৎচন্দ্রকে ডি-লিট দেওয়ার ব্যবস্থা হ'লে শরৎচন্দ্র ঢাকায় গিয়ে যাতে রমেশবাবুর বাড়ীতে ওঠেন, সেইজন্য রমেশবাবু শরৎচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। চিঠিতে তিনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পূর্ব পরিচয়ের কথা স্মরণ আছে কিনা লেখায় শরৎচন্দ্র একথা লেখেন।

২। ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন।

তুলসী গোঁসাই[১] বলছিলেন আমার সঙ্গে যাবেন, তাই আমি লিখেছিলাম তাঁর থাকার একটা ব্যবস্থা করতে, কারণ বাহ্যতঃ ওরা যত দুঃখই স্বীকার করুক ওদের অভ্যাস আলাদা, খুব গরীবের মত থাকতেও পারে কিন্তু পারা উচিত নয় মনে হয়।

পরশু রাত্রে তুলসীর বাড়ী থেকে ডাক্তার বিধান রায় আমার গাড়ীতে এ বাড়ীতে এলেন—বললেন, কথা আছে তাই সঙ্গে যেতে চাই। পথে বললেন, চার মাস পূর্ব্বে বহু কষ্টে ওকে বাঁচিয়েছি, blood pressure উঠেছিল ২৪০°॥ তারপরে একে নামিয়ে এনেছিলাম ১৪০°তে। কিন্তু কিছুদিন থেকে communal award নিয়ে খেটে খেটে আবার হয়েছে ১৭৫°॥ সুতরাং ওকে আপনি কিছুতেই নিয়ে যাবেন না। গেলে অবশ্য খুবই ভালো হতো। কারণ এই মানুষটি যেমন পণ্ডিত তেমনি সজ্জন। আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হতো। কিন্তু তা ঘটলো না, বোধ হয় আমাকে একলাই যেতে হবে। তাই তুলসীর জন্যে কোন ব্যবস্থাই করতে হবে না। রাধাকুমুদকে[২] চিঠি লিখেছি লক্ষ্ণৌ থেকে ছুটি নিয়ে চলে আসতে। যদি রবিবারের মধ্যে এসে উপস্থিত হয় তাহলে সে যেতে পারে। তাকেই Secretary করে নিয়ে যাবো। অবশ্য তার কাজ হবে আলাদা। আপনাদের কারও সঙ্গেই তার কোন সম্বন্ধ থাকবে না। যাই হোক্ রওনা হবার পূর্ব্বে তার করে সমস্ত জানাবো। জগন্নাথ হল ব্যাপারে[৩] আপনারা যা হুকুম করবেন তাই করবো। আপনাকে এবং

১। শ্রীরামপুরের বিখ্যাত জমিদার এবং বাঙ্গলা দেশের একজন বিশিষ্ট রাজনীতিক।

২। শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়। ইনি তখন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। রাধাকুমুদবাবু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ঢাকায় যেতে পারেন নি

৩। ঢাকা ইউনিভারসিটিতে তিনটি হল বা ছাত্রাবাস আছে, যথা—জগন্নাথ হল, ঢাকা হল ও মুসলিম হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রকেই এই তিনটি হলের যে কোন

গৃহের শ্রীযুক্তা গৃহিণীকে আমার প্রীতি ও নমস্কার জানালুম। ইতি

৮ই শ্রাবণ '৪৩। আপনাদের শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

24. Aswini Dutt Road
Kalighat, Calcutta

Dear Sir,

With ref. to your letter on behalf of the Dacca University Students Union [১], I am glad to inform you that I have no objection to accept the address which your union so kindly offers to present me when I go to Dacca during the University Convocation.

I intend to stay there for 3-4 days. We will fix the date when we meet.

Yours Sincerely
Sarat Chandra Chatterji

একটি হলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে হয়। তিনটি হলে তিনটি পৃথক ছাত্র ইউনিয়ন আছে। এই তিনটি ছাত্র ইউনিয়ন ছাড়া সমস্ত ইউনিভারসিটির ছাত্রদেরও একটি ইউনিয়ন আছে। তার নাম—ঢাকা ইউনিভারসিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন। শরৎচন্দ্র ঢাকায় গেলে এই চারটি ইউনিয়ন থেকেই পৃথক পৃথক ভাবে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল।

রমেশবাবু ইউনিভারসিটি স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন ও জগন্নাথ হল ইউনিয়ন—এই দু'টির সভাপতি ছিলেন। তাই তিনি এই দুটি ইউনিয়নের পক্ষ থেকেই শরৎচন্দ্রকে দুটি পৃথক নিমন্ত্রণ পত্র দিয়েছিলেন। অপর দুটি ইউনিয়ন থেকে আলাদা নিমন্ত্রণ পত্র গিয়েছিল। রমেশবাবু জগন্নাথ হল ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলেন—জগন্নাথ হলে আপনি মামুলী কিছু না বলে সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলবেন। আর ছেলেরা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎও করবে।—শরৎচন্দ্র এখানে রমেশবাবুর চিঠির সেই কথাই উল্লেখ করেছেন।

১। ঢাকা ইউনিভারসিটি স্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে রমেশবাবু শরৎচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানালে উত্তরে শরৎচন্দ্র রমেশবাবুকে ইংরাজীতে এই চিঠিখানি লেখেন।

24. Aswini Dutt Road.
Calcutta.

The Vice Chancellor Dr. R. C. Majumder Ph. D.
Dacca.

ভাই ছায়েব, আমার অকৃত্রিম প্রীতি ও শুভেচ্ছা* জানিবা। কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে আমার নমস্কার দিবা ও চারুর সহিত যদি দেখা হয় আমার কথা বলিবা।

এদিকে আমার জ্বর ত সারিল না। শ্রীবিধানাদি ডাক্তারের দল রোগ নির্ণয়ে অক্ষম।

'নানান্ ছাপের জম্‌লো শিশি
নানা মাপের কৌটা হলো জড়ো
ব্যাধির চেয়ে আধি হয়ে বড় করলে যখন অস্থি জর জর,
ডাক্তারেরা বললে তখন হাওয়া বদল করো।'

অতএব দুই তিন দিনেই স্থানত্যাগের বাসনা। নিজের নয় অন্যদের। আমি মনে মনে বলি, হে আমার সন্ধ্যাবেলার নিত্যসহচর ৯৯° জ্বর, তুমি আর একটুখানি প্রসন্ন হয়ে তোমার আরব্ধ কাজটুকু চট্‌পট্ সেরে ফেলো, আমি অব্যাহতি পাই। ইতি ১১ই পৌষ ১৩৪৩।

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রমেশবাবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার হওয়ায় শরৎচন্দ্র তাঁকে শুভেচ্ছা জানান।

পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়[১]কে লেখা]

২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড

কালীঘাট, কলিকাতা

প্রিয় সেজ কত্তা,

তোমার চিঠি পেয়েছি কিন্তু এমনি দুর্ব্বল যে উঠে বসে দুছত্র জবাব দেবো সে শক্তি নেই। বিধান ডাক্তার দেখচেন—পিলে হয়েছে। আজ Dr. K. S. Roy সকালে এসেছিলেন, নানা পরীক্ষা করে বললেন, পিলে হাতে আর ঠেকে না।

একদণ্ডও ইচ্ছে হয় না যে কলকাতায় থাকি, কিন্তু একলা ত কেউ ছেড়ে দেবে না।

জ্বর কাল বিকালেও ৯৯° হয়েছিল ; ঘণ্টা ৩৪ থাকে। দেশেও ত ম্যালেরিয়া, এর ওপর যদি আবার নতুন infection জোটে ত আর সারাই শক্ত হবে। তোমার নিজের যে অসুখটা সেরেছে এতে কত যে আনন্দ পেয়েছি তা লিখে জানাবার নয়। পায়ের জুতো কিন্তু সেই রকমই পোরো। একটু বড়। যেন, চলতে ফোস্কা না হয়।

রমেশ ডাক্তারকে[২] আমার নমস্কার দিয়ে বোলো যে, অসুখের সময়ে তাঁর কথা অনেক ভেবেচি। একদিন বিধানকে বলেও ছিলাম যে আমাদের রমেশের চিকিৎসা না হলে হয়ত জ্বর যাবে না।[৩]

কতদিনে যে বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হতে পারবো এ ভাবনা নিত্যি ভাবি সেজ কত্তা।

১। ইনি শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর সেজ দেওর।

২। শরৎচন্দ্রের গ্রামের ডাক্তার রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এল. এম. এফ.

৩। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে এই কথা বলে শরৎচন্দ্র পরিহাস করেছিলেন।

কলকাতা আমার একেবারে ভালো লাগে না। মাঝে ঢাকায় যেতে হয়েছিল[১] হয়ত শুনে থাকবে। অসুখটা সেখান থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। নমস্কার জেনো। ইতি ৭ই ভাদ্র ১৩৪৩

তোমাদের শরৎ

২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড
কলিকাতা

ভাই সেজকর্ত্তা, তোমার চিঠি পেলাম। পারুর[২] চিঠি হোঁদলের[৩] হাতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আশা[৪]র জন্যে তোমার মনের মধ্যে যে সত্যকার উদ্বেগ ছিল, আমি তা জানতাম বলেই প্রতিদিন একখানা পোষ্ট কার্ড তোমাকে পাঠাতাম। যাই হোক, সে গেছে—এখন অকারণ শোক লালন করা এবং প্রাত্যহিক জাগতিক ব্যাপারে তাকে বহন করে চলা নিষ্প্রয়োজন। স্থির হওয়াই ভালো। দিদিকেও সেদিন এই কথাটাই বলে এসেছি।

আমার স্বভাবটা একটু অদ্ভুত। মানুষ বেঁচে থাকলেই তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ, মরে গেলে আর বড় সে চিন্তা করি নে। কারণ, মৃত্যুটা আমার কাছে অতিশয় স্বাভাবিক ব্যাপার। নিরন্তর ঘটবে,—এই দুনিয়ার আইন। এ আমি মনে-প্রাণে মেনে নিয়েছি।

আশার মৃত্যুকালে আত্মীয়ের মধ্যে একা আমিই উপস্থিত ছিলাম। ডাক্তার নার্স প্রভৃতি এঁরা ত ছিলেনই। গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আশা

১। ডি. লিট উপাধি নেওয়ার জন্য।

২। অনিলা দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা।

৩। অনিলা দেবীর মেজ দেওরের ছেলে শ্রীরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

৪। অনিলা দেবীর দ্বিতীয়া কন্যা।

আমাকে চিনতে পারছিস রে? তার দুচোখ বেয়ে হু হু করে জল গড়িয়ে পড়লো, আমি মুছিয়ে দিলাম। সে ঠোঁট নেড়ে কি যেন বলার চেষ্টা করলে, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর ফুটলো না। মিনিট পাঁচ-ছয়, তারপরে প্রাণ বেরিয়ে গেল। তার খোলা চোখ দুটো হাত দিয়ে বুজিয়ে দিয়ে আবশ্যকীয় বন্দোবস্ত করে চলে এলাম। অর্থাৎ, তাকে যেন মড়ার ঘরে পাঠানো না হয় ইত্যাদি। বেলঘরেতে[১] এই সংবাদ লোক দিয়ে হোক, টেলিগ্রাম করে হোক দেবার জন্যেও হাঁসপাতালে instruction দিয়ে এলাম। তারা সেই মতোই সব কাজ করেছিল। সেই নিশীথ রাতে ডাক্তার ও নার্সদের কথা আমাকে বড় বিচলিত করেছিল। তারা দশ বারোজন আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ক্ষমা ভিক্ষা জানিয়ে বললে, আপনি আমাদের অক্ষমতা মার্জ্জনা করবেন, মানুষের যেটুকু সাধ্য ছিল আমরা করেছি। আমি শুধু জবাব দিলাম, সে আমি জানি। তোমাদের কাছে ওর আত্মীয়স্বজন সকলের পক্ষ থেকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মানুষের শক্তি ও ইচ্ছের উপরে আরও একটা শক্তির ইচ্ছে ছিল না যে ও বাঁচে। ওর মিয়াদ ফুরিয়েছে—সে কারাগারের বদ্ধ দুয়ার রাত্রি ১টা ১৫ মিনিটে খুলে দিলে, কার সাধ্য ওকে এক সেকেণ্ড বেশি ধরে রাখে।

যাক্, এ সব কথা। আমার শরীর বাড়ী থেকে এখানে আসার পরে ঢের বেশি খারাপ হয়ে গেছে। আমরা সবাই পূজোর নবমীর দিনে বাড়ী যাবো। অন্যান্য খবর তেমনিই, তেমনি ভালো মন্দে জড়ানো।

ঝড়ের প্রাবল্যে সর্ব্বত্রই বিস্তর ক্ষতি হয়েছে। আমার কি কি ক্ষতি হয়েছে লক্ষ্মণকে[২] একটু লিখে জানাতে বোলো।

ইতি—১৫ই আশ্বিন ১৩৪৪। শরৎ

১। আশা দেবীর শ্বশুরবাড়ী।

২। অনিলা দেবীর জ্ঞাতি ভাসুরপো।

[শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য[১]কে লেখা]

২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড,
কলিকাতা
২৮শে বৈশাখ, ১৩৪৪

কল্যাণীয়েষু,

বুদ্ধদেব, কই আমার চিঠি লেখার কাগজ ত আজো এলো না। সবাই ভুলে গেছে বোধ হয়। আবার প্রচণ্ড জ্বর সুরু হয়েছিল। এবার রক্ত পরীক্ষায় যদিও কিছু পাওয়া গেল না, কিন্তু ওঁরা স্থির করেছেন এ বস্তু ম্যালোয়ারি[২] ছাড়া আর কিছু নয়।...যাক্ গে রোগের কাহিনী। একটা কথা। আজকাল বড় লোকদের ঘরে মেয়ের নাম প্রায়ই দেখি অঞ্জলি রাখা হয়। কিন্তু সবাই দেন দীর্ঘ ঈ। অঞ্জলিকে অঞ্জলী লিখলে কি স্ত্রীলিঙ্গ হ'তে পারে বুদ্ধদেব? কেউ কেউ বলেন বাঙলায় পারে। কি জানি। সময় মতো একবার এসো। আশীর্ব্বাদ রইলো।

দাদা

১। ইনি বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

২। এখানে 'ম্যালেরিয়াকে 'ম্যালোয়ারি' বলে পরিহাস করেছেন।

[শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ[১]কে লেখা]

…উমারাণী[২] এখন পরলোকগত। জীবনে একটি বার মাত্র তাকে দেখেছি,—বৎসর কয়েক পূর্ব্বে প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের ভিড়ের মধ্যে। অনেকগুলি মেয়ের অগ্রবর্ত্তিনী হয়ে সে সকলের জন্যে আমার কাছে চাইতে এসেছিল আমার হাতের সই। তারপরে আর তাকে দেখিনি।

অনেকদিন পরে হঠাৎ তার মৃত্যু সংবাদ শুনতে পেলাম আমার এক বন্ধুর মুখে। কিন্তু যে-মেয়ে আমার আত্মীয় নয়, যাকে একবারের বেশি দেখিনি তার মৃত্যু মনে থাকবার কথা নয়, কিন্তু আত্মীয় স্বজন বিহীন প্রবাসে সেদিন শোকোন্মত্ত হতভাগ্য পিতার অপরিসীম বেদনার যে বিবরণ শুনেছিলাম, সে যেমন করুণ তেমনি মর্ম্মান্তিক। সে কাহিনী ভুলে যাওয়া কঠিন। এই বালিকা ছিল একদিকে কন্যা অন্যদিকে পিতার অভিভাবিকা। তাঁর সকল ভারই ছিল মেয়ের পরে। সেই কন্যা, সেই একান্ত অবলম্বন যাঁর আকস্মিক মরণের নির্ম্মম আঘাতে এক মুহূর্ত্তে ঘুচে গেল চিরদিনের মতো, সেই দুঃখময় পিতৃ-হৃদয়ে সান্ত্বনা এনে দিতে পারি এমন ভাষা আমি জানিনে। কেবল জানি যে-পথ দিয়ে একদিন এসেছিল মরণ, সেই পথ ধরেই আর একদিন আসবে সান্ত্বনা—নীরবে, সকলের অগোচরে। সন্তান হারার অপরিমেয় বেদনা শান্ত করে দিতে পারে—শুধু সে-ই। আর কেউ নয়।…২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১। নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির সম্পাদক।

২। জ্যোতিষবাবুর কন্যা।

[শ্রীরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়[১]কে লেখা]

'মালঞ্চ'

দেওঘর

সাঁওতাল পরগণা

কল্যাণীয়েষু,

হোঁদল, আজ দশদিনের মধ্যে বাড়ীর খবর কেবল একখানা চিঠিতে পেয়েছি। অসুস্থ দেহে সকলের জন্যে বড় চিন্তা হয়। তোমার মামিমা[২] তো চিঠি লিখতে জানেন না, সুতরাং তোমরা অনুগ্রহ করে যা প্রত্যহ না হোক ২।১ দিন পরে পরেও এক আধটা পোষ্ট কার্ড দাও যে কতকটা নিশ্চিন্ত হই। ইতি ২৬শে ফাল্গুন।

বড়মামা

১। শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর মেজ দেওরের ছেলে।

২। শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী।

[শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়কে লেখা]

24 Aswini Dutt Road
Phone—South 84
1-5-37

প্রিয়বরেষু,

জ্বর এবং অর্শের রক্তপাত সমভাবেই চলচে, বরঞ্চ একটু বেশি বললেও অন্যায় বলা হয় না।

তোমার ছেলে পায়ের ধূলো নিয়েছে। আশীর্ব্বাদ করেছি।

শরৎদা

বাড়ীর সকলের অত্যন্ত অমত থাকলেও প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণের আয়োজন করচি। সজ্ঞানে ঐটিই শেষ কাজ।[১]

শ চ

১। বাড়ীর সকলের অমতের ফলে শরৎচন্দ্র শেষ পর্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণ করতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথ "পথের দাবী" পড়ে শরৎচন্দ্রকে চিঠি দিলে, উত্তরে শরৎচন্দ্র যে চিঠি লিখেছিলেন, অথচ শেষপর্যন্ত কবিকে পাঠান নি, সেই চিঠিরই কিয়দংশের প্রতিলিপি।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোস্ট
জেলা হাওড়া

শ্রীচরণেষু

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ইং ২রা, ফাল্গুন ১৩৩৩ ।

সেবক
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পরিশিষ্ট

১৬৬ পৃষ্ঠার ২নং পাদটীকা :—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একবার বাজে-শিবপুরে গেলে শরৎচন্দ্র তাঁকে নিয়ে চৌরঙ্গীতে জুতো কিনতে গিয়েছিলেন। উপেনবাবু তাঁর 'স্মৃতি-কথা' গ্রন্থে সেই জুতো কেনার কাহিনীটি এই ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন—

হোয়াইটওয়ের রেক্স-শুর মতো মূল্যবান এবং অভিজাত জুতো কলিকাতার বাজারে খুব বেশি ছিল না। তখনকার দিনে একজোড়া রেক্স-শুর মূল্য ছিল সাড়ে বত্রিশ টাকা।…

—চল স্টীমারে যাওয়া যাক, শীঘ্র হবে।

বললাম—চল।

পথে বেরিয়ে দুজনে পাশাপাশি গল্প করতে করতে স্টীমার ঘাটের দিকে অগ্রসর হলাম। শরতের পায়ে একজোড়া ছিন্ন মলিন চটিজুতো। যৌবনকালে তার রঙ কালো ছিল অথবা বাদামি, তা সহজে ঠাহর করা যায় না। কোনো জায়গা দেখলে মনে হয় কালো, কোন জায়গায় বাদামি। শুনলাম জুতোজোড়া পায়খানা যাবার সময়ে শরতের কাজে লাগে।

স্টীমার ঘাটের কাছ বরাবর পোয়াটাক পথের মত অত ধূলিবহুল পথ ওই শহরে আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ।……

পথের ধুলায় অল্পক্ষণের মধ্যেই শরতের চটি ধূলিতে ধূসর বর্ণের হয়ে গেল। সেই ধূলিকণাসমূহ শুধু তার জুতোর অবস্থান্তর ঘটিয়ে ক্ষান্ত হ'ল না, ক্রমশ তার দু পায়ে একজোড়া ধূসর বর্ণের স্টকিং পরিয়ে দিল।

গঙ্গা পেরিয়ে পরপারে হাইকোর্ট ঘাটে উঠে…দুজনে মাঠ উত্তীর্ণ হয়ে হোয়াইট-ওয়ের দোকানের সামনের ফুটপাথে উঠলাম। শরৎকে বললাম, "শরৎ, তোমার পায়ের আর জুতোর যা অবস্থা, অত দামি রেক্স-শু তোমাকে দেখাবেই না।"

"বল কি উপীন।" ব'লে একটু উদ্বিগ্ন মুখে শরৎ কোঁচা দিয়ে পা আর জুতো

দু-চারবার ঝাড়লে। তার দ্বারা ধূলি হয়তো খানিকটা অপসৃত হ'ল, কিন্তু জুতোর অবস্থা বিশেষ উন্নতি লাভ করল না।

বললাম, আগের অবস্থা বরং ভাল ছিল, এ আরও খারাপ হ'ল শরৎ।"

মাথা নেড়ে শরৎ বললে—"হোকগে। চল তো ঢুকি, না দেখাতে চায়, সঙ্গে টাকা তো আছে, চারখানা নোট মুখের কাছে নেড়ে বলব—হিয়ার ইস্ দি মানি।"

গুটি গুটি দুজনে যেখানে ঢুকলাম, সৌভাগ্যক্রমে তার পাশেই জুতো বিভাগ। অদূরে একজন শপ্-অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট দাঁড়িয়ে ছিল, আমাদের দেখতে পেয়ে দ্রুতপদে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ জেণ্টেলমেন?···

শরৎ বললে, "আমি একজোড়া রেক্স-শু কিনতে চাই।"

আমাদের দুজনকে একটা শোফায় বসিয়ে ঘাড় এঁকিয়ে-বেঁকিয়ে শরতের পায়ের আকারটা ভাল করে দেখে নিয়ে শপ্-অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট জুতো আনতে গেল।

জাত বণিক এই ইংরেজরা। পায়ের ধুলা অথবা ছিন্ন চটিজুতো এদের কি বিভ্রান্ত করতে পারে?···নিশ্চয় বলতে পারি, ঐ ধুলা আর ঐ ছিন্ন চটি নিয়ে তখনকার দিনে চাঁদনির কোনো জুতোওয়ালার দোকানে গিয়ে সাড়ে বত্রিশ টাকা মূল্যের জুতো কিনতে চাইলে দেখাত না তো বটেই, অধিকন্তু বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বলত, "আজ হবে না, আর একদিন আসবেন।" চাঁদনির দোকানে জুতোর দর করতে গিয়ে বহুবার এমন কথা শুনাও হয়েছে, "ও-দামে এক জোড়া হবে না, একপাটি হবে।"···

আট দশ জোড়া জুতোর বাক্স দুই বগলে চেপে ধরে শপ-অ্যাসিষ্টাণ্ট এসে হাজির হ'ল; তারপর হাঁটু গেড়ে শরতের সামনে বসে পড়ে এক এক জোড়া পরিয়ে পরিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। কিছুতেই ত[illegible] মন আর সন্তুষ্ট হয় না। পুনরায় চার [illegible] জোড়া নিয়ে এসে পরীক্ষা করতে লাগল।···অবশেষে একজোড়া পরিয়ে খুশি [illegible] মাথা নাড়লে; তারপর ভাল করে লেস বেঁধে দিয়ে বললে, "একটু চলে ফিরে দেখুন তো! আমার মনে হচ্ছে, এই জোড়া ঠিক ফিট করেছে।"

ঘুরে ফিরে বেড়াতে বেড়াতে শরতের মুখে খুশি হওয়ার হাসি ফুটে উঠল। জিজ্ঞাসা করলাম—"কেমন লাগছে?"

শরৎ বললে, "চমৎকার! জুতো পরেছি বলে মনেই হচ্ছে না।" মণিব্যাগ থেকে চারখানা দশ টাকার নোট বার করে সে শপ-অ্যাসিষ্ট্যাণ্টের হাতে দিলে।

সাড়ে বত্রিশ টাকার ক্যাসমেমো ও বাকি সাড়ে সাত টাকা নিয়ে…আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে শরৎ বললে,—"চল।"

নূতন জুতো থেকে পা খোলবার কোন লক্ষণ নেই দেখে শপ-অ্যাসিষ্ট্যান্ট বললে—আপনার স্লিপারটা জুতোর বাক্সে দিয়ে দোব?

"না ওর আর দরকার নেই।" বলে শরৎ আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। জুতো আর নতুন বাক্স উভয়েই নাথ-হীন হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে দোকানে পড়ে রইল। এখন বুঝতে পারলাম, জুতোর বাক্স বহন করার কদর্য্যতা হতে অব্যাহতি লাভের জন্যেই শরৎ ঐ পায়খানার জুতো-জোড়া পরে এসেছিল।

পথে বেরিয়ে শরৎ উত্তর দিকে চলতে লাগল।

ধর্মতলার মোড়ের মাথায় পৌঁছে শরতের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'শরৎ, ছপয়সা ক্ষইল।'

আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে শরৎ বললে—"তার মানে?"

"তার মানে, অত দামি জুতো, হোয়াইটওয়ে থেকে এ পর্যন্ত আসতে যেটুকু চামড়া ক্ষয়েছে, তার দাম ছপয়সা নিশ্চয় হবে।"

কোন কথা না বলে আমার প্রতি একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে শরৎ ধর্মতলা ষ্ট্রীট পার হয়ে অপর দিকের ফুটপাথে উঠল। তারপর ডানদিকে মসজিদ রেখে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে হনহন করে এগিয়ে চলল।

খানিকটা পথ গিয়ে বললাম—"শরৎ, তিন আনা ক্ষইল।"

কোন মন্তব্য না করে শরৎ যেমন চলছিল, হনহন করে তেমনি চলতে লাগল। সম্ভবত সে আরামদায়ক মূল্যবান জুতো র পথ চলার সখ মেটাচ্ছিল। আরও খানিকটা গিয়ে বললাম—"শরৎ, সাড়ে চার আনা ক্ষইল।"

এবার শরৎ গতিরোধ করে মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বললে, "আরে তুমি তো ভারি পেছনে লাগলে দেখছি!" তারপর অদূরে একটা চলন্ত খালি ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে ডান হাত তুলে উর্দ্ধস্বরে ডাকতে লাগল—"এই ট্যাক্সি! ট্যাক্সি।"

ট্যাক্সি চালকের মনোযোগ আকৃষ্ট হ'ল। সবেগে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে নিমেষের মধ্যে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে দরজা খুলে দিলে।

আমার প্রতি ইঙ্গিত করে শরৎ বললে—"নাও ওঠ।"

জিজ্ঞাসা করলাম—"কোথায় চলেছ শরৎ?"

শরৎ বললে—"হরিদাসের দোকানে।"

হরিদাসের দোকান অর্থে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকের দোকান—গুরুদাস লাইব্রেরী।...

মাস ছয়েক পরে...সকালে শরতের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলাম।

আমাকে দেখামাত্র শরৎ উচ্চস্বরে হাঁক দিলে—"ওরে ভোলা, মামা এসেছে, আমার জুতোজোড়া নিয়ে আয়।"

বিস্মিত কণ্ঠে বললাম—"আমার প্রতি এ কি রকম অভ্যর্থনা—তা তো বুঝলাম না।"

কোন উত্তর না দিয়ে শরৎ শুধু মুচকে একটু হাসল...

রেক্স-শু নিয়ে ভোলা উপস্থিত হলে কথাটা বুঝতে পারলাম।

জুতো-জোড়া হাতে নিয়ে উল্টে ধরে তলাটা দেখিয়ে শরৎ বললে, "যেদিন জুতো-জোড়া কিনি তুমি বলেছিলে—তিন আনা ক্ষইল, সাড়ে চার আনা ক্ষইল। নরম আর হালকা ব'লে মাস ছয়েক ধরে এই জুতো জোড়াই সমানে ব্যবহার করছি। আচ্ছা, ভাল করে দেখে বল তো উপীন, আজ পর্যন্ত ক আনা ক্ষয়েছে? চার আনাও বোধ হয় নয়?"

বললাম,—"নিশ্চয় নয়, দু আনাও বোধ হয় নয়।"

খুশি হয়ে শরৎ বললে, "ঠিক বলেছ। লোহার সোল হ'লে এত দিনে ক্ষয়ে যেত; কিন্তু এ এমন অদ্ভুত পেটা চামড়া যে, ক্ষইতে জানে না। দাম ওরা নেয় বটে, কিন্তু তার বদলেও দেয়।"

২৩৬ পৃষ্ঠার পাদটীকা—

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমি জ্বরে পড়ে আছি, তবু তোমার চিঠির উত্তর দিতে বসলুম। ভয় হয়েছিল পাছে আমার সমালোচনা পড়ে তুমি অতিশয় বিরক্ত হয়ে থাক। তোমার চিঠিখানি পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছি।

গোড়াতেই একটা কথা তোমাকে বলে রাখি। তোমার প্রতিভা আছে বলেই

তোমার কাছে দাবী করি—সে দাবী সাহিত্যের তরফের দাবী। অন্য অনেক বিষয়েই এক এক যুগের বর্ত্তমানের ভোগ বর্ত্তমানেই নিঃশেষ হয়ে যায়—রাজ্যসাম্রাজ্যও তারি অন্তর্গত। সাহিত্যে প্রত্যেক জাতি তার চিরকালের সম্পদ কামনা করে। এই সম্পদ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা যাদের আছে বর্ত্তমানের কোনো প্রলোভন এসে তাদের তপোভঙ্গ না করে এই আমরা একান্ত মনে ইচ্ছা করি। বর্ত্তমান কালের মন জোগাবার জন্যে বায়না নিয়ে যারা মর্ত্ত্যলোকে এসেচে, তাদের সংখ্যার সীমা নেই—তারা প্রচুর পরিমাণেই নগদ বিদায় পেয়ে থাকে—মাসিকে, সাপ্তাহিকে, সভাসমিতিতে তারা আসর সরগরম করে রেখেছে। তাদের বারোয়ারির আসর—বাঁশে বাঁখারিতে তৈরী; তোমরা সেখানে যদি পা দেও তবে তোমাদের জাত যাবে। তুমি লিখেছ "উপস্থিত কালটাও যে একটা মস্ত ব্যাপার।" সেইখানেই সে বস্তুতই মস্ত যেখানে অনুপস্থিত কালের মধ্যেও তার প্রবেশাধিকার আছে। বর্ত্তমানকালের একটা বৃহৎ অংশ আছে যেটা ক্ষণজীবীদের—মোটের উপর তাদের ক্ষমতা কম নয়, তাদের ভোগের আয়োজনও প্রচুর, আধুনিক ডিমক্রাসির যুগে সাহিত্যের দরবারে তারাও তারস্বরে ফরমাস করে থাকে। এই ফরমাস এড়িয়ে চলা এখনকার কালে একটা বিষম সমস্যা—এ সমস্যা আগেকার দিনে এত কঠিন ছিল না। হাল আমলের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির প্রচলিত বুলি দশের মুখে মুখে কেবলি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্চে—সেই দশের দল এই সমস্ত বুলিরই সর্ব্বত্র পুনরাবৃত্তির জন্যে উন্মত্ত। তোমার মতো সাহিত্যিক যেন সেই দশকে এই কথাই বলে যে, তোমাদের বুলি আমার বুলি নয়—তোমাদের খাঁচার পাখী না হলে তোমাদের দানাপাণি আমার ভাগ্যে না জুটতে পারে কিন্তু আমার খাদ্য বৃহৎ কালে, বৃহৎ দেশে। দাশুরায়ের আমলের উপস্থিতকাল দাশুরায়কে প্রচুর পুরস্কার দিয়েছিল—কিন্তু সে যে চেক্ সই করেছিল আধুনিককালের ব্যাঙ্কে তা ক্যাশ করা চলে না। অথচ ময়মনসিংহের গাথা-কাব্য লোক-সাহিত্য, আজও তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয় নি—তা অশিক্ষিত লোকের সহজ ভাষায় লেখা কিন্তু তা চিরকালের ভাষায় লেখা। দাশুরায়ের শ্লেষ অনুপ্রাসের অগভীর কৃত্রিমতায় সত্য ছিল না। ময়মনসিংহের গাথায় সত্য ছিল। আধুনিক কালের মুখরোচক বুলিগুলো সেই দাশুরায়ের শ্লেষ অনুপ্রাসের জায়গা জুড়েচে—এরা প্রতিদিন সাহিত্যের সত্য নষ্ট করচে। এরা কচুরিপানার মতো সাহিত্যের সকল স্রোতকেই রোধ করতে বসেচে। আমি তোমার যে সব গল্প পড়েচি তাতে তুমি অতি অনায়াসে

চিরকালের সত্যকে মূর্ত্তি দিয়েচ—দশের বাণী তোমার বাণীর মধ্যে প্রবেশ করে ঐ সত্যের ছবিতে নিজের দাগা রেগে দিতে পারে নি। তখন তুমি জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে ছিলে। তোমার এখনকার লেখা পড়তে আমার ভয় হয় পাছে চোখে পড়ে যে, তোমার কলমের উপরে তোমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ভিড়ের লোকের মনটা ভর করেচে। সে এতবড়ো লোকসান যে সে আমি চোখে দেখতে পারব না।

তোমার নাটকে যে perspective-এর কথা বলেছি সে হচ্চে নাটকের আখ্যান বস্তুগত। অর্থাৎ যে পল্লীগ্রামের মধ্যে যে পরিবেষ্টনের মধ্যে সমস্ত ঘটনা স্থাপিত তার ভাষায় চরিত্রে ব্যবহারে যথাযথ পরিমাণ সামঞ্জস্য রক্ষা হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। অর্থাৎ তুমি যা-কিছু বলতে চেয়েচ তাকে যদি তার পরিবেষ্টনের সঙ্গে সঙ্গত করে বলতে তাহলে ভাষায় ঘটনায় অন্য রকম হত—মূল কথাটা বজায় থাকত কিন্তু এই রূপটা থাকত না। আর্টে বিষয়ের সঙ্গে রূপের মিল হলে তবেই সেটা সত্য হয়।

একটা কথা মনে রেখো, আমি তোমার এই নাটক সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করলুম যদি তোমার নিজের মনে হয় সেটা অসঙ্গত তাহলে সেটাকে মন থেকে একেবারে লুপ্ত করে দিয়ো। তোমার নিজের সৃষ্টির আদর্শ তোমার নিজেরই মনে, যদি সেটাকে রক্ষা করে থাকো তাহলে বলবার কথা কিছু নেই—যদি জনসাধারণের ফরমাস তোমার লেখনীকে বিচলিত করে থাকে তাহলেই ভাববার কথা।

এখন কলকাতায় আছি—যদি কোনদিন দেখা হয় মোকাবিলায় আলোচনা হতে পারবে। ইতি—১১ই মার্চ্চ, ১৯২৮

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌,

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬